ফিক্‌হুল হাদীস

(দ্বিতীয় খণ্ড)

শায়খ আব্দুর রউফ বিন সুলাইমান

অনুবাদ সম্পাদনায়
মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

ফিক্‌হুল হাদীস

দ্বিতীয় খন্ড

শায়খ আব্দুর রউফ বিন সুলাইমান

সম্পাদনায়

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

اِنِّىْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَ هُمَا اَبَدًا كِتَابُ اللّٰهِ وَسُنَّتِىْ وَلَنْ يَّفْتَرِ قَا حَتّٰى يَرِدَا عَلَى الْحَوْضِ–

"আমি তোমাদের মধ্যে দুইটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, এরই দুইটি অনুসরণ করতে থাকলে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। তাহ হচ্ছে আল্লাহর কোরআন ও আমার সুন্নাত (হাদীস) এবং কিয়ামতের দিন 'হাওযে কাওসার'-এ উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত এই দুইটি জিনিস কখনোই পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না।" (মুস্তাদরাক হাকেম, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৩)

ফিক্‌হুল হাদীস

দ্বিতীয় খন্ড

শায়খ আব্দুর রউফ বিন সুলাইমান

অনুবাদ সম্পাদনায়

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

প্রকাশক

পাণ্ডুলিপি প্রকাশন

মানিক পীর রোড, কুমার পাড়া-সিলেট

ফোনঃ ০১৭১২-৮৬৮৩২৯

ফিক্‌হুল হাদীস

দ্বিতীয় খন্ড

শায়খ আব্দুর রউফ বিন সুলাইমান

সম্পাদনায়

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

প্রকাশক

বয়েজিদ মাহ্‌মুদ ফয়সাল

পাণ্ডুলিপি প্রকাশন

মানিক পীর রোড, কুমার পাড়া

সিলেট- ফোনঃ ০১৭১২-৮৬৮৩২৯

সার্বিক সহযোগিতায়

রাফীক বিন সাঈদী

আব্দুস সালাম মিতুল

গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক

৬৬ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন ঃ ০০৮৮- ০২- ৮৩১৪৫৪১, ০১৭১১২৭৬৪৭৯

প্রচ্ছদ ঃ মশিউর রহমান

প্রথম প্রকাশ ঃ মে ২০০৯

অক্ষর বিন্যাস

নাবিল কম্পিউটার ঃ ৫৩/২ সোনালীবাগ, বড়মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মুদ্রণঃ আল আকাবা প্রিন্টার্স

৩৬ শিরিস দাস লেন, বাংলাবাজার-ঢাকা-১১০০

শুভেচ্ছা বিনিময় ঃ ২৫০ টাকা মাত্র। ১৩ দেরহাম- ইউ, এ, ই, ১৩ রিয়াল, কে, এস, এ, ১০ ডলার, ইউ, এস, এ, ৬ পাউন্ড, ইউ, কে।

Fiqhool Hadith, 2nd part, Written by Shayekh Abdur Rauf Bin Sulaiman edited by Moulana Delawar Hossain Sayedee. Published by Islamic cultural Centre, U. A. E. Co-operated by Rafeeq bin Sayedee & Abdus Salam Mitul. 1st Edition: January 2008. Price: 250 TK, Only in BD. 13 Derham in UAE, 13 Riyal in KSA, 10 Doller in USA. 6 Pound in UK.

উ | ৎ | স | র্গ

মুহ্তারাম হুমায়ুন কবীর যুবায়ের
মুহ্তারাম আব্দুল হাই চৌধুরী
মুহ্তারাম জাকির হোসেন
মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন
তাদেরকে ও তাদের মৃত এবং জীবিত
সকল আত্মীয়-স্বজনকে দুনিয়া- আখিরাতে
সর্বপ্রকার কল্যাণ দান করুন।

সম্পাদকের কথা

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّىْ عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ-

বিগত ২০০৭ এর মে' মাসে আমি সংযুক্ত আরব আমিরাত সফর করি। আমার এ সফরে দুবাই, আযমান, রা'সূল খাইমা, শারজাহ্, আল আইন, আবুধাবী ও উম্মুল কোয়াইন শহরগুলোয় বেশ কিছু সংখ্যক মহিলা ও পুরুষ সমাবেশে বক্তব্য রাখার সুযোগ হয়।

উম্মুল কোয়াইন শহরে অবস্থানকালে সেখানকার বিখ্যাত রা'ফা জামে মসজিদের খতীব ফযিলাতুশ শায়খ হজরতুল আল্লাম আব্দুর রউফ বিন সুলাইমান সাহেবের আতিথ্য গ্রহণ করি। তিনি জন্মসূত্রে বাংলাদেশের সিলেট জেলার অধিবাসী এবং প্রায় চল্লিশ বছর ধরে আরব আমিরাতে খতীবের দায়িত্ব পালন করছেন। বর্ষীয়ান এ প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন আমার দীর্ঘ দিনের পরিচিত। তিনি ক্রমাগত কয়েক বছর সাধনা করে একটি কিতাব লিখেছেন। কিতাবটির নাম 'ফিক্হুল হাদীস'। আমাকে কাছে পেয়ে তিনি দুই খন্ডে সমাপ্ত বিশাল এ কিতাবটির পান্ডুলিপি প্রকাশের উপযোগী করার জন্য অনুরোধ জানালেন। মুরব্বী এ প্রবীণ সম্মানিত আলেমের অনুরোধ আমাকে রাখতেই হলো।

আমার নানাবিধ ব্যস্ততার মধ্যে পান্ডুলিপিটি দেখে তা প্রকাশের উপযোগী করতে প্রায় চার মাস সময় লেগে গেলো। কিতাবটি প্রকাশের জন্য প্রকাশনা সংক্রান্ত যাবতীয় সহযোগিতা করেছে আমার পুত্রতুল্য স্নেহাস্পদ আব্দুস সালাম মিতুল। আল্লাহ তা'য়ালা তাকে এর উত্তম জাঝা দান করুন।

'ফিক্হুল হাদীস' বাংলা ভাষায় লিখিত ফিক্হ সংক্রান্ত কিতাবসমূহের জগতে এক অভিনব সংযোজন। সম্মানিত লেখক শায়খ আব্দুর রউফ মুসলিম নারী-পুরুষের জীবন পরিচালনার জন্য দিবা-রাত্রির পাক-পবিত্রতা থেকে শুরু করে ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল, মুস্তাহাবসহ সকল প্রকার ইবাদাতের হাদীস সমর্থিত মতসমূহ রেফারেন্সসহ উল্লেখ করেছেন। সেই সাথে এসকল বিষয়ে অধিকতর জ্ঞানার্জনের জন্য চার মাযহাবের সম্মানিত ইমামদের ভিন্ন ভিন্ন মতগুলোও উল্লেখ করেছেন।

আলহাম্দু লিল্লাহ্– কোরআন-হাদীস, বিভিন্ন তাফসীর, উলুমুল কোরআন, উলুমুল হাদীস, উসুলে হাদীস ও উসুলে ফিক্হ সংক্রান্ত কিতাবাদী অধ্যয়ন করে আমি যতটুকুন জ্ঞানার্জন করতে পেরেছি তারই ভিত্তিতে বলতে চাই, যদিও শরীয়াতের ভিত্তি কোরআন-হাদীস ও ইজমা-কিয়াস, তবুও এর আসল ফাউন্ডেশন পবিত্র কোরআন ও সহীহ্ হাদীস। এ ব্যাপারে বিদায় হজ্জের ভাষণে নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

أَمْرَانِ تَرَكْتُ هُمَا فِيْكُمْ لَنْ تَضِلُّوْا مَاتَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابُ اللهِ وَسُنَّةُ نَبِيِّهِ- (بخارى)

'দুটো জিনিস তোমাদের মাঝে আমি রেখে যাচ্ছি, তোমরা যতক্ষণ এ দুটো জিনিস ধারণ করে থাকবে, তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। তাহলো, আল্লাহর কোরআন ও তাঁর নবীর সুন্নাত।'

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ এক জীবন ব্যবস্থার নাম, যার মূলভিত্তি হচ্ছে মহাগ্রন্থ আল কোরআন এবং হাদীসে রাসূল (সাঃ)। পবিত্র কোরআন ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মূলনীতি, আর হাদীস হচ্ছে কোরআনে বর্ণিত মূলনীতির বিস্তারিত বিশ্লেষণ। মানুষের জীবন চলার পথে প্রয়োজন এমন কোনো বিষয় নেই যার মূলনীতি পবিত্র কোরআনে বিধৃত হয়নি। আর কোরআনে বর্ণিত এমন

কোনো জটিল বিষয় নেই যার ব্যাখ্যা হাদীসে বর্ণিত হয়নি। মোট কথা হাদীস হচ্ছে পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যা। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন–

اِذَا حَدَّثْتُكُمْ بِحَدِيْثٍ اَنْبَاءْتُكُمْ بِتَصْدِيْقِهِ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى–

(مرقاة شرح مشكواة ص ٢٤٠)

'আমি যখন কোনো হাদীস বর্ণনা করি তখন তোমাদের নিকট এর কোরআন সমর্থিত হওয়ার সংবাদ প্রকাশ করি।' (মিরকাত শরহে মিশকাত, পৃষ্ঠা নং ২৪০)

শরীয়াতের সকল ইমামগণের সর্বসম্মত রায় হচ্ছে–

وَجَمِيْعُ السُّنَّةِ شَرْحٌ لِلْقُرْاٰنِ– (مقدمة مشكواة المصابح) 'সমগ্র সুন্নাত অর্থাৎ হাদীসসমূহ কোরআনেরই ব্যাখ্যা।' সুতরাং পবিত্র কোরআনের পরেই হাদীসের স্থান। হাদীস অস্বীকারকারীরা মুসলমান নয়। হাদীস অস্বীকার করে শুধু কোরআন অনুসরণের কোনো রাস্তা নেই। হযরত ইমরাণ ইবনে হোসাইন (রাঃ) এর মজলিশে এক ব্যক্তি বললেন–

لَا تُحَدِّثُوْنَ اِلاَّ بِالْقُرْاٰنِ– 'আপনি আমাদের নিকট কোরআন ব্যতীত অন্য কিছু বর্ণনা করবেন না।' তখন হযরত ইমরাণ (রাঃ) সে ব্যক্তিকে ডেকে বললেন–

اَرَاَيْتَ لَوْ وُكِّلْتَ اَنْتَ وَاَصْحَابُكَ اِلَى الْقُرْاٰنِ اَكُنْتَ تَجِدُ فِيْهِ صَلاَةَ الظُّهْرِ اَرْبَعًا وَصَلاَةَ الْعَصْرِ اَرْبَعًا وَصَلَواةَ الْمَغْرِبِ ثَلاَثًا؟

"তুমি কি ভেবে দেখেছো, তোমাকে আর তোমার সঙ্গী-সাথীদের যদি শুধু কোরআনের ওপর নির্ভরশীল করে দেয়া হয় তাহলে কি তোমরা কোরআনে যোহরের চার রাকাআ'ত, আসরের চার রাকাআ'ত এবং মাগরিবের তিন রাকাআ'ত নামাজের রাকাআ'তের সংখ্যা উল্লেখ পাবে?"

اَكُنْتَ تَجِدُ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَالطَّوَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةَ وَالْمُوْقِفُ بِعَرَفَةَ وَرَمِي الْجِمَارِ؟ 'বায়তুল্লাহ্ শরীফে সাত বার তাওয়াফ, সাফা-মারওয়ার সা'ঈ সাত বার, আরাফাতে অবস্থান এবং (মীনায়) পাথরের টুকরো নিক্ষেপ এসবের নিয়ম-বিধান তুমি কি কোরআনে দেখতে পাও?' তিনি আরো বললেন, কোরআনে চোরের হাত কাটার বিধান দেয়া হয়েছে কিন্তু–

وَ الْيَدُ مِنْ اَيْنَ تُقْطَعُ اَوْ مِنْ هٰهُنَا اَوْ مِنْ هٰهُنَا– 'চোরের হাত কোন্ স্থান হতে কাটতে হবে, এখান হতে না এখান হতে তা কি কোরআনে লেখা আছে?' হযরত ইমরাণ (রাঃ) আরো বললেন– اَوْ وَ جَدْتُّمْ فِىْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَمِنْ كُلِّ كَذَا وَكَذَا شَاةٌ كَذَا وَكَذَا بَعِيْرًا اَوْ وَ جَدْتُّمْ هٰذَا فِى الْقُرْاٰنِ؟ 'প্রত্যেক চল্লিশ দিরহামে এক দিরহাম জাকাত দিতে হবে, বকরীতে কয়টি, উটে কয়টি, জাকাতের এসব নিসাব

কি কোরআনে দেখতে পাও?' জবাবে উক্ত ব্যক্তি বললো– না, তা পাওয়া যায় না। তখন হযরত ইমরাণ (রাঃ) বললেন–فَعَمَّنْ اَخَذْ تُمْ هٰذَا اَخَذْتُمُوْهُ عَنَّا وَاَخَذْنَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– (رواه سنن ابى داؤد) 'তাহলে নামাজ, জাকাত, হজ্জ ইত্যাদী সম্পর্কিত বিধি-বিধান কার কাছ থেকে জানতে পারলে? এসবই আমাদের সাহাবায়ে কেরামের নিকট থেকে জেনেছো। আর আমরা জেনেছি নবী করীম (সাঃ) এর হাদীস থেকে।' (সুনানু আবি দাউদ)

এ হাদীসের ভিত্তিতে মুহাদ্দিসীনে কেরাম এক বাক্যে যে মূলনীতি গ্রহণ করেছেন তা হচ্ছে–

فَاُصُوْلُ جَمِيْعِ الْمَسَائِلِ ذُكِرَتْ فِى الْقُرْاٰنِ وَاَمَّا تُفَارِيْعُهَا فَبَيَانُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ–

'সমগ্র বিষয়ের মূল বিধান কোরআনে উল্লেখিত। আর এ ব্যাপারে সকল বিষয়ের শাখা-প্রশাখা, খুটি-নাটি, ব্যবহারিক নিয়ম-নীতি নবী করীম (সাঃ) এর বর্ণনা থেকে জানা গেছে।' (তাফসীরে মাহাসীন আত্ তাবীল, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ১৯১)

ইমাম আবু হানীফা (রাহঃ) বলেছেন–لَوْ لَاالسُّنَّةُ مَا فَهِمَ اَحَدٌ مِّنَّا الْقُرْاٰنَ (مقدمة الميزان للشعرانى– ص ٥٢) 'সুন্নাত বা হাদীসের অস্তিত্ব না হলে আমাদের মধ্যে কেউ-ই কোরআন বুঝতে সক্ষম হতো না।' তিনি আরো বলেছেন–اِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِىْ وَاتْرُكُوْا قَوْلِى بِخَبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– (شرح فقه الاكبر)

'আমার প্রদত্ত বিভিন্ন মাসায়েলের মতামতের বিপরীত বিশুদ্ধ হাদীস পাওয়া গেলে তখন আমার মত পরিত্যাগ করে নবী করীম (সাঃ)-এর হাদীসই গ্রহণ করতে হবে এবং সেটাই আমার মাযহাব।'

চার মাযহাবের সম্মানিত ইমামগণ কোরআন- হাদীস অনুযায়ী মুসলমানদের জীবন পরিচালনার জন্য যে অক্লান্ত সাধনা করে গেছেন তজ্জন্য মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁদেরকে জান্নাতের উঁচু মাকামে অধিষ্ঠিত করুন। পরিশেষে বলতে চাই, 'ফিক্হুল হাদীস' গ্রন্থটি নবী করীম (সাঃ) এর সেই বিশুদ্ধ হাদীসগুলো দিয়েই মণি-মুক্তার মালার মতো করে সাজানো হয়েছে। পবিত্র হাদীস অনুসরণ করার জন্য এটি একটি নির্ভরযোগ্য কিতাব। আমি সম্মানিত লেখকের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবনসহ এ কিতাবের বহুল প্রচার কামনা করছি। আমীন।

আল্লাহ তা'য়ালার অনুগ্রহের একান্ত ভিখারী
সাঈদী
আরাফাত মন্যিল
৯১৪, শহীদ বাগ-ঢাকা

প্রথম খন্ডের ভূমিকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ الْقُرْاٰنَ لَنَا نُوْرًا وَهِدَايَةً وَجَعَلَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِمَامًا وَقُدْوَةً وَاَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ الَّذِىْ اَرْسَلَهُ اِلٰى كَافَّةِ النَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَاَنْطَقَهُ بِالْحِكْمَةِ وَعَصَمَهُ عَنِ الْهَوٰى حَيْثُ قَالَ "وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْىٌ يُّوْحٰى"- اَمَّا بَعْدُ، قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ -

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমার সুন্নাতের এবং হিদায়াত প্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের অনুসরণ করা তোমাদের জন্যে ওয়াজিব।"

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সমগ্র জগৎ সৃষ্টি করে মানুষকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ হিসেবে ঘোষণা করেছেন। শ্রেষ্ঠ হবার পরেও মানব গোষ্ঠীর এ যোগ্যতা নেই যে তারা তাদের সার্বিক সমস্যার সমাধান স্বয়ং প্রণয়ন করবে। কেননা সৃষ্টির পক্ষে এ কথা জানা কোনোক্রমেই সম্ভব নয় যে, তার প্রকৃত সমস্যা কি? সমস্যাসমূহের উৎসমুখই বা কি? সমস্যার শান্তিপূর্ণ চিরস্থায়ী সমাধানই বা কি? কারণ এসব বিষয় কেবলমাত্র তাঁর পক্ষেই জানা সম্ভব, যিনি সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষেই সম্ভব তাঁর সৃষ্টির সার্বিক সমস্যা সম্পর্কে অবহিত থাকা এবং সকল সমস্যার সমাধান প্রদান করা।

আর ঠিক এ কারণেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানব গোষ্ঠী সৃষ্টি করে পৃথিবীতে সমস্যা সঙ্কুল পরিবেশে ছেড়ে দেননি। মানব সম্প্রদায়কে পৃথিবীতে প্রেরণ করার সাথে সাথে তাঁদের উদ্ভূত সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যেও নবী-রাসূল প্রেরণ করে তাদের মাধ্যমে জীবন বিধান দান করেছেন। নবী-রাসূল প্রেরণের ধারাবাহিকতায় সর্বশেষে যাঁকে প্রেরণ করা হয়েছে তিনি হলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁকে কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের জন্যে অনুসরণীয় একমাত্র নেতা হিসেবে নির্বাচিত করে আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা করেছেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই তোমাদের জন্যে একমাত্র আদর্শ নেতা এবং তোমাদের সকল সমস্যার সমাধান নিহিত রয়েছে শুধুমাত্র তাঁরই অনুসরণের মাধ্যমে।

আল্লাহ তা'য়ালা যে জীবন বিধান অবতীর্ণ করেছেন, তা কিভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে, এ দায়িত্বও তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অর্পণ করেছিলেন। তিনি সে দায়িত্ব সর্বোচ্চ প্রশংসনীয় পন্থায় পালন করে মানুষকে দেখিয়েছেন, সমস্যা মুক্ত শান্তিপূর্ণ জীবন-যাপন করতে হলে কিভাবে আল্লাহ তা'য়ালার আদেশ-নিষেধ বাস্তবায়ন করতে হয়। সুতরাং আল্লাহ কর্তৃক অবতীর্ণ বিধান নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে বাস্তবায়ন করেছেন, ঠিক একইভাবে বাস্তবায়ন করা মুসলিম উম্মাহ্‌র প্রতি ফরজ। অর্থাৎ ইসলামী শরীয়াতের বিধা-বিধান অনুধাবন, অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে

কেবলমাত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রদর্শিত পন্থায়। কেননা ইসলামী শরীয়াত আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর প্রতিই অবতীর্ণ করেছেন এবং তাঁকেই তা বাস্তবায়ন করে মানুষের জন্যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করার দায়িত্ব অর্পন করেছিলেন। বলা বাহুল্য, শরীয়াতের যাবতীয় বিধি-বিধান রচিত হয়েছে পবিত্র কোরআন ও হাদীস অনুযায়ী।

এক শ্রেণীর লোকজন প্রশ্ন করে থাকেন, আল্লাহ তা'য়ালার কোনো শরিক নেই, তিনি এক এবং একক। তিনি মানব মন্ডলীকে সঠিক পথপ্রদর্শনের জন্যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেই নির্বাচিত করেছেন, তাঁর নবুওয়াতে কাউকেই শরীক করেননি। কোরআনও একটি, সকল মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্যে ইসলামও একটি। তাহলে মাযহাব চারটি কেনো হলো?

এক মাযহাবে যা বৈধ অন্য মাযহাবে তা কেনো অবৈধ হলো?

মাযহাব অনুসরণ করা কি ফরজ?

যদি তা ফরজ হয়ে থাকে তাহলে সাহাবায়ে কেরামের মাযহাব কোন্‌টি ছিলো?

ইসলাম, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন ও আইয়িম্মায়ে মুজতাহেদীনের সঠিক ইতিহাস সম্পর্কে যাদের সম্যক ধারণা নেই, তাদের মনে এ সকল অমূলক প্রশ্ন ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি করে এবং তা দূর করার লক্ষ্যে তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঐ সকল লোকদেরই দ্বারস্থ হয়, যারা তাদেরই অনুরূপ। ফলে সঠিক ধারণা লাভের পরিবর্তে তারা নব্য ফিতনায় পতিত হন। আবার এই অজ্ঞতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সুযোগ সন্ধানী দুশমনরা মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্যের বীজ সফলভাবেই বপন করে মুসলিম সমাজে ফাটল সৃষ্টি করে।

একটু অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই এ কথা দিবালোকের মতোই স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, ইসলামে কোনো পার্থক্য নেই এবং জেনে না জেনে মাযহাবের নামে যারা পার্থক্য সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালাচ্ছে তাদের কথার কোনোই ভিত্তি নেই। প্রকৃত বিষয় হলো, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পরে সাহাবায়ে কেরাম ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রচার, প্রসার, প্রতিষ্ঠা ও কর্ম ব্যাপদেশে বিশাল বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়েন। ফলে প্রতিষ্ঠিত হয় এক বিশাল ইসলামী সাম্রাজ্য। ঠিক এ কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক বর্ণিত হাদীসসমূহ আরব সাম্রাজ্যসহ এর বাইরেও অগণিত সাহাবায়ে কেরামের কাছে গচ্ছিত ছিলো। স্মরণে রাখতে হবে, সে সময় পর্যন্ত হাদীস লিপিবদ্ধ করা হয়নি বা এ কর্মপন্থাও তখন পর্যন্ত অনুসরণ করা হয়নি।

উক্ত মহৎ কাজটি সম্পাদনের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হবার সাথে সাথে ইমামগণ দ্রুততার সাথে হাদীস সংগ্রহের কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিত করেন। তাঁরা প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার মাধ্যমে হাদীস সংগ্রহ করেন, গবেষণার কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং সকলেই একবাক্যে ঘোষণা করেন, "কোরআনুল কারীম এবং সহীহ্ হাদীসই আমাদের মাযহাব"।

ইমাম আবু হানীফা (রাহঃ) ও ইমাম শাফী (রাহঃ) স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন–

لَيْسَ اَحَدٌ بَعْدَ النَّبِيِّ اِلاَّ وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِه وَيُتْرَكُ اِلاَّ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে সকলের কথা ও কাজ গ্রহণ-বর্জন করা

যেতে পারে, কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা ও কর্মসমূহ অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।"

ইমাম আহ্মাদ (রাহঃ) বলেছেন, আমার অনুসরণ করো না, ইমাম মালেক (রাহঃ), ইমাম শাফী (রাহঃ), ইমাম আজওয়াযী (রাহঃ) ও ইমাম সাওরী (রাহঃ)-এরও অনুসরণ করো না।

خُذُوْا مِنْ حَيْثُ اَخَذُوْا -

"তাঁরা যে উৎস থেকে সকল সমস্যার যে সমাধান গ্রহণ করেছেন, মাসআলা গ্রহণ করেছেন তোমরাও সেই একই উৎস থেকে সমাধান ও মাসআলা গ্রহণ করো।"

বক্ষমান গ্রন্থে হাদীস শাস্ত্রের গবেষক সকল ইমামকেই আমি ব্যক্তিগতভাবে সম্মান-মর্যাদা ও শ্রদ্ধার উচ্চ আসনে আসীন রেখেছি এবং সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই আমি গবেষণা ধর্মী মূল্যবান কিতাব অনুসরণ করে এ কিতাব রচনা করার চেষ্টা করেছি। বয়সের এক বিশেষ প্রান্তে আমি উপনীত হয়েছি এবং জীবনের অধিকাংশ দিনগুলো এখন পর্যন্ত প্রবাসেই অতিবাহিত হচ্ছে। এ বয়সে প্রশংসা, যশ বা খ্যাতি লাভের কোনোই আকাঙ্খা আমার নেই। কেবলমাত্র আমার মালিক মহান আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টির লক্ষ্যেই এই বৃদ্ধ বয়সে কয়েক বছর যাবৎ অবর্ণনীয় শ্রম ব্যয় করে অগণিত কিতাব থেকে সংগ্রহ করে এ কিতাব রচনা করেছি। যেনো সাধারণ মানুষ অতি সহজেই হাদীস থেকে দৈনন্দিন জীবনের একান্ত প্রয়োজনীয় মাসায়েল সম্পর্কে জেনে সঠিক পথ অনুসরণ করতে সক্ষম হন।

ইসলামের শত্রুরা ইসলামকে সন্ত্রাসী আদর্শ ও মুসলমানদেরকে সন্ত্রাসী হিসেবে চিত্রিত করার লক্ষ্যে সূচনা থেকে এ পর্যন্ত নানা কৌশলে অস্ত্র ছুড়েছে, 'ইসলামের ইতিহাস থেকে রক্তের গন্ধ আসে'। শত্রুদের ছুড়ে দেয়া এ ভোঁতা অস্ত্রে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত নেতৃত্ব স্থানীয় কিছু সংখ্যক মুসলমান ইতোমধ্যেই ঘায়েল হয়ে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার পরিবর্তে ভিন্ন আদর্শের প্রতি মনোযোগী হবার জন্যে মুসলিম জনগোষ্ঠীকে আহ্বান জানানো শুরু করেছেন। তাদের ভ্রান্তি দূর করার লক্ষেই আমি আমার সাধ্যানুসারে ইসলামে জিহাদের প্রকৃত রূপ এ কিতাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। শত্রুপক্ষের বিভ্রান্তিমূলক প্রচার, "জিহাদ মানেই রক্তারক্তি, যুদ্ধ, প্রাণহানী, অমুসলিম নিধন, মানবাধিকার লংঘন, অমুসলিম দেশ ও তাদের সম্পদ জোরপূর্বক দখল" ইত্যাদি মন্তব্য যে সম্পূর্ণ বিদ্বেষমূলক তা স্পষ্ট হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

বক্ষমান গ্রন্থ বহুলাংশে হাদীস নির্ভর এবং এ গ্রন্থের নামও চয়ন করা হয়েছে 'ফিক্হুল হাদীস'। হাদীস সম্পর্কে কিছুটা ধারণা যেনো পাঠক-পাঠিকাগণ লাভ করেন, এ কারণে হাদীস সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছুটা আলোকপাত করছি।

হাদীসের পরিচয়

ইসলামের মূল ভিত্তিই হলো কোরআন এবং হাদীস। আল্লাহর কোরআন যেখানে মানব জীবন বিধানের মৌলিক নীতিমালা উত্থাপন করে, সেখানেই হাদীস থেকে লাভ করা যায় ক্ষুদ্র থেকে বৃহত্তর বিধানের বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও কোরআনের মূলনীতিসমূহের বাস্তবায়নের কার্যকর পথ। কোরআন ইসলামী প্রদীপের স্তম্ভ আর হাদীস হলো এর বিচ্ছুরিত আলোকচ্ছটা। আলো ব্যতীত যেমন প্রদীপের কল্পনাও করা যায় না, তেমনি হাদীসকে অস্বীকার করলে স্বয়ং কোরআনও অর্থহীন বিষয়ে পরিণত হয়। কোরআন হলো ইসলামের বিশাল বৃক্ষের মূল ও কান্ড এবং হাদীস

হলো এর শাখা-প্রশাখা। কান্ড ও মূল নিষ্ফল আবর্জনায় পরিণত হয়, যদি শাখা-প্রশাখা না থাকে। মহাগ্রন্থ আল কোরআন যেমন ইসলামের জীবন স্তম্ভের পরিকল্পিত চিত্র, সে অনুযায়ী নির্মিত স্তম্ভই হলো হাদীস। স্তম্ভ রচনার পরিকল্পনা সহকারে রাসূল প্রেরণের নিয়ম আল্লাহর বিধান অবতীর্ণ হবার সূচনা লগ্ন থেকেই কার্যকর। কাল ও যুগের যে কোনো স্তরে, পরিবর্তিত অবস্থায় যে কোনো পর্যায়ে মূল পরিকল্পনা অনুসারে স্তম্ভ রচনায় রাসূলের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বাস্তব কাজের আদেশ, পরামর্শ ও উপদেশকে উপেক্ষা করা কখনোই সম্ভবপর নয়। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে কোরআন হলো হার্ট বা হৃৎপিন্ড আর হাদীস হলো এই হৃৎপিন্ডের সাথে সংযুক্ত প্রধান ধমনী।

ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশাল-বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে হাদীস নামক এই ধমনী প্রত্যেক মুহূর্তে সজীব ও তপ্ত শোণিতধারা প্রবাহিত করে এর প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে অব্যাহতভাবে সতেজ, প্রাণবন্ত ও কার্যক্ষম করে রাখে। হাদীস একদিকে যেমন কোরআনের অভ্রান্ত ব্যাখ্যা দেয়, অনুরূপভাবে হাদীসই উপস্থাপন করে পবিত্র কোরআনর বাহক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবন-চরিত, কর্মনীতি-পদ্ধতি ও আদর্শ এবং তাঁর কথা, কাজ, হিদায়াত জ্ঞানগর্ভ কল্যাণময় উপদেশের বিস্তারিত বিবরণ। এ কারণে ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বিজ্ঞানময় কোরআনের পর পরই এবং কোরআনের সাথে সাথেই হাদীসের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য করা যেমন তাঁর রাসূলের আনুগত্য ও বাস্তব অনুসরণ ব্যতীত সম্ভবপর নয়, তেমনিভাবে হাদীসকে ত্যাগ করে কোরআন অনুসারে জীবন পরিচালনা করাও সম্ভবপর নয়। প্রকৃতপক্ষে হাদীস ও হাদীস সম্পর্কিত জ্ঞান-বিজ্ঞান ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ও ইসলামী জ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে এক অমূল্য অতুলনীয় ও অপরিহার্য মহাসম্পদ।

হাদীসের সংজ্ঞা

ইমাম রাগিব ইস্পাহানী হাদীস শব্দের অর্থ বিশ্লেষণপূর্বক উল্লেখ করেছেন, 'হাদীস আর হুদুস বলতে কোনো একটি অস্তিত্বহীন জিনিসের অস্তিত্ব লাভ করা, তা কোনো মৌলিক জিনিস হোক অথবা অমৌলিক। আর মানুষের কাছে কানে বা ওহীর মাধ্যমে ঘুমের জগতে বা জাগ্রত অবস্থায় যে কোনো কথা পৌছায়, তাকেই হাদীস বলে।' আরবী অভিধান ও কোরআনে ব্যবহারের দৃষ্টিতে হাদীস শব্দের অর্থ কথা, বাণী, সংবাদ, খবর, ব্যাপার ও বিষয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহর সংবাদ পৌছানোর লক্ষ্যে মানুষের সাথে কথা বলতেন, নিজের কথার মাধ্যমে ইসলামের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কথা, তথ্য ও তত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রদান করতেন, নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিয়ে দিতেন, বক্তৃতা ও ভাষণের মাধ্যমে আল্লাহর কোরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতেন, এ কারণেই তা হাদীস নামে অভিহিত করা হয়েছে। তিনি বিশেষ যত্ন, সতর্কতা ও চেষ্টা-সাধনার মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরামকে ইসলামের উন্নত আদর্শের ভিত্তিতে গড়েছেন, তাঁদের চরিত্র, চিন্তাধারা, বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি এবং নীতি-নৈতিকতা ইসলামের সুমহান উন্নত মানে গঠন করেছেন। এ কারণেই সাহাবায়ে কেরামের যে সকল কথা ও কাজকে আল্লাহর নবী অনুমোদন করেছেন, সমর্থন দিয়েছেন এবং তাঁদের যে সকল কাজ-কর্ম দেখে, কথা শুনে প্রতিবাদ করেননি, নীরবতা অবলম্বন করেছেন, তারও নামকরণ করা হয়েছে হাদীস।

মোট কথা, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, কাজকর্মের বিবরণ ও সমর্থন-অনুমোদনকেই হাদীস বলা হয়েছে। একটি হাদীস থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, তিনি

স্বয়ং একে হাদীস নামকরণ করেছেন। হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁর কাছে জানতে চাইলেন, 'সবথেকে সৌভাগ্যবান লোক কে, যে লোক আখিরাতের দিন রাসূলের সুপারিশ লাভে ধন্য হবে? তখন তিনি বললেন–

لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ اَلاَّ يَسْئَلَنِىْ اَحَدٌ عَنْ هَذَا الْحَدِيْثِ اَوَّلَ مِنْكَ لَمَّا رَاَئَيْتُكَ مِنْ حِرْ عَلَى الْحَدِيْثِ– (صحيح البخارى ج– ٢، كتاب الرقاق باب يدخل الجنة سبعون الفابغير)

আমি মনে করি, এই হাদীস সম্পর্কে তোমার পূর্বে আর কেউই আমাকে প্রশ্ন করেনি। বিশেষত এই কারণে যে, হাদীস শোনার জন্য তোমাকে সর্বাধিক চেষ্টিত ও আগ্রান্বিত দেখতে পাচ্ছি।' (বোখারী)

মহাগ্রন্থ আল কোরআন ইসলামী জীবন দর্শনের সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। এই গ্রন্থ সর্বশেষ নবীর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইসলামের নবী-রাসূল, ইসলামী জীবন বিধানের প্রচারক, প্রতিষ্ঠাতা এবং মানবতার পথপ্রদর্শক ও শিক্ষক হিসেবে প্রেরণ করেছেন। তিনি এই মহান পবিত্র গ্রন্থ কোরআনুল কারীম সূচনা থেকে সমাপ্ত পর্যন্ত পাঠ করে মানুষকে শুনিয়েছেন, অগণিত সাহাবায়ে কেরাম তা সাথে সাথে মুখস্থ করেছেন, এর অর্থ ও ভাব যত্ন ও আন্তরিকতা সহকারে বুঝে হৃদয়ঙ্গম করে নিয়েছেন। সর্বোপরি আল্লাহর রাসূল নিজের জীবনধারা, চিন্তা-চেতনা বিশ্বাস, কাজকর্ম, আচরণ-ব্যবহার ও বাস্তব অনুসরণের মাধ্যমে ইসলামের মূল বিধান শিক্ষা, উপদেশ ও আদেশ-নিষেধকে বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছেন।

অর্থাৎ একটি জাতিকে তিনি এই আদর্শের ভিত্তিতে পরিপূর্ণভাবে গঠন করেছেন। প্রকৃতপক্ষে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান জীবনই ছিলো কোরআনের তথা ইসলামের বাস্তব রূপ ও কোরআনের আদর্শের কর্মরূপ। সুতরাং ইসলামী জীবন বিধান সম্পর্কে তাঁর যাবতীয় কথা, কাজ অনুমোদন ও সমর্থনকে ইসলামী পরিভাষায় বলা হয়েছে হাদীস। হাদীস একটি আভিধানিক শব্দমাত্র নয়– মূলত এটা ইসলামের একটি বিশেষ পরিভাষা। সে অনুসারে আল্লাহর রাসূলের যে কথা, যে কাজের বিবরণ অথবা কথা ও কাজের সমর্থন এবং অনুমোদনসহ বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত, ইসলামী শরিয়াতের পরিভাষায় তাই হাদীস নামে অভিহিত হয়। হাদীসকে আরবী ভাষায় খবরও বলা হয়। কিন্তু পার্থক্য হলো, খবর শব্দটি হাদীস শব্দের তুলনায় ব্যাপক অর্থবোধক। খবর শব্দের মাধ্যমে যুগপৎভাবে হাদীস ও ইতিহাস উভয়কেই বুঝায়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, কাজ ও সমর্থন অনুমোদন এবং তাঁর অবস্থার বিবরণকে হাদীস নামে অভিহিত করা কোনো মনগড়া বিষয় নয়। পবিত্র কোরআনে এর অকাট্য প্রমাণ রয়েছে।

হাদীসের মূল উৎস

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যে ওহী অবতীর্ণ করেছেন, সেটাই হচ্ছে হাদীসের মূল উৎস। মহান আল্লাহর প্রেরিত ওহী প্রধানত দুই ধরনের। প্রথম প্রকারের ওহীকে বলা হয় 'ওহী'য়ে মত্লু'– সাধারণ পঠিতব্য ওহী এবং এই

একে ওহীয়ে জ্বলীও বলা হয়। আর দ্বিতীয় ধরনের ওহী হলো, 'ওহীয়ে গায়র মত্‌লু'। এই ওহী সাধারণত তিলাওয়াত করা হয় না। এর অন্য নাম হলো, 'ওহীয়ে খফী বা প্রচ্ছন্ন ওহী।' এ থেকে জ্ঞান লাভ করার সূত্র এবং সূত্রলব্ধ জ্ঞান উভয়ই বুঝানো হয়। ইসলামী শরীয়াতের মূলভিত্তি হিসেবে কোরআনের পরেই হাদীসের স্থান। আল্লাহর হিদায়াত ও নির্ভুল নির্ভরযোগ্য সত্য জ্ঞানের যে উৎস থেকে কোরআন অবতীর্ণ, হাদীসও ঠিক সেই নির্ভুল উৎস থেকেই নিঃসৃত।

কোরআন ও হাদীসের পার্থক্য

কোরআন ও হাদীস উভয়ই ওহীর উৎস থেকে উৎসারিত হলেও এই দুটোর মধ্যে নানা দিক দিয়ে পার্থক্য বিদ্যমান। আল্লাহর কোরআন হলো এক অপূর্ব মু'জিযা। এই কিতাব শুধুমাত্র ভাষা, শব্দ ও সাহিত্যের দিক দিয়েই মু'জিযা নয়, এর বিষয়বস্তু, আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপকতা, প্রসারতা, গভীরতা ও সুক্ষতা এবং এর উপস্থাপিত মানব কল্যাণের পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থাও এক অপূর্ব চরম বিস্ময়কর মু'জিযা। প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বোত্তম কালাম হচ্ছে কোরআনুল কারীম, এর অলৌকিক বৈশিষ্ট্যের কারণে তা কালজয়ী, সর্বপ্রকার পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন-সংযোজন থেকে চিরসুরক্ষিত, অযু ব্যতীত তা স্পর্শ ও পাঠ করা নিষিদ্ধ। নামাজে তা সুনির্দিষ্টভাবে পাঠ করা অবশ্য কর্তব্য।

কিন্তু হাদীসমূহ কোরআনের অনুরূপ কোনো মু'জিযা নয়। হাদীসের মূল কথাটিই শুধু ওহীর মাধ্যমে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বচ্ছ ও পবিত্র হৃদয়পটে প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি নিজ ভাষায় তা মানুষের সম্মুখে পেশ করেছেন। এ জন্য হাদীসের ভাষা 'মত্‌লু' নয়, এর ভাষা ও শব্দের তিলাওয়াত করা বাধ্যতামূলক নয়। এর মূল বক্তব্য ও ভাবধারা অনুসরণ করার জন্যেই শরীয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ কারণেই হাদীসকে ওহীয়ে গায়র মত্‌লু নামে অভিহিত করা হয়। কিন্তু কোরআনুল কারীমের ভাষা, ভাব ও শব্দ যাবতীয় কিছুই মহান আল্লাহর কাছ থেকে অবতীর্ণ।

হাদীসের প্রয়োজনীয়তা

হাদীস হলো কোরআনুল কারীমের ব্যাখ্যাতা ও বিশ্লেষণকারী। হাদীসের সাহায্য গ্রহণ ব্যতীত কোরআনের যথাযথ ব্যাখ্যা ও অর্থ করা, এর প্রকৃত উদ্দেশ্য ও ভাবধারা নিরূপন করা মারাত্মক কঠিন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ জন্যই নিজের ইচ্ছানুসারে কোরআনের তাফসীর বা ব্যাখ্যা সম্পর্কে কঠোর সাবধান বাণী উচ্চারণ করে বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নিজের মতামত অনুসারে কোরআনের ব্যাখ্যা করে সে যেনো জাহান্নামে নিজের আসন সন্ধান করে নেয়।' (তিরমিযী)

আরেক হাদীসে বলা হয়েছে, 'যে ব্যক্তি নিজের মতামত অনুযায়ী কোরআনের অর্থ করে, তার ব্যাখ্যা নির্ভুল হলেও সে ভুল করে।' (তিরমিযী)

প্রকৃতপক্ষে মানুষের বুদ্ধি যতোই প্রখর, তীক্ষ্ম ও সুদূর প্রসারী হোক না কেনো, তা অবশ্যই সীমাবদ্ধ। একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত মানুষের বুদ্ধি পৌঁছে ব্যর্থ হতে ও নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করতে বাধ্য, কিন্তু বুদ্ধিবাদ বা বুদ্ধির পূজা কোনো সীমা মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। বুদ্ধি ও বিবেক শক্তি যদি রাসূলের সুন্নাত দিয়ে নিয়ন্ত্রিত না হয়, তাহলে বুদ্ধিবাদ ও বিবেক পূজার নামান্তর।

এই বুদ্ধিবাদ ও বিবেক পূজা মানুষকে আল্লাহর আনুগত্যের সীমা লংঘন করতে বাধ্য করে। উপরন্তু তাতে একদিকে যেমন কোরআনের অপব্যাখ্যা, ভুল ও বিপরীত ব্যাখ্যা হয় বলে এর প্রতি জুলুম করা হয় এবং মানুষ এ কারণেই কোরআন মেনে চলার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। অন্যদিকে তেমনি কোরআনের প্রতি বিশ্বাসী ও নির্ভরশীল মানুষের মধ্যে কঠিন মতবৈষম্য সৃষ্টি ও বিভিন্ন সাংঘর্ষিক মতাদর্শ বা দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভব হবার ফলে মুসলিম উম্মাহ্ বহুধা বিভক্ত হয়ে পড়ে।

অনেক মানুষ আবার এই সুযোগে কোরআন নিয়ে স্বেচ্ছাচারিতা শুরু করে। কোরআনের ছত্রে ছত্রে নিজেদের মনগড়া বা পরকিয় চিন্তার পাঠ গ্রহণ করতে শুরু করে। কিন্তু রাসূলের হাদীস এই পথে প্রবল বাধার সৃষ্টি করে এবং এটাই মানুষের সম্মুখে হিদায়াতের প্রশস্ত পথ উপস্থাপিত করে, পথভ্রষ্টতা ও বিভ্রান্তি থেকে মানুষকে রক্ষা করে ও সঠিক সরল-সহজ পথে পারিচালিত করে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরআনের বাহক, কোরআন তাঁরই প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু তিনি শুধুমাত্র কোরআনই মানুষের সম্মুখে পেশ করেননি। কোরআনকে ভিত্তি ও কেন্দ্র করে তিনি ইসলামের এক পূর্ণাঙ্গ বিধান উপস্থাপিত করেছেন। এ কারণে তিনি নিজে কোরআনের সাথে সাথে সুন্নাত ও হাদীসের গুরুত্বের কথা বিভিন্নভাবে ঘোষণা করেছেন। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীস উল্লেখ করা যেতে পারে। হযরত মিকদাম ইবনে মা'দি কারাব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন, 'সাবধান! আমাকে কোরআন দেয়া হয়েছে এবং সেই সাথে সাথে এরই অনুরূপ আরেকটি জিনিস। সাবধান! সম্ভবত কোনো সুখী ব্যক্তি তার বড় মানুষির আসনে বসে বলতে শুরু করবে যে, তোমরা কেবলমাত্র এই কোরআনকেই গ্রহণ করো, এতে যা হালাল দেখবে তাকেই হালাল এবং যা হারাম দেখবে তাকেই হারাম মনে করবে। অথচ প্রকৃত বিষয় হলো, রাসূল যা হারাম করেছেন, তা আল্লাহ্ কর্তৃক ঘোষিত হারামের মতোই মাননীয়।' (ইবনে মাজা, আবু দাউদ)

আরেক হাদীসে বলা হয়েছে, 'সম্ভবত এক ব্যক্তি তার আসনে হেলান দিয়ে বসে আমার বলা কথার উল্লেখ করবে এবং বলবে, তোমাদের ও আমাদের মধ্যে একমাত্র আল্লাহর কিতাব রয়েছে। এতে যা হালাল পাবো তাকেই হালাল মনে করবো। আর যা হারাম পাবো তাকেই হারাম হিসেবে গ্রহণ করবো। এরপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সাবধান! আল্লাহর রাসূল যা হারাম করেছেন, তা আল্লাহর নির্দিষ্ট করা হারামেরই অনুরূপ।' (সুনানে দারেমী)

কোরআনের সাথে সাথে হাদীসও গ্রহণ করতে হবে এবং কোনো বিশুদ্ধ হাদীসই যে কোরআনের বিপরীত হতে পারে না, তা আরেকটি হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত। হযরত সাঈদ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু একটি হাদীস বর্ণনা করলেন। উপস্থিত একজন প্রতিবাদ করে বললেন, 'এ প্রসঙ্গে কোরআনে এমন কথা রয়েছে যা এই হাদীসের বিপরীত। তখন হযরত সাঈদ বললেন, আমি তোমার কাছে রাসূলের হাদীস বর্ণনা করছি। আর তুমি আল্লাহর কিতাবের সাথে এর বিরোধিতার কথা বলো? অথচ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে তোমার থেকে অনেক বেশী জ্ঞান রাখতেন।' (সুনানে দারেমী)

সত্য-সঠিক, সহজ-সরল পথে চলা এবং পথভ্রষ্টতা থেকে মুক্ত থাকা কোরআন ও হাদীস উভয়ই মেনে ও পালন করে চলার ওপর নির্ভর করে। এ প্রসঙ্গে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমি তোমাদের মধ্যে দুইটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, এই দুইটি অনুসরণ করতে থাকলে এরপর তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। তা হলো, আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাহ্ (হাদীস) এবং কিয়ামতের দিন হাওযে কাওসার-এ উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত দুইটি জিনিস পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না।' (মুস্তাদরাক হাকেম)

বিদায় হজ্জের ভাষণে তিনি বলেছেন, 'দুইটি জিনিস, যা আমি তোমাদের মধ্যে রেখে যাচ্ছি, তোমরা যতক্ষণ এই দুইটি জিনিস দৃঢ়ভাবে ধারণ করে থাকবে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। তা হলো, আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাত।' (মুস্তাদরাক হাকেম)

প্রাথমিক যুগের চিন্তাবিদগণ এর গুরুত্ব পূর্ণমাত্রায় অনুধাবন করতেন। সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈ ও তাবে তাবেঈন সকলেই কোরআনের সাথে সাথে হাদীসকেও অবশ্য পালনীয় বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন। মকহুল দেমাশ্কী বলেছেন, 'কোরআন হাদীস বা সুন্নাতের প্রতি অধিকতর মুখাপেক্ষী, সুন্নাত কোরআনের প্রতি ততটা নয়।' ইমাম আওয়াযীও এই একই কথা বলেছেন, 'আল্লাহর কিতাব ব্যাখ্যার জন্য সুন্নাত অধিক প্রয়োজনীয় কিন্তু সুন্নাত ব্যাখ্যার জন্য কোরআনের প্রয়োজন ততটা নয়।' ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবী কাসির বলেছেন, 'সুন্নাত বা হাদীস কোরআনের তুলনায় অধিক ফয়সালাকারী, কোরআন সুন্নাতের বিপরীত ফায়সালা দিতে পারে না।' ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল এই দুইটি কথার ব্যাখ্যাদান করতে গিয়ে বলেছেন, 'সুন্নাত বা হাদীস কোরআনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণকারী এবং সুন্নাত এর অর্থ প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করে।'

শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ দেহ্লভী (রাহঃ) হাদীসের গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা এভাবে উপস্থাপন করেছেন, 'ইলমে হাদীস সকল প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের তুলনায় অধিক উন্নত, উত্তম এবং দ্বীন ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ভিত্তি। হাদীসে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরামের থেকে নিঃসৃত কথা, কাজ ও সমর্থন বর্ণিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটা অন্ধকারের মধ্যে আলোকস্তম্ভ, এটা যেনো এক সর্বদিক উজ্জ্বলকারী পূর্ণ চন্দ্র। যে এর অনুসারী হবে ও একে আয়ত্ত করে নিবে, সে সৎপথ লাভ করবে। সে লাভ করবে বিপুল কল্যাণ। আর যে একে অগ্রাহ্য করবে, তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, সে পথভ্রষ্ট হবে, লালসার অনুসারী হবে, পরিণামে সে অধিক মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক কিছু করতে নিষেধ করেছেন, অনেক কাজের আদেশ করেছেন। পাপের পরিণাম সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করেছেন। নেক কাজের সুফল পাবার সুসংবাদ দিয়েছেন। তিনি অনেক দৃষ্টান্ত দিয়ে লোকদের নসীহত দান করেছেন। সুতরাং তা নিশ্চয়ই কোরআনের মতো অথবা ততোধিক গুরুত্বপূর্ণ।' (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা-১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১)

তিনি আরো বলেছেন, 'সুন্নাত বা হাদীস কোরআনেরই ব্যাখ্যা এবং তা কিছুমাত্র বিরোধিতা করে না।' ইমাম আবু হানিফা (রাহঃ) বলেছেন, 'সুন্নাত বা হাদীসের অস্তিত্ব না হলে আমাদের মধ্যে কেউই কোরআন বুঝতে পারতো না।' রাবিয়া (রাহঃ) বর্ণনা করেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ নবীর প্রতি কোরআন অবতীর্ণ করেছেন অতিশয় বিস্তারিতভাবে, কিন্তু এতে হাদীস ও সুন্নাতের জন্য একটি অবকাশ রেখে দিয়েছেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই সুন্নাত ও হাদীস স্থাপন করেছেন, যদিও তাতে ইজতিহাদ করা বা নিজের মত প্রয়োগের সুযোগও রেখে দেয়া হয়েছে।' (তাফসীরে দুর্‌রে মন্‌সুর, তারিখুত্তাফসীর-পৃষ্ঠা-৪)

ইমাম উবাইদ লিখেছেন, 'আল্লাহ্ ও রাসূলের হালাল ও হারাম সম্পর্কিত আদেশের মধ্যে পার্থক্য নেই, রাসূল এমন কোনো আদেশ দিতেন না, যার বিপরীত কথা কোরআন থেকে প্রমাণিত হতো। বরং সুন্নাত (হাদীস) হচ্ছে আল্লাহ্র অবতীর্ণ করা কিতাবের ব্যাখ্যাতা এবং কোরআনের আইন-বিধান ও শরীয়াতের বিশ্লেষণকারী।' (কিতাবুল আমওয়াল, পৃষ্ঠা-৫৪৪)

হাদীস অস্বীকারকারী কাফির

ইসলামী আইনশাস্ত্রের ইমামগণ সম্পূর্ণ একমত হয়ে ঘোষণা করেছেন যে, হাদীস অমান্যকারী পথভ্রষ্ট, ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়া লোক। ইসহাক ইবনে রাহওয়াই (রাহঃ) বলেছেন, 'যে লোকের কাছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোনো হাদীস পৌঁছলো, সে তার সত্যতা, যথার্থতা স্বীকার করে তা সত্ত্বেও সে যদি কোনো ধরনের কারণ ব্যতীত তা প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে তাকে কাফির মনে করতে হবে।' ইমাম ইবনে হাজম (রাহঃ) তাঁর আল আহ্কাম গ্রন্থে লিখেছেন, 'কোনো ব্যক্তি যদি বলে যে, আমরা শুধু তাই গ্রহণ করবো যা কোরআনে পাওয়া যায়, তা ব্যতীত আর কিছুই গ্রহণ করবো না, তাহলে সে গোটা মুসলিম উম্মাতের ঐকমত্যের ভিত্তিতে কাফির।' হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন, 'খুব দ্রুত এমন সব লোকজন আসবে যারা কোরআনের প্রতি সন্দেহ নিয়ে তোমাদের সাথে বিবাদ করবে, তোমরা তাদেরকে সুন্নাত বা হাদীসের সাহায্যে গ্রেফতার করো। কারণ সুন্নাতের ধারক বা হাদীস বিশারদ মহান আল্লাহ্র কিতাব সম্পর্কে অধিক জ্ঞানের অধিকারী।'

হাদীস থেকে কিভাবে জ্ঞান অর্জন করতে হবে

শয়তান মানুষকে সবথেকে বেশী ধোকা দেয় কোরআন-হাদীস থেকে জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে এবং নামাজ আদায়ের সময়। কারণ এই দুটো কাজ সঠিকভাবে একজন মানুষ আঞ্জাম দিতে পারলে কোরআন-হাদীস থেকে সঠিক পথের দিশা লাভ করে এবং নামাজ আদায়ের মাধ্যমে মহান আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জন করে তথা আল্লাহ্র সৃষ্টি বান্দা হিসেবে সে সফল হয় এবং পরিশেষে জান্নাত লাভ করে। আর শয়তান সবসময় তৎপর থাকে কিভাবে মানুষকে ব্যর্থ করে জাহান্নামের দিকে অগ্রসর করাবে। এ জন্য কোরআন-হাদীস অধ্যয়ন করার সময় যাবতীয়-চিন্তা-চেতনা থেকে মন-মস্তিষ্ক শূণ্য রাখতে হবে, পূর্বে যে ধ্যান-ধারণা মন-মস্তিষ্কে বাসা বেঁধে রয়েছে তা থেকে মুক্ত হয়ে প্রকৃত সত্য গ্রহণের মানসিকতা নিয়ে কোরআন-হাদীস অধ্যয়ন করতে হবে। আর হাদীস অধ্যয়নের ক্ষেত্রে একই ধরনের হাদীস বার বার সম্মুখে আসবে, ইশারা -ইঙ্গিতপূর্ণ কথা আসবে এবং কতক ক্ষেত্রে দুর্বোধ্য কথাও আসতে পারে। এ জন্য যে বিষয়ে হাদীস অধ্যয়ন করা হচ্ছে, সে বিষয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকলে হাদীসের বিষয়বস্তু অধ্যয়নকারীর কাছে স্পষ্ট না হয়ে আরো দুর্বোধ্য হতে পারে।

আইন-কানুন সম্পর্কিত কোনো হাদীস অধ্যয়ন করে সরাসরি সে হাদীস থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে না। এ জন্য অবশ্যই অধ্যয়নকারীকে হাদীসের ব্যাখ্যা গ্রন্থ পাঠ করতে হবে এবং এ হাদীস সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের মতামত অনুসন্ধান করতে হবে। উক্ত হাদীস থেকে সাহাবায়ে কেরাম এবং তৎপরবর্তী যুগ থেকে বর্তমান সময়ের ইসলামী চিন্তাবিদগণ কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, সে ব্যাপারে সম্যক ধারণা থাকতে হবে। কারণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন্ পরিবেশে, কোন্ ক্ষেত্রে এবং কোন্ উপলক্ষ্যে কি রায় দিয়েছেন বা কোন্ কথা বলেছেন, তা জানা একান্ত জরুরী। যে হাদীস যে ঘটনা বা উপলক্ষ্যের সাথে সম্পর্কিত, সেই

ঘটনা বা অনুরূপ ঘটনা, সামঞ্জস্যশীল উপলক্ষ্য ইত্যাদি বিচারপূর্বক হাদীস থেকে রায় গ্রহণ করতে হবে। এ জন্য সরাসরি হাদীস থেকে রায় গ্রহণ না করে কোরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস, এই চারটি জিনিসকে কেন্দ্র করে যে ইসলামী ফিকাহ্ বা আইন শাস্ত্র রচিত হয়েছে, কোনো রায় গ্রহণ করতে হলে, সেই ফিকাহ্ বা ইসলামী আইন শাস্ত্র থেকেই গ্রহণ করতে হবে।

এ কথা স্পষ্ট মনে রাখতে হবে, সর্বপ্রথমেই হাদীস নয়– কোরআন অধ্যয়ন করতে হবে। কোরআনে যে বিষয় অধ্যয়ন করা হচ্ছে, উক্ত বিষয়ে হাদীসের বক্তব্য কি, এটা জানার জন্য কোরআন ও হাদীস পাশাপাশি অধ্যয়ন করলে হাদীস অনুধাবন করা ও এর প্রতি আমল করা খুবই সহজ হয়ে যাবে।

একই বক্তব্য সমন্বিত অনেকগুলো হাদীস রয়েছে, কিন্তু পাঠ করতে গেলে দেখা যাবে যে, বর্ণনায় কিছু পার্থক্য রয়েছে। এর কারণ হলো, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো কথা বলেছেন বা কাজ করেছেন, তখন সেখানে কখনো একজন, দুইজন বা এর অধিক মানুষ উপস্থিত থেকেছে। তাঁদের যিনি যখন যেভাবে শুনেছেন এবং দেখেছেন, সেভাবেই তা বর্ণনা করেছেন। এ কারণেই হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে পার্থক্য সূচিত হয়েছে কিন্তু মূল বিষয়ে কোনো পরিবর্তন হয়নি। আবার কতক হাদীস রূপক অর্থে বর্ণনা করা হয়েছে। কতক হাদীসের বিষয় শুধুমাত্র আল্লাহ তা'য়ালা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথেই সম্পর্কিত। যেমন বাহনের ক্ষেত্রে সে যুগে দূরত্ব অতিক্রম করার জন্য যে বাহন ছিলো, সে সম্পর্কেই বর্ণনা করা হয়েছে। উক্ত বর্ণনা বর্তমান যুগের বাহনের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। এ জন্য হাদীস অধ্যয়নকালে কোনো হাদীস অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়ে হাদীস সম্পর্কে কোনো ধরনের ধৃষ্টতামূলক উক্তি করা যাবে না। এতে গোনাহ্গার হতে হবে। বরং হাদীসটি স্পষ্টরূপে বুঝার জন্য মুহাদ্দিসগণের সাহায্য গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সকলকে কোরআন-হাদীস অনুধাবন করে ইসলামী জীবন বিধান অনুসারে জীবন পরিচালনার তাওফীক দান করুন।

পরিশেষে আমি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে একটি বিষয় সকলের কাছে নিবেদন করতে চাই, আমি একজন মানুষ হিসেবে আমিও ভুলের উর্ধ্বে নই। কোরআন-হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকে যদি এ কিতাবে কোনো ভুল কারো দৃষ্টি গোচর হয়, তাহলে তা আমাকে, সম্পাদককে বা প্রকাশককে জানানোর জন্যে সনির্বন্ধ অনুরোধ করছি। পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ্। এ গ্রন্থ রচনা, প্রকাশ, প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে যার যতটুকু অবদান রয়েছে, মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে সকলকে যথাযথ বিনিময় দান করুন এবং আমার ও তাদের সকলের শ্রম কবুল করে তা সাদকায়ে জারিয়া হিসেবে কবুল করে নিন, আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন।

আব্দুর রউফ বিন সুলাইমান
ইমাম ও খতীব
রা'ফা জামে মসজিদ
উম্মুল কুয়াইন
সংযুক্ত আরব আমিরাত
ফোন : ০০৯৭১-৫০৫২৯০৬৭৭

পৃষ্ঠা	আলোচিত বিষয়

পৃষ্ঠা	আলোচিত বিষয়
৭৮	সাদাকা কোন্ শ্রেণীর মানুষকে দিতে হবে
৭৯	**রোযা অধ্যায়**
৭৯	রোযার সংজ্ঞা
৭৯	ইসলামের প্রথম যুগে রমজানের রোযা
৮০	**রোযার ফজিলত**
৮২	রমজান মাসের গুরুত্ব ও মর্যাদা।
৮৫	রমজান মাসে রোযার আদেশ
৮৫	রোযার প্রকার
৮৬	রমজানের চাঁদ দেখা
৮৭	চন্দ্রোদয়ের পার্থক্য
৮৮	হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর হাদীসের জবাব
৮৯	সন্দেহের দিন রোযা রাখা
৯০	রোযার শর্ত সমুহ
৯১	**রোযার রুকুন**
৯১	রোযা ভঙ্গকারী কাজসমুহ।
৯২	যা দ্বারা কেবল কাজা ওয়াজেব হয়
৯৫	যা দ্বারা কেবল কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়
৯৫	**ফিদিয়া**
৯৬	কাফ্ফারা
৯৭	যা দ্বারা রোযা ভঙ্গ হয় না
৯৮	রোযা অবস্থায় যা করা মাকরূহ
৯৯	রোযার সুন্নাত সমুহ
১০১	**সেহরীর সময়**
১০১	সাহাবাগনের আছার (কথা ও কাজ)
১০২	হযরত আহনাফ (রাহঃ) এর মতামত
১০৩	মাওলানা মাওদুদী (রাহঃ) এর মতামত
১০৪	**রমজানের রোযার কাজা**
১০৪	ফরয রোযার কাজা আদায় না করে মৃত্যুবরন করা
১০৫	যেসব দিনে রোযা রাখা নিষিদ্ধ
১০৭	রোযাদারের জন্য বর্জনীয় কাজসমুহ
১০৮	রোযার মাসে করণীয় কাজসমূহ

পৃষ্ঠা আলোচিত বিষয়

পৃষ্ঠা	আলোচিত বিষয়
১৫৭	মক্কায় প্রবেশের মুস্তাহাব কাজসমুহ
১৫৭	**হজ্বের দ্বিতীয় রুকুন**
১৫৭	আরাফার মাঠে অবস্থান করা
১৫৮	আরাফার মাঠে অবস্থানের আদাব
১৫৮	আরাফার যিকর ও দোয়া
১৬০	আরাফার দিনের ফজিলত
১৬১	আরাফার মাঠে নামায
১৬১	আরাফার দিন রোযা
১৬১	আরাফার মাঠ থেকে প্রত্যাবর্তন
১৬২	হজ্বের তৃতীয় রুকুন
১৬২	তাওয়াফুল এফাজা
১৬২	তাওয়াফের শর্ত সমুহ
১৬৩	**মাসআলা**
১৬৪	তাওয়াফের সুন্নাত সমুহ
১৬৫	পাথরের নিকট ভিড় করা
১৬৬	রমল করার পদ্ধতি
১৬৬	হারাম শরীফে নামাযীদের সামনে দিয়ে যাওয়া জায়েয
১৬৭	নারী ও পুরুষের একত্রে তাওয়াফ
১৬৮	যানবাহনে আরোহন করে তাওয়াফ
১৬৮	তাওয়াফের মুস্তাহাব সমুহ
১৬৯	জমজমের কুপ
১৭০	তাওয়াফের ফজিলত
১৭০	ক্বা'বা গৃহ তাওয়াফের পদ্ধতি
১৭১	**হজ্বের চতুর্থ রুকুন**
১৭১	সাফা ও মারওয়া পর্বতের মধ্যে সাঈ করা
১৭১	সাঈ এর হেকমত
১৭২	সাঈ এর হুকুম
১৭৩	সাঈ সহীহ হয়ার শর্তসমুহ
১৭৩	সাফা ও মারওয়া পর্বতের মধ্যে সাঈ করার পদ্ধতি
১৭৪	হজ্বের ওয়াজিব সমূহ
১৭৪	ওয়াজিব সমূহের বিস্তারিত বর্ণনা
১৭৬	পাথর নিক্ষেপের হেকমত
১৭৬	পাথর সংগ্রহ এবং পাথর সংখ্যা

পৃষ্ঠা	আলোচিত বিষয়
১৭৭	পাথর মারার সময়
১৭৮	পাথর মারার পদ্ধতি
১৭৯	বদলা পাথর মারা
১৭৯	ঈদের দিন করনীয় কাজ সমুহ
১৮০	প্রথম তাহাল্লুল ও দ্বিতীয় তাহাল্লুল
১৮০	দম ওয়াজিব হবার কারণসমূহ
১৮১	**কুরবানী**
১৮১	কুরবানী করার হেকমত
১৮২	কুরবানীর শর্ত সমুহ
১৮২	কুরবানীর হুকুম
১৮৩	কুরবানী পরিবারের উপর– ব্যক্তির উপর নয়
১৮৩	মৃত ব্যক্তির নামে কুরবানী
১৮৩	কুববানী করার সময়
১৮৪	কুরবানীর মাংস খাওয়া
১৮৫	কুরবানীর ফজিলত
১৮৫	শরীক হয়ে কুরবানী করা
১৮৬	কশাই এর কাজের মূল্য
১৮৬	নিজ হাতে কুরবানী করা
১৮৭	মাথা মুণ্ডানো বা ছোট করে চুল কাটা
১৮৭	নারীর উপর চুল মুণ্ডানো নেই
১৮৮	মিনায় রাত্রী যাপন।
১৮৮	বিদায়ের তাওয়াফ
১৮৯	**হজ্ব পালনের পদ্ধতি**
১৯১	রাস্তায় বাধা প্রাপ্ত হওয়া
১৯২	**উমরা**
১৯২	উমরার হুকুম
১৯৩	উমরার ফজিলত
১৯৪	উমরার রুকুন সমুহ
১৯৪	উমরার মীকাত
১৯৪	**জিয়ারত**
১৯৪	মসজিদে নববীর জিয়ারত
১৯৭	মসজিদে কুবার জিয়ারত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

যাকাত অধ্যায়

যাকাত শব্দের অর্থ ও নামকরণ

যাকাত আরবী শব্দ এবং এর অর্থ হলো বৃদ্ধি হওয়া। পবিত্র কোরআনে যাকাত শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে সর্বমোট ৩২ বার এবং বারাকাহ্ অর্থাৎ বরকত বা বৃদ্ধি শব্দটিও উল্লেখ করা হয়েছে ৩২ বার। এর দ্বারা স্পষ্টতই অনুধাবন করা যায় যে, যাকাত প্রদানে সম্পদের বৃদ্ধিই ঘটে অর্থাৎ সম্পদে বরকত হয়। আর ঠিক এ কারণেই যাকাত নামকরণ করা হয়েছে এ জন্যে যে, সম্পদের যাকাত দেয়া হলে সম্পদ পরিচ্ছন্ন হয়ে আরো বৃদ্ধি লাভ করে. সেই সাথে কৃপণতা ও অভাবী মানুষের হিংসা থেকে সম্পদশালী নিজ সত্ত্বাকে পবিত্র রাখতে সক্ষম হয়। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا–

তাদের সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ করুন যেনো, এর মাধ্যমে তাদেরকে পবিত্র ও বরকতময় করতে পারেন। (সূরা তাওবা- ১০৩)

ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞতের মতে যাকাতের সংজ্ঞা হলো, কোনে ব্যক্তি যখন নেসাব পরিমাণ সম্পদের অধিকার হয় এবং সম্পদের ওপর এক বছর কাল অতিবাহিত হয়, তখন সম্পদের হিসাব করে একটি বিশেষ অংশ নির্দিষ্ট খাতসমূহে বন্টন করা। অবশ্য শষ্য ও ফলের যাকাতের জন্য বছর পূর্ণ হওয়া শর্ত নয় বরং ফসল কাটার সময় এক দশমাংশ অথবা বিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত আদায় করতে হয়।

যাকাতের আদেশ

যাকাত প্রদান করা ফরজ এবং এটি ইসলামের তৃতীয় বৃহত্তম স্তম্ভ। পবিত্র কোরআনে ৮২ বার নামাজের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং এর পাশাপাশি যাকাতের কথাও বলা হয়েছে। নামাজের পাশাপাশি যাকাতের কথা কেনো বলা হলো এটি একটি প্রশ্ন।

নামাজ আদায়ের সাথে একাগ্রচিত্তের বিষয়টি ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। অমনোযোগী নামাজ আল্লাহ তা'য়ালা কবুল করবেন না এবং এ ধরনের নামাজীদেরকে সতর্ক করে বলা হয়েছে, কিয়ামতের দিন এ ধরনের নামাজ ছুড়ে দেয়া হবে। মনে এলোমেলো বিক্ষিপ্ত চিন্তা বজায় রেখে যে নামাজ আদায় করা হবে, তা ইসলামের দৃষ্টিতে নামাজ নয়। অর্থাৎ সকল ধরনের চিন্তা থেকে মনকে মুক্ত রেখে মহান আল্লাহ তা'য়ালার সম্মুখে নামাজে দণ্ডায়মান হতে হবে। মানুষের পেটে যদি ক্ষুধা থাকে, পরিবার পরিজন যদি ক্ষুধার্ত অবস্থায় থাকে, মানুষ যদি চরম অভাবে জর্জরিত হতে থাকে তাহলে সেই ব্যক্তির পক্ষে কোনোভাবেই একাগ্রচিত্তে নামাজ আদায় করা সম্ভব নয়।

ইসলামী অর্থনীতির সমগ্র ব্যবস্থাটিই গড়ে উঠেছে যাকাতকে কেন্দ্র করে। অর্থাৎ ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ যাকাত নির্ভর। এর বাস্তবায়নের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা মানব সমাজকে দরিদ্র

মুক্ত হবার ব্যবস্থা করেছেন। যাকাত ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করলে সমাজে ধনী-গরীবের ব্যবধান অসহনীয় পর্যায়ে উপনীত হতে পারে না এবং এ ব্যবস্থার অধীনে কোনো মানুষই ক্ষুধার্ত থাকে না। ঠিক এ কারণেই নামাজের পাশাপাশি যাকাতের কথা উল্লেখ করে প্রকারান্তরে এ কথাই বলা হয়েছে যে, যাকাতভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা কায়েম করে সমাজ থেকে দরিদ্রতা দূর করো, যেনো মানুষ একাগ্রচিত্তে মহান আল্লাহর সম্মুখে নামাজে দণ্ডায়মান হতে পারে।

হিজরতের পূর্বেই নবী করীম (সাঃ) এর মক্কী জীবনেই যাকাতের বিষয়টি উল্লেখ করে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো, অর্থাৎ যাকাতের বিষয়টি মানুষকে স্মরণ করে দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু তখন পর্যন্ত যাকাত কি পরিমাণ দিতে হবে তা উল্লেখ করা হয়নি। এ সময় যাকাতের বিষয়টি উল্লেখ করার তাৎপর্য কি ছিলো, এ সম্পর্কে চিন্তাবিদগণ বলেছেন, মানুষকে যাকাতের বিষয়ে সচেতন করাই ছিলো এর উদ্দেশ্য। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَ وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ، اَلَّذِيْنَ لاَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالاٰخِرَةِ هُمْ كَافِرُوْنَ–

আর মুশরিকদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ, যারা যাকাত দেয় না এবং পরকালকে অস্বীকার করে। (সূরা ফুস্‌সিলাত- ৮)

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ–

আর সফলকাম হবে সেই মুমিনগণ, যারা যাকাত প্রদান করে। (সূরা মুমিনুন- ৪)

হিজরতের দ্বিতীয় বছরে কোন্ সম্পদ, কত পরিমাণ হলে কতটুকু যাকাত দিতে হবে, তার নির্দেশ দিয়ে আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং এ ব্যাপারে বিস্তারিত নির্দেশ আসে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সাঃ) যখন হযরত মায়ায বিন জাবল (রাঃ) কে ইয়ামেনে পাঠানোর সময় বললেন, তুমি আহলে কিতাবের একটি সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছো। তাদেরকে আহ্বান করবে যেনো তারা সাক্ষ্য প্রদান করে, 'আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল। যদি তারা তোমার কথা মেনে নেয় তাহলে বলবে, আল্লাহ তা'য়ালা দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন। যদি তা এ কথা গ্রহণ করে তাহলে তাদেরকে বলবে, আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের সম্পদের ওপর যাকাত ফরজ করেছেন, যা ধনীদের থেকে গ্রহণ করা হবে এবং অভাবী- দরিদ্র শ্রেণীদের মধ্যে বন্টন করা হবে। যদি তারা এ কথাও গ্রহণ করে তাহলে তোমরা তাদের উত্তম সম্পদ থেকে বিরত থাকবে এবং নির্যাতিত ও মজলুম ব্যক্তির বদ দেয়া থেকে দূরে থাকবে।

فَانَّه لَيْسَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ– (رواه الجماعة)

কারণ অত্যাচারিত ব্যক্তি এবং আল্লাহর মাঝখানে কেনো পর্দা নেই।

সামর্থ থাকার পরও যদি কেউ যাকাত আদায় না করে তাহলে সে ব্যক্তি অবশ্যই গোনাহ্‌গার হবে এবং তার ইসলামও পূর্ণ হবে না। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

إِنَّ تَمَامَ إِسْلاَمِكُمْ أَنْ تُؤَدُّوْا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ– (رواه البزار)

নিশ্চয়ই তোমাদের ইসলামের পূর্ণতা হলো, তোমাদের সম্পদের যাকাত আদায় করা।

সামর্থ থাকার পরও যারা যাকাত আদায় করে না তাদের নামাজও কবুল হয় না। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সাঃ)–

أُمِرْتُمْ بِإِقَامَةِ الصَّلاَةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَمَنْ لَمْ يُزَكِّ فَلاَ صَلاَةَ لَه– (رواه البزار)

তোমাদেরকে নামাজ কায়েম করার এবং যাকাত দেয়ার আদেশ করা হয়েছে, যে ব্যক্তি যাকাত আদায় করলো না, তার নামাজ হলো না।

কোরআন- হাদীসে যাকাতের অবস্থান ও গুরুত্ব

যাকাত পবিত্র কোরআনে

সম্পদের যাকাত আদায় করা ফরজ এবং আল্লাহ তা'য়ালা এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে ৮২ স্থানে নামাজের পাশাপাশি যাকাত আদায়ের আদেশ করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

أَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُو الزَّكٰوةَ–

নামাজ কায়েম করো এবং যাকাত আদায় করো। (সূরা বাকারা- ৪৩)

যাকাত অভাবমুক্ত সম্পদশালীদেরকে অভাবী ও দরিদ্র শ্রেণীর ঈর্ষা থেকে মুক্ত রাখে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا–

তাদের সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ করুন যেনো এর মাধ্যমে তাদেরকে পবিত্র ও বরকতময় করতে পারেন। (সূরা তাওবা- ১০৩)

যাকাতদাতা পরকালে আল্লাহর নিকট পুরুস্কার লাভ করবেন কিয়ামতের সেই বিভীষিকাময় দিনে তাদের কোনো ভয় থাকবে না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ–

নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে, নামাজ কায়েম করেছে এবং যাকাত আদায় করেছে, তাদের জন্য তাদের রব- এর নিকট রয়েছে পুরুস্কার। তাদের কোনো শঙ্কা ও দুশ্চিন্তার কারণ নেই। (সূরা বাকারা)

যারা যাকাত আদায় করে তারা মহান আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনদের বন্ধু। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رَاكِعُوْنَ–

আর তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং মুমিনগণ, যারা নামাজ কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে ও যারা বিনয়ী হয়। (আল কোরআন)

সফলকাম সেই সব মুমিন যারা যাকাত আদায় করে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ–

আর যারা যাকাত আদায় করে। (সূরা মুমিনুন- ৪)

যাকাত আদায় করলে সম্পদ হ্রাস পায় না বরং সম্পদ আরো বৃদ্ধি লাভ করে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَمَا اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ، وَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ–

তোমরা যা ব্যয় করো তিনি (আল্লাহ) তার বিনিময় প্রদান করেন, তিনি উত্তম রিয্কদাতা। (সূরা সাবা- ৩৯)

সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ তা'য়ালা, বান্দা তাঁর সম্পদের প্রতিনিধি মাত্র। বান্দা প্রতিনিধি হিসেবে মহান আল্লাহর সম্পদ থেকে তাঁরই সন্তুষ্টির লক্ষ্যে তাঁরই পথে ব্যয় করবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اٰتٰكُمْ–

আল্লাহর সম্পদ থেকে তাদেরকে যাকাত দাও যা আল্লাহ তোমাকে দিয়েছেন। (সূরা নূর-৩৩)
আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন–

وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ–

আল্লাহ তোমাদেরকে যে সম্পদের উত্তরাধিকারী করেছেন তা থেকে ব্যয় করো (যাকাত দাও)। (সূরা হাদীদ)

যাকাত পবিত্র হাদীসে

এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, যাকাত হলো ইসলামের তৃতীয় বৃহত্তম স্তম্ভ। হযরত উমার (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সাঃ) বলেন–

بُنِيَ الاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ، شَهَادَةُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ

وَرَسُوْلُهُ وَاِقَامُ الصَّلٰوةِ وَ اِيْتَاءُ الزَّكٰوةِ وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمْضَانَ-

ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি জিনিসের ওপর। (১) সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। (২) নামাজ আদায় করা। (৩) যাকাত আদায় করা। (৪) হজ্জ আদায় করা। (৫) রমজান মাসে রোজা পালন করা। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

হযরত আয়িশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন-

اَسْهُمُ الاِسْلاَمِ ثَلاَثَةٌ، اَلصَّلاَةُ وَالصَّوْمُ وَالزَّكَاةُ-

ইসলামের অংশ তিনটি। নামাজ, রোজা ও যাকাত। (আহ্‌মাদ)

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি নবী করীম (সাঃ) কে বলতে শুনেছি-

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ فَلْيُؤَدِّ زَكَاةَ مَالِه- (رواه الطبرنى)

যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে বিশ্বাস করে সে যেনো তার সম্পদের যাকাত আদায় করে।

হযরত হাসান (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন-

حَصِّنُوْا اَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ وَدَاوُوْا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَاسْتَقْبِلُوْا اَمْوَاجَ الْبَلاَءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ-

যাকাত আদায় করে তোমাদের সম্পদকে পবিত্র করো, সাদাকা করে তোমাদের রোগীদের চিকিৎসা করো এবং দোয়া ও বিনয় দ্বারা বিপদাপদের মোকাবেলা করো অর্থাৎ বিপদ- মুসিবত দূর করো। (আবু দাউদ)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি নবী করীম (সাঃ) বলেছেন-

اِذَا اَدَّيْتَ الزَّكَاةَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ، وَمَنْ جَمَعَ مَالاً حَرَامًا ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَّهُ اَجْرٌ فِيْهِ وَكَانَ اِصْرُهُ عَلَيْهِ-

যখন তুমি যাকাত আদায় করলে তখন তোমার দায়িত্ব পালন করলে। আর যে ব্যক্তি হারাম সম্পদ অর্জন করলো, এরপর তা থেকে সাদাকা করলো, তার জন্য কোনো সওয়াব হবে না বরং তার গোনাহ্ হবে। (ইবনে খুযাইমা, ইবনে হিব্বান, হাকেম)

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন-

لَمْ يَمْنَعُوْا زَكَاةَ اَمْوَالِهِمْ اِلاَّ مُنِعُوْا الْقَطْرُ مِنَ السَّمَاءِ-

যাকাত বন্ধ করা হলে আকাশ থেকে বৃষ্টি বন্ধ করা হয়। (ইবনে মাজাহ্, দারে কুতনী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

مَا مَنَعَ قَوْمٌ اَلزَّكَاةَ اِلاَّ ابْتَلاَهُمُ اللّٰهُ بِالسِّنِيْنَ–

কোনো জন সমষ্টি যখন যাকাত বন্ধ করে দেয় তখন আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদেরকে অভাব-অনটনের মাধ্যমে পরীক্ষা করে থাকেন। (তাবারাণী, হাকেম, বায়হাকী)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

يَا ابْنَ ادَمَ اَنْفِقْ اُنْفِقُ عَلَيْكَ–

হে আদম সন্তান! ব্যয় করো তোমার ওপর ব্যয় করা হবে। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

নবী করীম (সাঃ) আরো বলেছেন–

مَا تَلَفَ مَالٌ فِىْ بَرٍّ وَ بَحْرٍ اِلاَّ بِحَبْسِ الزَّكَاةِ– (رواه الطبرانى)

যমীনে অথবা সমুদ্রে কোনো সম্পদ ধ্বংস হয় না, কিন্তু যাকাত আদায় না করার কারণে।

যাকাত আদায়ের উদ্দেশ্য

এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার মূল চালিকা শক্তিই হলো যাকাত এবং এটি ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের প্রধান আয়ের উৎসও বটে। যাকাতের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো দেশ থেকে ধনী ও গরীবের মাঝের ব্যবধান হ্রাস করা এবং দেশ থেকে দরিদ্রতার উচ্ছেদ সাধন করা। ধনীদের অতিরিক্ত সম্পদ থেকে নির্দিষ্ট অংশ যাকাত হিসেবে আদায় করে সমাজের দরিদ্র অভাবী মানুষদের দরিদ্রতা দূরার করার উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা অনুযায়ী বন্টন করা এবং সমাজে অর্থনৈতিক ইনসাফ কায়েম করা। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

وَتُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَاءِ هِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَاءِ هِمْ– (متفق عليه)

ধনীদের কাছ থেকে (যাকাত) গ্রহণ করা হবে এবং দরিদ্র মানুষের মধ্যে বন্টন করা হবে।

ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের নীতিমালা অনুযায়ী ধনীদের সম্পদে দরিদ্র মানুষের অধিকার রয়েছে। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَ فِىْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ–

তাদের (ধনীদের) সম্পদে রয়েছে ভিক্ষুক ও বঞ্চিত মানুষের অধিকার।

পবিত্র কোরআন- হাদীসের উল্লেখিত উক্তি থেকে এ কথাই প্রমাণ হয় যে, ধনীদের উদ্বৃত্ত সম্পদ থেকে দরিদ্র ও বঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায় করে তাদের মধ্যে পরিকল্পনা ভিত্তিক বন্টন করে সমাজ থেকে দরিদ্রতা দূর করাই ইসলামের যাকাতের মূল উদ্দেশ্য।

পূজিবাদের মূল বৈশিষ্ট্য হলো দেশের হাতে গোণা গুটিকতক ধনীদের হাতে পূঞ্জিভূত হতে থাকবে অর্থ ও সম্পদ। আর দরিদ্রতা ও বঞ্চনার অভিশাপে নিষ্পেষিত হতে থাকবে দেশের

সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষকে শোষণ করে সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলাই পূজিবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পূজিবাদী ব্যবস্থায় ব্যক্তি যথেচ্ছা অর্থ- সম্পদ আয় ও ব্যয় করতে পারে এ ব্যাপারে তাকে কেউই বাধা দিতে পারে না। পূজিবাদীরা ধন- সম্পদ উপার্জন করে যে গরীব জনসাধারিণের শ্রমের বিনিময়ে, সেই শ্রমিকদেরকে তারা লভ্যাংশের একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ দেয়, আর লভ্যাংশের সিংহভাগই তারা ব্যয় করে নিজেদের আরাম আয়েশ এবং বিকৃত রুচি চরিতার্থ করার লক্ষ্যে।

অপরদিকে কমিউনিজম তথা সমাজবাদ বা সমাজতন্ত্র সম্পদে সাধারণ মানুষের মালিকানাকে অস্বীকার করে সমগ্র দেশের মানুষকে পরিণত করে যন্ত্র বিশেষে। সাধারণ মানুষের নিজস্ব কোনো মালিকানা সত্ত্ব নেই, এরা কেবল যন্ত্রের মতো শ্রম ব্যয় করবে। মানুষ পরিণত হবে অর্থনৈতিক দাসে এবং মানুষের লক্ষ্যই হবে অর্থনৈতিক উন্নতি বিধানের জন্যে নিজেকে নিঃশেষে ক্ষয় করা। মানুষ সামাজিক একটি সত্ত্বাসহ দেশে বসবাস করবে আর শ্রম ব্যয় করতে থাকবে। অপরদিকে শ্রমিকের অধিকার আদায়ের নামে রাষ্ট্রযন্ত্র কুক্ষিগত করবে এক শ্রেণীর ধুরন্ধর লোকজন এবং তারাই হবে সমগ্র দেশের মানুষের ভাগ্য বিধাতা। দেশের সমগ্র অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করবে কেবলমাত্র তারাই। সাধারণ মানুষের হাতে অর্থব্যবস্থার কোনো একটি দিকও থাকবে না।

অর্থাৎ পুজিবাদ সমগ্র দেশে সৃষ্টি করে ছোট ছোট বহু সাপ, যা দেশের বিভিন্ন স্তরে অবস্থান করে দেশের সম্পদ গিলতে থাকে। আর সমাজতন্ত্র দেশের সকল ছোট ছোট সাপকে হত্যা করে নিজেই এক বিশাল অজগর সাপে পরিণত হয় এবং সমগ্র দেশকে উক্ত অজগার একই গিলতে থাকে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোই এর প্রমাণ। সুতরাং পুজিবাদ ও সমাজবাদ তথা সমাজতন্ত্র উভয় ব্যবস্থাতেই দেশের সকল সম্পদ পুঞ্জিভূত হয় বিশেষ একটি শ্রেণীর হাতে। পূজিবাদী ব্যবস্থায় দেশের সম্পদ ভোগ করে পুজিপতিরা আর সমাজবাদে দেশের সম্পদ ভোগ করে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী। আর সকল দিক থেকে দেশের সাধারণ মানুষ পদদলিত ও বঞ্চিত অবস্থায়ই থেকে যায়।

ইসলামে যাকাত ভিত্তিক অর্থব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যক্তিভিত্তিক সম্পদের মালিকানার স্বীকৃতি দিয়ে দেশে শিল্প-কলকারখানা স্থাপন করে দেশকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের উচ্চ শিখরে পৌছানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে ব্যক্তি মালিকানার এবং সম্পদের আয় ও ব্যয়ের বৈধ সীমানা নির্ধারণ করে দিয়ে অর্থ- সম্পদের আয় ও ব্যয়ের ক্ষেত্রও নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। ব্যক্তি ইচ্ছা করলেই যথেচ্ছা অর্থ- সম্পদ উপার্জন করতে পারবে না এবং যথেচ্ছা তার উপার্জিত সম্পদ ব্যয়ও করতে পারবে না। আর এ ব্যাপারে রাষ্ট্র থাকে সজাগ ও সতর্ক।

যাকাত ভিত্তিক ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় বিশেষ কোনো শ্রেণী সুবিধা লাভ করতে পারে না, কারণ ইসলাম সম্পদ কারো হাতে কুক্ষিগত হতে দেয় না। অপরদিকে যাকাত ভিত্তিক অর্থব্যবস্থার মূল চালিকা শক্তি হলো তাক্ওয়া তথা মহান আল্লাহর ভয় এবং সমাজের সকল স্তরে ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করাই হলো যাকাত ভিত্তিক অর্থনীতির মূল বৈশিষ্ট্য। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَأُمِرْتُ اَنْ اَعْدِلَ بَيْنَكُمْ–

আর আমাকে নির্দেশ কর হয়েছে তোমাদের মধ্যে (সমাজে) ইনসাফ কায়েম করতে। (সূরা শুরা- ১০)

নবী করীম (সাঃ) যে সময় ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি সে সময় আল্লাহ্ তা'য়ালা অহীর মাধ্যমে তাঁর মুখ থেকে উক্ত কথা বান্দাদের শুনিয়ে ছিলেন। অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো দেশের সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা। দেশের সম্পদ এক শ্রেণীর মানুষের হতে পুঞ্জিভূত হবে আর সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ দরিদ্র পীড়িত থাকবে, এ অবস্থাকে ইসলাম জুলুম হিসেবে উল্লেখ করে ঘোষণা করেছে–

كَىْ لاَ يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ–

সম্পদ যেনো তোমাদের ধনীদের মধ্যে পুঞ্জিভূত না হয়। (সূরা হাশর-৭)

ইসলাম মানুষকে যেমন এক স্বাধীন সত্ত্বা হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এবং তাকে দেশ ও সমাজের সচেতন সদস্য হিসেবে গড়ার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ কারণে ইসলামী সমাজে এমন কোনো আইনের অস্তিত্ব থাকে না, যে আইনের দ্বারা ব্যক্তি সমাজের জন্যে নিজেকে ক্ষয় করে বা সমাজ ব্যক্তির স্বার্থে নিজেকে ধ্বংস করে। ঠিক এ কারণেই পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে–

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ–

প্রত্যেক ব্যক্তিই তার কার্যাবলীর জন্যে দায়ী।

নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ–

তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। আর প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

সুতরাং যাকাত ভিত্তিক অর্থব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্যই হলো সম্পদের ইনসাফ ভিত্তিক সুষম ব্যবহার এবং এ ব্যবস্থায় বিশেষ কোনো শ্রেণী সুবিধা ভোগ করতে পারে না।

যাকাত অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশ

সকল হক্কানী আলেমের সর্বসম্মত অভিমত হলো, যারা যাকাত অস্বীকার করবে তারা কাফির এবং মুর্তাদ। তাদেরকে অবশ্যই হত্যা করা হবে।

আর যে বা যারা যাকাত আদায় করা ফরজ বলে স্বীকার করে কিন্তু যাকাত আদায় করে না, সে ফাসিক তথা পাপী। তার কাছ থেকে সরকার আইন প্রয়োগের মাধ্যমে যাকাত আদায় করবে।

যদি কোনো শক্তিশালী সম্প্রদায় যাকাত দিতে অস্বীকার করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হবে।

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সাঃ) এর ইন্তেকালের পরে আরবের কোনো কোনো গোত্র যাকাত দিতে অস্বীকার করে, হযরত আবু বকর (রাঃ) তখন খেলাফতে আসীন। এ অবস্থায় তিনি যাকাত আদায়ে অস্বীকারকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। হযরত উমার (রাঃ) খলীফাকে বললেন, 'আপনি যুদ্ধ করবেন কিভাবে? নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ্ নেই, সে তার সম্পদ ও প্রাণের হেফাজত করে নিলো।'

হযরত উমার (রাঃ) এর কথার জবাবে হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন–

وَاللّٰهِ لَاُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ فَاِنَّ الزَّكٰوةَ حَقُّ الْمَالِ–

'মহান আল্লাহর শপথ! আমি যুদ্ধ করবো, যারা নামাজ ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে। কারণ যাকাত হলো সম্পদের হক।

وَاللّٰهِ لَوْ مَنَعُوْنِىْ عَنَاقًا كَانُوْا يُؤَدُّوْنَهَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ لَقَاتَلْتُهُمْ مَنْعِهَا–

আল্লাহর শপথ! একটি ছাগল ছানা যা নবী করীম (সাঃ) এর কাছে যাকাত হিসেবে দেয়া হতো, কেউ যদি তা দিতে অস্বীকার করে তাহলে আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো।'

খলীফার কথা শুনে হযরত উমার (রাঃ) বললেন, তখন আমি অনুভব করতে পারলাম যে, আবু বকর (রাঃ) এর সিদ্ধান্তই সঠিক ছিলো। (আল জামায়াহ্)

যাকাত আদায় না করার পরিণতি

মহান আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন–

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ– يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ، هٰذَا مَاكَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ–

আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে কঠোর শাস্তির সুসংবাদ দিন। যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্বদেশ এবং পৃষ্ঠদেশকে দগ্ধ করা হবে। সেদিন বলা হবে, এগুলো সেই সম্পদ যা তোমরা জমা করে রেখেছিলে। সুতরাং এখন স্বাদ গ্রহণ করো, যা জমা করে রেখেছিলে। (সূরা তাওবা-৩৪-৩৫)

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ، بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ، سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ–

আল্লাহ তাদেরকে নিজের অনুগ্রহে যা দান করেছেন তাতে যারা কৃপণতা করে, এ কার্পণ্য তাদের জন্য কল্যাণকর হবে বলে যেনো ধারণা না করে। বরং এটা তাদের জন্য একান্তই ক্ষতিকর হবে। যাতে তারা কার্পণ্য করে, সে সকল ধন- সম্পদকে পরকালে তাদের গলায় বেড়ি বানিয়ে পরানো হবে। (সূরা ইমরাণ-১৮০)

হযরত আবু উমাম (রাঃ) হযরত ছা'লাবা বিন হাতিব (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, একদিন ছা'লাবা নবী করীম (সাঃ) কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! দোয়া করুন, আল্লাহ যেনো আমাকে সম্পদ দেন। নবী করীম (সাঃ) বললেন, তুমি কি তোমার নবীর মতো থাকতে চাও না! হযরত ছা'লাবা বললেন, আপনার দোয়ার বরকতে আল্লাহ আমাকে সম্পদ দিলে আমি প্রত্যেক হকদারের হক আদায় করবো। নবী করীম (সাঃ) আল্লাহর কাছে বললেন–

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْ ثَعْلَبَةَ مَالاً–

হে আল্লাহ! ছা'লাবাকে সম্পদ দান করুন।

নবী করীম (সাঃ) এর দোয়ার বরকতে উক্ত ব্যক্তি একটি ছাগল যোগাড় করে প্রতিপালন করতে লাগলো। ক্রমশ তাঁর ছাগল বৃদ্ধি পেতে পেতে এক সময় তাঁর ছাগল পাল এতই বৃদ্ধি হলো যে, বাধ্য হয়ে সে মদীনা নগরী ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলো। এ অবস্থায় সে মসজিদে নববীতে নামাজ আদায় করাও ছেড়ে দিলো। এরপর সে জুমুআ নামাজ আদায়ও ছেড়ে দিলো। তাঁর এ অবস্থা জানতে পেরে নবী করীম (সাঃ) আক্ষেপ করে বললেন, 'ছা'লাবা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।' এরপর যখন যাকাত আদায়ের আদেশ এলো, তখন নবী করীম (সাঃ) উক্ত ব্যক্তির কাছে দুইজন লোককে যাকাত আদায় করার জন্য প্রেরণ করলেন। সে যাকাত আদায় না করে বরং মন্তব্য করলো, 'এটা এক ধরনের জিযিয়া মাত্র।' এরপর আল্লাহ তা'য়ালা কোরআনের আয়াত অবতীর্ণ করে এ ধরনের লোকদেরকে মুনাফিক হিসেবে আখ্যায়িত করলেন।

এ কথা জানতে পেরে উক্ত ব্যক্তি যাকাত নিয়ে নবী করীম (সাঃ) এর কাছে উপস্থিত হলো। রাসূল (সাঃ) তাঁর কাছ থেকে যাকাত গ্রহণ করলেন না। এরপর হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত উমার (রাঃ), হযরত উসমান (রাঃ) এর খেলাফতের সময়ও যাকাত আদায়ের জন্যে এসেছিলো কিন্তু কেউই তাঁর যাকাত গ্রহণ করেননি। অবশেষে হযরত উসমান (রাঃ) এর খেলাফতের সময় উক্ত ব্যক্তি মুনাফিকীর অবস্থাতেই ইন্তেকাল করলো। (সূরা তাওবার ৭৭ আয়াতের তাফসীরে উল্লেখিত ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

مَنْ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهٗ مُثِّلَ لَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا اَقْرَعَ لَهٗ زَبِيْبَتَانِ يُطَوِّقُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلَهْزِمَتَيْهِ، ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا كَنْزُكَ، اَنَا مَالُكَ ثُمَّ قَلاَ هٰذِهِ الاٰيَةَ–

আল্লাহ তা'য়ালা যাকে সম্পদ দান করেছেন সে যদি যাকাত আদায় না করে, তাহলে আদালাতে আখিরাতে ঐ সম্পদকে বিষাক্ত সাপে রুপান্তরিত করা হবে। উক্ত সাপের চোখের ওপর কালো দুটো দাগ থাকবে। ঐ সাপকে উক্ত ব্যক্তির গলায় পরিয়ে দেয়া হবে। এরপর সাপ তার দুই গাল থেকে গোস্ত খেতে থাকবে আর বলতে থাকবে, 'আমিই তোমার সঞ্চিত সম্পদ রাশি, আমিই তোমার সম্পদ।' এরপর নবী করীম (সাঃ) তিলাওয়াত করলেন–

وَ لاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِه هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ، بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِه يَوْمَ الْقِيمَةِ–

আল্লাহ তাদেরকে নিজের অনুগ্রহে যা দান করেছেন তাতে যারা কৃপণতা করে, এ কার্পণ্য তাদের জন্য কল্যাণকর হবে বলে যেনো ধারণা না করে। বরং এটা তাদের জন্য একান্তই ক্ষতিকর হবে। যাতে তারা কার্পণ্য করে, সে সকল ধন- সম্পদকে পরকালে তাদের গলায় বেড়ি বানিয়ে পরানো হবে। (সূরা ইমরাণ-১৮০)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلاَ فِضَّةٍ لاَيُؤَدِّى مِنْهَا حَقَّهَا اِلاَّ اِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِى عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوى بِهَا جَنْبُهُ وَ جَبِيْنُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيْدَتْ لَهُ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضى بَيْنَ الْعِبَادِ– (رواه الخمسة الا الترمذى)

যে ব্যক্তি স্বর্ণ ও রৌপ্যের অধিকারী আর যদি সে তার সম্পদের যাকাত আদায় না করে, আখিরাতে সেই সম্পদকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে। এরপর উত্তপ্ত সম্পদ দ্বারা তার পার্শ্বদেশ, কপাল এবং পৃষ্ঠদেশে দাগ দেয়া হবে। যখন উক্ত সম্পদ ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, পুনরায় তা জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করে দাগ দেয়া হবে। ধারাবাহিকভাবে তা চলতেই থাকবে। সেই দিন এই অবস্থা হবে, যেদিনের দৈর্ঘ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। মানুষের বিচার কাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত এই শাস্তি চলতেই থাকবে।

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (এর) মেরাজের সময় এমন এক সম্প্রদায়ের কাছ দিয়ে গেলেন, যাদের সম্মুখে ও পেছনে কাপড়ের পট্টি বাঁধা ছিলো। তারা পশুর মতো বিষাক্ত কাঁটা যুক্ত ঘাস, জাক্কুম বৃক্ষ এবং উত্তপ্ত পাথর খাচ্ছিলো। নবী করীম (সাঃ) জানতে চাইলেন, হে জিবরাঈল! এরা কারা? তিনি জানালেন–

هٰؤُلاَءِ الَّذِيْنَ لاَ يُؤَدُّوْنَ صَدَقَاتِ اَمْوَالِهِمْ– (رواه البزار)

এরা সেই সব লোক, যারা তাদের সম্পদের যাকাত দিতো না।

পার্থিব জীবনে যাকাত আদায় না করার পরিণতি

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

خَمْسٌ بِخَمْسٍ قَالُوْا وَمَا خَمْسٌ بِخَمْسٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مَانَقَضَ قَوْمٌ اَلْعَهْدَ اِلاَّ سَلَّطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ عَدُوَّ هُمْ، وَمَاحَكَمُوْا بِغَيْرِ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلاَّ جَعَلَ اللّٰهُ الْبَأْسَ بَيْنَهُمْ، وَمَا ظَهَرَتْ فِيْهِمْ اَلْفَحِشَةَ اِلاَّ فَشَا فِيْهِمُ الْفَقْرُ، وَلاَ طَفِقُوْا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانُ اِلاَّ اُخِذُوْا بِالسِّنِيْنَ، وَمَا مَنَعُوا الزَّكَاةَ اِلاَّ حُبِسَ عَنْهُمُ الْقَطَرُ– (رواه الطبرانى)

পাঁচটি জিনিসের সাথে পাঁচটি জিনিস অবশ্যম্ভাবী। সাহাবায়ে কেরাম জানতে চাইলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! উক্ত পাঁচটি জিনিস কী? আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বললেন, যে জাতি চুক্তি ভঙ্গ করে আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদের ওপর তাদের শত্রুকে বিজয়ী করে দেন। আর যারা আল্লাহর অবতীর্ণ করা বিধান ব্যতীত মানুষের বানানো আইন- কানুনের মাধ্যমে বিচার- ফয়সালা করে আল্লাহর তাদের মধ্যে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে দেন। আর যে জাতির মধ্যে অশ্লীলতা- বেহায়াপনা বিস্তার লাভ করে, তাদের মধ্যে দরিদ্রতা প্রসারিত হয়। আর যারা ওজনে কম দেয় তাদের মধ্যে দুর্ভীক্ষ দেখা দেয়। আর যারা যাকাত আদায় করে না, তাদের ওপর অনাবৃষ্টি দেখা দেয়। (তাবারাণী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

مَا مَنَعَ قَوْمٌ اَلزَّكَاةَ اِلاَّ ابْتَلاَهُمُ اللّٰهُ بِالسِّنِيْنَ–

যে সম্প্রদায় যাকাত আদায় করে না, আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদেরক দুর্ভীক্ষে নিপতিত করেন।

যাকাত আদায় না করলে সম্পদ ধ্বংস হয়ে যায়। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

مَا خَالَطَتِ الصَّدَقَةُ اَوْ قَالَ الزَّكَاةُ اِلاَّ اَفْسَدَتْهُ– (رواه البراز والبيهقى)

যে সম্পদের সাথে যাকাত মিশ্রিত থাকে (অর্থাৎ যে সম্পদের যাকাত দেয়া হয় না) যাকাত সেই সম্পদের ধ্বংসের কারণ হয়।

যে ব্যক্তি যাকাত আদায় করে না, তার নামাজ কবুল হয় না। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন–

اُمِرْتُمْ بِاِقَامَةِ الصَّلاَةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَمَنْ لَمْ يُزَكِّ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ–

তোমাদেরকে নামাজ আদায় করার এবং যাকাত আদায়ের আদেশ দেয়া হয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি যাকাত আদায় করলো না, তার নামাজ কবুল হলো না।

যাকাত ওয়াজিব হবার শর্তসমূহ

(১) মুসলিম হওয়া।

সুতরাং কাফির ও মুর্তাদদের ওপর যাকাত ওয়াজিব নয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) যখন হযরত মায়ায (রাঃ) কে ইয়েমেনের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করলেন তখন তাঁকে বললেন, তুমি এমন একটি সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছো, যারা কিতাবের অনুসরণ করে। (অর্থাৎ যারা পূর্ববর্তী কিতাবের অনুসরণকারী হিসেবে দাবীদার)

فَادْعُهُمْ اِلَى شَهَادَةِ اَنْ لاَاِلَهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْكَ لِذَالِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْكَ لِذَلِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ- (رواه الجماعة)

তাদেরকে দাওয়াত দিবে যেনো তারা সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল। যদি তারা এ কথা মেনে নেয় তাহলে তাদেরকে শিক্ষা দিবে যে, আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদের ওপর দিন রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন। যদি তারা এ কথা মেনে নেয় তাহলে তাদেরকে শিক্ষা দিবে যে, আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদের ওপর যাকাত আদায় ফরজ করেছেন- যা তাদের ধনীদের কাছ থেকে গ্রহণ করে তাদের দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করা হবে।

উল্লেখিত হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণ হয় যে, যাকাত ওয়াজিব হবার জন্য মুসলিম হওয়া আবশ্যক শর্ত।

(২) স্বাধীন হওয়া।

সুতরাং দাস-দাসীদের সম্পদের ওপর যাকাত ওয়াজিব নয়। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

لَيْسَ فِىْ مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ-

দাসের সম্পদে কোনো যাকাত নেই।

(৩) প্রাপ্ত বয়স্ক ও জ্ঞান- বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া।

সুতরাং অপ্রাপ্ত বয়স্ক তথা শিশু ও উন্মাদ বা পাগলের সম্পদে যাকাত নেই। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

رُفِعَ لْقَلَمُ عَنِ الصَّبِىِّ وَالْمَجْنُوْنِ وَمَا اسْتُكْرِهَ عَلَيْهِ-

দায়িত্ব উঠানো হয়েছে, অপ্রাপ্ত তথা শিশু ও পাগলের ওপর থেকে এবং যার ওপর শক্তি প্রয়োগ করা হয় তার ওপর থেকে।

(৪) পূর্ণ মালিক হওয়া।

সম্পদের ওপর পূর্ণ মালিকানা না হলে যাকাত ওয়াজিব হবে না। সুতরাং স্ত্রীর সে গ্রহণ না করা পর্যন্ত মহরের যাকাত যাকাত দিতে হবে না। তেমনি হারিয়ে যাওয়া সম্পদের ওপর যাকাত নেই।

(৫) মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ হতে হবে যা নেসাব পরিমাণ।

সুতরাং নেসাব থেকে সম্পদ কম হলে যাকাত ওয়াজিব হবে না।

নেসাবের শর্ত দুটো

(ক) নেসাব পরিমাণ সম্পদ যা প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত হতে হবে।

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

لاَ صَدَقَةَ اِلاَّ عَنْ ظَهْرِ غِنًى–

প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ ব্যতীত যাকাত নেই। (ফতহুল বারী)

ইমাম বোখারী (রাহঃ) "সহীহ বোখারী" হাদীসের একটি অধ্যায় এভাবে করেছেন–

بَابُ لاَ صَدَقَةَ اِلاَّ عَنْ ظَهْرِ غِنًى–

প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ ব্যতীত যাকাত নেই।

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى–

উত্তম সাদাকা (যাকাত) হলো যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়। (বোখারী)

কোনো ব্যক্তির পরিবারের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, পরিবারের সন্তানদের আনুসঙ্গিক ব্যয়, যানবাহন ব্যয় এবং উৎপাদন সামগ্রী তার মৌলিক প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত।

(খ) নেসাব পরিমাণ সম্পদের ওপর এক বছর অতিবাহিত হতে হবে।

কিন্তু ফসল ও ফলের ক্ষেত্রে এক বছর পূর্ণ হওয়া শর্ত নয় বরং ফসল কাটার দিনই যাকাত আদায় করা ওয়াজিব। আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন–

وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ–

ফসল কাটার দিন এর হক (যাকাত) আদায় করো। (সুরা আল আনআম-১৪১)

(৬) ঋণের অতিরিক্ত সম্পদ নেসাব পরিমাণ হওয়া।

সোনা-রোপা, নগদ অর্থ ও ব্যবসার পণ্য সামগ্রীতে যাকাত ওয়াজিব হবার শর্ত হলো, ঋণের অতিরিক্ত সম্পদ নেসাব পরিমাণ হওব। ঋণ শোধ করার পর যদি অতিরিক্ত সম্পদ নেসাব পরিমাণ হয়, তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে।

হযরত সাইব বিন ইয়াজিদ (রাহঃ) বলেন, আমি হযরত উসমান বিন আফফান (রাঃ) কে মসজিদের মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন–

مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّه وَلْيُزَكِّ بَقِيَّةَ مَالِه–

যার ওপর ঋণ রয়েছে তার উচিত হবে ঋণ শোধ করা এবং অবশিষ্ট সম্পদের যাকাত আদায় করা। (মালিক, শা'ফী, দারে কুতনী)

(৭) সম্পদ বৃদ্ধি যোগ্য হওয়া।

যে সম্পদ বৃদ্ধি পায় সে সম্পদেই যাকাত ওয়াজিব হয়। এ কারণে নবী করীম (সাঃ) দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য সামগ্রীসমূহ যাকাত মুক্ত রেখেছেন.। তিনি বলেছেন–

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِيْ فَرَسِه وَلَا عَبْدِه صَدَقَةٌ–

মুসলমানের নিজের ঘোড়া এবং দাসের ওপর যাকাত নেই।

শিশুর সম্পদে যাকাত

অপ্রাপ্ত বয়স্ক অর্থাৎ শিশু এবং পাগল ব্যক্তি যদি নেসাব পরিমাণ সম্পদ থাকে তাহলে তার অভিভাবকের ওপর ওয়াজিব হবে উক্ত সম্পদের যাকাত আদায় করা।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাহঃ) তাঁর পিতা এবং তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সাঃ) এক বক্তৃতায় বলেছেন–

اَلَا مَنْ وَلِيَ يَتِيْمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ وَلَا يَتْرُكْهُ حَتّٰى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ–

সাবধান! যে ব্যক্তি সম্পদশালী ইয়াতিমের অভিভাবক হবে, তার উচিত ইয়াতিম শিশুর অর্থ-সম্পদ ব্যবসায় প্রয়োগ করা। অর্থ- সম্পদ যেনো অকেজো অবস্থায় ফেলে না রাখে, যেনো যাকাত তা খেয়ে ফেলে। (তিরমিযী, বায়হাকী, দারে কুতনী)

হযরত আব্দুর রহমান বিন কাসেম (রাহঃ) তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, আমি ও আমার ভাই হযরত আয়িশা (রাঃ) এর অভিভাবকত্বে ছিলাম এবং তিনি আমাদের সম্পদের যাকাত আদায় করতেন। (রাওয়াহুল মুওয়াত্তায়ে)

হযরত উমার (রাঃ) বলেছেন–

اِتَّجِرُوْا فِيْ اَمْوَالِ الْيَتٰمٰى لِئَلَا تَأْكُلُهَا الزَّكٰوةُ–

ইয়াতিমের সম্পদ দ্বারা ব্যবসা করো যেনো যাকাত তা খেয়ে না ফেলে।

হারাম সম্পদের যাকাত

অবৈধ পন্থায় উপার্জিত সম্পদ থেকে যাকাত আদায় করলেও মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা তা কবুল করেন না। কারণ আল্লাহ্ তা'য়ালা স্বয়ং পাক-পবিত্র, তিনি পাক- পবিত্র জিনিসই পছন্দ করেন। সুতরাং চুরি, ডাকাতী, ছিন্তাই, রাহাজানী, সুদ. ঘুষ, প্রতারণা, প্রবঞ্চনার মাধ্যমে বা অন্যের হক নষ্ট করে যে সম্পদ অর্জন করা হয়েছে, তা থেকে যাকাত দিলেও তা কখনো কবুল হবে না। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمَرَةٍ مِنْ كَسَبٍ طَيِّبٍ وَلاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ الاَّ الطَّيِّبَ، فَانَّ اللّٰهَ يَتَقَبَّلُ بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ يُرَبِّيْهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّىْ اَحَدُكُمْ فُلُوَّهُ حَتّٰى تَكُوْنَ مِثْلَ الْجَبَلِ– (رواه البخارى)

যে ব্যক্তি বৈধ পথে সম্পদ অর্জন করে একটি খেজুরের পরিমাণ সাদাক করলো, আর আল্লাহ্ তা'য়ালা তো পাক-পবিত্র হালাল ব্যতীত কবুল করেন না, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তার ডান হাতে তা গ্রহণ করেন এবং উক্ত সম্পদের মালিকের জন্য তা বৃদ্ধি করতে থাকেন। যেমন তোমাদের কেউ মহর বৃদ্ধি করতে থাকে (ব্যবসার মাধ্যমে)। এমন কি শেষ পর্যন্ত তা পাহাড়ের অনুরূপ হয়ে যায়। (বোখারী)

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন–

لاَيَقْبَلُ اللّٰهُ صَلاَةً بِغَيْرِ طُهُوْرٍ وَلاَ صَدَقَةً مِنْ غُلُوْلٍ–

পবিত্রতা ব্যতীত মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা নামাজ কবুল করেন না এবং চুরির সম্পদে যাকাতও কবুল করেন না। (মুসলিম)

অনাদায় ঋণের যাকাত

ঋণ গ্রহিতা যদি ঋণ পরিশোধ করার ইচ্ছা করে অথবা সে যে ঋণী এ কথা জানা যায় তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে। এ অবস্থায় বছর গণনা করা হবে যখন থেকে সে নেসাব পরিমাণ সম্পদের অধিকারী হয়েছে। সুতরাং ঋণের অর্থ পাওয়া মাত্র চলতি বছরসহ গত বছরসমূহেরও যাকাত আদায় করতে হবে।

আর যদি অবস্থা এমন হয় যে, ঋণের অর্থ পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা না থাকে তাহলে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হলো হারিয়ে যাওয়া সম্পদের অনুরূপ। যখন তা ফেরৎ পাবে তখন এক বছরের যাকাত আদায় করতে হবে।

আর স্ত্রীর মহর যদিও একটি ঋণ বিশেষ। কিন্তু তা খুবই দুর্বল ঋণ। এ জন্যে যখন তার মোহরের অর্থ গ্রহণ করবে তখন থেকে এক বছর পূর্ণ হবার পরে যাকাত দিবে।

ইমাম শা'ফী (রাঃ) এর মতামত অনুযায়ী, যদি ঋণ স্বীকৃত হয় তাহলে ঋণের অর্থ পাবার পূর্বেই প্রত্যেক বছর যাকাত দিতে হবে।

যাকাত আদায়ের শর্তসমূহ

(১) নিয়ত করা।

যাকাত দেয়ার সময় নিয়ত থাকবে যে, সে মহান আল্লাহর আদেশে ফরজ যাকাত আদায় করছে এবং এ কাজ সে করছে কেবলমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

اِنَّمَا الاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ امْرِءٍ مَانَوى– (رواه البخارى)

নিশ্চয়ই আমল হয় নিয়াত দ্বারা। আর প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়াত করবে সে তাই পাবে।

(২) সম্পদের হিসাব করে যাকাত আদায় করা।

সম্পদের হিসাব করে যাকাত দিতে হয়। অনেকে হিসাব না করে কিছু কাপড় বা নগদ অর্থ অভাবী গরীব লোকদের মধ্যে বন্টন করে। সম্পদের হিসাব না করে সকল সম্পতি বন্টন করে দিলেও যাকাত আদায় হবে না, বরং তা হবে সাদাকা বা দান।

(৩) পবিত্র কোরআনে ঘোষিত আটটি খাতে যাকাত দেয়া।

আটটি খাতের মধ্যে যে কোনো তিনটি খাতে যাকাত প্রদান করা উত্তম। স্বচ্ছল বা সম্পদশালী ব্যক্তিকে যাকাত দিলে তা আদায় হবে না।

অগ্রীম যাকাত আদায় করা

বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে অগ্রীম যাকাত দেওয়া জায়েয। ইমাম জুহরী (রাহঃ) বলেন, বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে যাকাত আদায় করতে কোনো বাধা নেই।

ইমাম শওকানী (রাহঃ) বলেছেন, এটাই ইমাম শা'ফী, ইমাম আহ্‌মদ এবং ইমাম আবু হানীফা (রাহঃ) এর মতামত।

অপরদিকে ইমাম মালিক ও ইমাম সুফিয়ান সাওরী (রাহঃ) এর মতামত হলো, বছর পূর্ণ হবার পূর্বে যাকাত অগ্রীম দেয়া জায়েয নেই। তাঁরা মনে করেন, যাকাত হলো ইবাদাত এবং ইবাদাত নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে আদায় করা যায় না বা তা জায়েয নয়।

আর ইমাম শা'ফী, ইমাম আহ্‌মদ এবং আবু হানীফা (রাঃ) এর মতামত হলো, যাকাত হলো মিসকীনদের অধিকার। আর সময়ের পূর্বে হক আদায় করা জায়েয।

হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন–

اِسْتَلَفَ النَّبِىُّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْعَبَّاسِ قَبْلَ مَحَلِّهَا–

নবী করীম (সাঃ) হযরত আব্বাস (রাঃ) এর যাকাত অগ্রীম গ্রহণ করেছেন।

সুতরাং অগ্রীম যাকাত আদায় করা যায় বলে যারা মন্তব্য করেছেন, তাদের মতামতই অধিকাংশের কাছে সঠিক বলে মনে হয়।

যাকাত আদায়ের নিয়ম বা পদ্ধতি

(১) যাকাত আদায়ে যারা অবহেলা প্রদর্শন করে বা যাকাত দিতে কার্পণ্য বোধ করে, তাদেরকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যে যাকাত দেয়া খুবই ভালো কাজ, তবে এ কাজ করতে গিয়ে হৃদয়ে যেনো সামান্যতম প্রদর্শনেচ্ছা না জাগে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। যাকাত দাতার মনে যদি এ ধারণা সৃষ্টি হয় যে, প্রকাশ্যে যাকাত দিতে গেলে তার মনে রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা সৃষ্টি হতে পারে, তাহলে তার জন্যে গোপনে যাকাত দেয়াই উচিত। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেছেন–

وَ اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ، وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ–

আর যদি তোমরা প্রকাশ্যে যাকাত- সাদাকা করো, সেটা কতই না উত্তম! আর যদি তোমরা গোপন করো এবং দরিদ্রদেরকে দাও তাহলে তো তোমাদের জন্য আরো উত্তম। (সূরা বাকারা)

নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ–

গোপনে যাকাত- সাদাকা করলে আল্লাহর ক্রোধ প্রশমিত হয়।

যাকাত আদায়ের ইসলাম প্রদর্শিত পদ্ধতি না জানার কারণে আমাদের দেশের কিছু সংখ্যক ধনবান ব্যক্তি যাকাত দেয়ার নামে প্রহসন করে থাকেন। মাইকিং করে তারা ঘোষণা দিয়ে থাকেন যে, অমুক স্থানে যাকাতের শাড়ী- কাপড় বা নগদ অর্থ বিতরণ করা হবে। ঘোষণা শুনে অভাবী দরিদ্র শ্রেণীর লোকজন ভীড় জমাতে থাকে। সামান্য কিছু নগদ অর্থ, একটি নিম্ন মানের লুঙ্গি বা শাড়ীর জন্যে এমন হুড়োহুড়ি করতে থাকে যে, এক পর্যায়ে নারী, শিশু, বৃদ্ধ বা দুর্বল শ্রেণীর লোকজন সবলদের পায়ের নীচে পিষ্ঠ হয়ে প্রাণ হারায়। বাংলাদেশে এ ধরনের ঘটনা বহুবার ঘটেছে তবুও এ ধরনের ন্যাক্কারজনক এবং দণ্ডনীয় অপরাধমূক কর্ম কিছু সংখ্যক ধনী লোকজন অবাধে করে যাচ্ছে। তারা যেভাবে ঘোষণা দিয়ে যাকাত দেয়ার নামে প্রহসন করে থাকে, এর সাথে ইসলামের দূরতম সম্পর্ক নেই। সরকারের উচিত, এ ধরনের কর্ম নিষিদ্ধ করা এবং ধনীদের কাছ থেকে বাধ্যতামূলক যাকাত আদায় করে তা যথাযথখাতে ব্যয় করা।

যদি কোনো ধনী ব্যক্তি অন্যদেরকে যাকাত দেয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করতে ইচ্ছুক হন এবং প্রকাশ্যে যাকাত দেয়ার ঘোষণা দিয়ে অন্যদেরকে অনুপ্রাণিত করতে চান, তাহলে তার উচিত হবে– তিনি ঘোষণা করাবেন যে, তিনি অভাবী লোকদের মধ্য থেকে যাদেরকে যাকাত গ্রহণে উপযুক্ত মনে করবেন তাদের কাছে যাকাত পৌঁছে দেয়া হবে। আমার বাড়িতে এলে কেউ কিছু পাবে না, সুতরাং আমার বাড়িতে যাকাত নেয়ার জন্যে কেউ যেনো না আসে।

(২) যিনি যাকাত প্রদান করবেন, তিনি তার সকল সম্পদের হিসাব করবে এবং তার ঋণের পরিমাণও হিসাব করবেন। ঋণ বাদ দিয়ে যে সম্পদ থাকবে তা থেকে শতকরা আড়াই ভাগ

যাকাত আদায় করবেন। হিসাব না করে অতিরিক্ত কিছু দিলেও যাকাত আদায় হবে না। এ জন্যে অবশ্যই হিসাব করে যাকাত আদায় করতে হবে।

(৩) যাকাতের মূল লক্ষ্য হলো দেশ বা সমাজ থেকে দরিদ্রতার উচ্ছেদ সাধন। এ লক্ষ্য বাস্তবায়ন করার উদ্দেশ্যে যাতাক আদায়ের উপযুক্ত ব্যক্তিবর্গ একত্রিত হয়ে সংঘবদ্ধভাবে নিজ নিজ এলাকার মধ্যে দরিদ্র মানুষদের সার্বিক সমস্যা যাচাই করে পরিকল্পনা করবেন, কিভাবে যাকাত দানের মাধ্যমে এসব সমস্যা সমাধান করা যায়। প্রয়োজনে কাউকে নগদ অর্থ দিবেন, কাউকে রোজগারে উপকরণের ব্যবস্থা করে দিবেন, কারো চিকিৎসার প্রয়োজন হলে ব্যবস্থা করবেন, ছাত্র হলে লেখাপড়ার উপকরণের ব্যবস্থা করবেন, তালাকপ্রাপ্তা বা স্বামী পরিত্যাক্তা, নারীকে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে সেলাই মেশিন বা কম্পিউটারের ব্যবস্থা করে দিবেন ইত্যাদি।

(৪) যাকাত দেয়ার ক্ষেত্রে এমন স্বল্প পরিমাণ কাউকে দেবেন না, যাতে যাকাত গ্রহণকারী ব্যক্তির কোনো কাজেই আসে না। বরং এমন পরিমাণ দিবেন, যাতে গ্রহণকারী ব্যক্তি উপকৃত হতে পারেন। যাকাতের অর্থ- সম্পদ দিয়ে নিজে স্বাবলম্বী হয়ে পরবর্তী বছরে তাকে যাকাত গ্রহণ করতে না হয়।

(৫) মহাগ্রন্থ আল কোরআনে যাকাত প্রদানের যে আটটি খাত প্রদর্শন করা হয়েছে, এর মধ্যে বর্তমান পরিস্থির প্রেক্ষাপটে যে কোনো তিনটি খাতে যাকাত প্রদান করা উত্তম। তবে উক্ত আটটি খাতের মধ্যে 'ফী সাবিলিল্লাহি' অর্থাৎ আল্লাহর পথে জিহাদ তথা দ্বী কায়েমের আন্দোলনে- এ খাতকে অবশ্যই যাকাত প্রদানের খাতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কারণ আল্লাহর দ্বীন কায়েম হলে ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের সুপরিকল্পিত কর্মকাণ্ডের কারণে দেশ থেকে এমনিতেই দারিদ্র দূর হয়ে যাবে এবং যাকাত প্রদানের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধিত হবে। আর এ কারণেই ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে সংগঠন নবী করীম (সাঃ) কর্তৃক প্রদর্শিত পথে ইসলামী আন্দোলন করছে, উক্ত সংগঠনকে যাকাত দিতে হবে।

যাকাতের মূল উৎসসমূহ

সোনা-রোপা, ব্যবসা-বাণিজ্য, ফল-ফসল, গৃহপালিত পশু, খনিজ ও গচ্ছিত সম্পদ, বনজ ও সমুদ্র সম্পদ, কৃষিজাত দ্রব্য, কর্মচারীদের বেতন এবং অত্যাধুনিক সংস্থা ও বিভাগ সমূহ ইত্যাদি।

(১) সোনার যাকাত।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন-

لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يعنى فِى الذَّهَبِ حَتّٰى يَكُوْنَ لَكَ عِشْرُوْنَ دِيْنَارًا، فَاِذَا كَانَتْ لَكَ عِشْرُوْنَ دِيْنَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيْهَا نِصْفُ دِيْنَارٍ، فَمَازَادَ فَبِحَسَبِ ذٰلِكَ-

সোন বিশ দিনারের না হলে কোনো যাকাত নেই। যখন বিশ দিনার হবে এবং এর ওপর এক

বছর পূর্ণ হবে তখন অর্ধেক দিনার যাকাত দিতে হবে। আর যা অতিরিক্ত হবে তা সেই হিসেবে দিতে হবে। (বোখারী, আবু দাউদ, বায়হাকী, আহ্‌মাদ)

হযরত আমর বিন শুয়াইব তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি তাঁর দাদা থেকে এবং তিনি নবী করীম (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

لَيْسَ فِىْ اَقَلّ عِشْرِيْنَ مِثْقَالاً مِنَ الذَّهَبِ صَدَقَةٌ وَلاَ فِىْ اَقَلّ مِنْ مَا ئَتَىْ دِرْهَمٍ صَدَقَةٌ–

সোন বিশ মিছকাল থেকে কম হলে এবং টাকা দুই শত দিরহাম থেকে কম হলে কোনো যাকাত নেই। (দারে কুতনী, ইবনে আবী শুয়াইবা)

এক মিছকাল = ৩, ৭৫ মিঃ গ্রাম। সুতরাং ৩, ৭৫ × ২০ = ৭, ৫০০ মিঃ গ্রাম = ৭. ৫০ তোলা।

অতএব ৭, ৫০০ মিঃ গ্রাম তথা ৭. ৫০ তোলা পরিমাণ সোনা হলে এর মূল্য হিসেব করে শতকরা আড়াই টাকা হিসেবে যাকাত দিতে হবে।

(২) রোপার যাকাত।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

اِذَا كَانَتْ لَكَ مَاءَتَا دِرهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيْهَا خَمْسَةَ دَرَاهِمَ–

যখন তোমার দুইশত দিরহাম থাকবে এবং এর ওপর এক বছর পূর্ণ হবে, তখন পাঁচ দিরহাম যাকাত দিতে হবে। (আবু দাউদ)

হযরত আমর বিন শুয়াইব তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি তাঁর দাদা থেকে, তিনি নবী করীম (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, 'সোনা বিশ মিছকাল থেকে কম হলে যাকাত নেই আর দুইশত দিরহাম থেকে কম হলে যাকাত নেই। (দারে কুতনী, ইবনে আবী শুয়াইবা)

হযরত আবু সাঈদী খুদরী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَ اَوَاقٍ (مِنَ الاوراق) صَدَقَةٌ–

দিরহাম পাঁচ আওকিয়ার কম হলে যাকাত নেই। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

এক আওকিয়া = ৪০ দিরহাম। সুতরাং পাঁচ আওকিয়া = ৪০ × ৫ = ২০০/= দিরহাম।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, 'আমি তোমাদের জন্য ঘোড়া এবং দাসকে যাকাত থেকে বাদ রেখেছি।'

فَهَاتُوْا صَدَقَةَ الرِّقَّةِ (الفضة) مِنْ كُلّ اَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَلَيْسَ فِىْ

تِسْعِيْنَ وَمَائَةٍ شَيْءٌ فَاِذَا بَلَغَتْ مَائَتَيْنِ فَفِيْهِمَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ- (رواه اصحاب السنن)

তোমরা রোপার যাকাত দাও, প্রত্যেক চল্লিশ দিরহামে এক দিরহাম, আর একশত নব্বই হলেও কোনো যাকাত নেই। যখন দুইশত হয়ে যাবে তখন পাঁচ দিরহাম যাকাত দিতে হবে। (আস্‌হাবুস্ সুনান, ইমাম তিরমিযী (রাহঃ) বলেছেন, এ হাদীসটি সম্পর্কে ইমাম বোখারী (রাঃ) এর কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেছিলেন, এটি সহীহ)

(৩) অলঙ্কারের যাকাত।

ইসলামী চিন্তাবিদগণ এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, লু'লু, মোতি, ইয়াকুত, আলমাছ, মারজান এবং জবরজুদ ইত্যাদি দ্বারা নির্মিত অলঙ্কারের যাকাত নেই। কিন্তু যদি তা ব্যবসার জন্য রাখা হয় বা সম্পদ হিসেবে জমা করা হয় তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে।

আর সোনা-রোপার অলঙ্কার সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ) থেকে বর্ণিত কোনো সহীহ হাদীস নেই, এ জন্যে সাহাবায়ে কেরাম ও ইসলামী ফকীহ্ তথা ইসলামী আনজ্ঞদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। হযরত উমার, হযরত ইবনে মাসউদ, হযরত ইবনে আব্বাস এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স (রাঃ) এর মতামত অনুযায়ী মহিলাদের সোনা-রোপার অলঙ্কারের যাকাত আদায় করা ফরজ।

ইমাম আবু হানিফা (রাঃ) এর মতামত অনুযায়ী সোনার অলঙ্কার সাড়ে সাত তোলা হলে যাকাত আদায় করা ফরজ। তাঁর এ মতামতের পক্ষে দলিল হিসেবে হাদীসে বর্ণিত এ ঘটনাটিকে উল্লেখ করেন, 'একজন মহিলা সাহাবী তাঁর মেয়েকে সাথে নিয়ে নবী করীম (সাঃ) এর কাছে এলেন। মেয়েটির দুই হাতেই ছিলো সোনার কঙ্কন। নবী করীম (সাঃ) মেয়েটির হাতে সোনার কঙ্কন দেখে বললেন–

اَتُعْطِيْنَ زَكَوٰةَ هٰذَا ؟ তুমি এর যাকাত আদায় করো?

মহিলা সাহাবী বললেন, 'না, আমি এর যাকাত আদায় করি না।' নবী করীম (সাঃ) বললেন, 'আদালতে আখিরাতে এ দুটি কঙ্কনের পরিবর্তে যখন ওর হাতে আগুনের কঙ্কন পরিয়ে দেয়া হবে তখন কী তুমি খুশী হবে?'

নবী করীম (সাঃ) এর ধরনের সতর্কবানী শুনে মহিলা সাহাবী অত্যন্ত দ্রুত মেয়ের হাত থেকে সোনার কঙ্কন খুলে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর কাছে দিয়ে বললেন, 'আমি এ কঙ্কন দুটি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) কে দান করলাম।' (আবু দাউদ)

তিরমিযী হাদীসে আরেকটি ঘটনা এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবী করীম (সাঃ) এর কাছে এলো এবং তাদের হাতে দুটো সোনার কঙ্কন ছিলো। কঙ্কন দুটো দেখে নবী করীম (সাঃ) বললেন–

أَتُؤَدِّيَانِ زَكَوٰةَ؟ তোমরা কী এর যাকাত আদায় করো? জবাবে তারা জানালো, তারা এর যাকাত আদায় করে না। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বললেন–

أَتُحِبَّانِ اَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللّٰهُ بِسِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟

তোমরা কী পছন্দ করো যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'য়ালা তোমাদের হাতে দুটো আগুনের কঙ্কন পরিয়ে দিন?

ইমাম তিরমিযী (রাঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করার পর মন্তব্য করেছেন, এ হাদীসটির সনদে মুছাল্লা বিন সাবাহ্ অত্যন্ত দুর্বল বর্ণনাকারী। এরপর তিনি মন্তব্য করেছেন–

لاَ يَصِحُّ فِيْ هٰذَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ–

এ বিষয়ে নবী করীম (সাঃ) এর থেকে সহীহ্ভাবে কোনো বর্ণনা নেই।

হযরত ইবনে উমার, হযরত যাবের ও হযরত আয়িশা (রাঃ) এবং হযরত কাসেম ও হযরত কাতাদা (রাহঃ) এর মতামত অনুযায়ী সোনা-রোপার অলঙ্কারের যাকাত নেই। ইমাম মালেক, ইমাম শা'ফী এবং ইমাম আহ্মাদ (রাহঃ) এরও এটাই মতামত। তাঁদের মতামতের পক্ষে দলিল হলো–

(১) হযরত যাবের (রাঃ) বলেছেন, নবী করীম (সাঃ) বলেন–

لَيْسَ فِيْ الْحُلِّيِّ زَكَاةٌ– অলঙ্কারের যাকাত নেই। (দারে কুতনী)

হযরত সাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) এর কাছে জানতে চাওয়া হলো, সোনার অলঙ্কারে কি যাকাত দেয়ার প্রয়োজন আছে? জবাবে তিনি বললেন, 'না'। তাঁর কাছে পুনরায় জানতে চাওয়া হলো, 'অলঙ্কার যদি এক হাজার দিনার সমপরিমাণ মূল্যের হয়?' জবাবে তিনি জানালেন, 'এর বেশী হলেও'। (বায়হাকী)

হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) নিজের মেয়েদেরকে সোনার অলঙ্কার পরাতেন কিন্তু এর যাকাত দিতেন না। আর এসব অলঙ্কারের মূল্য ছিলো প্রায় পঞ্চাশ হাজার। (বায়হাকী)

হযরত আব্দুর রহমান বিন কাশেম (রাহঃ) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন, হযরত আয়িশা (রাঃ) এর নিজ ভাইয়ের কন্যাদেরকে তিনি নিজের বাড়িতেই প্রতিপালন করতেন এবং তাদের সকলেরই সোনার অলঙ্কার ছিলো। কিন্তু এর কোনো যাকাত দিতেন না। (মুওয়াত্তা)

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) নিজের মেয়েদেরকে সোনার অলঙ্কার ব্যবহার করাতেন কিন্তু এর কোনো যাকাত দিতেন না। (মুওয়াত্তা)

(২) যাকাত ওয়াজিব হবার শর্ত হলো সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়া। অর্থাৎ বৃদ্ধিযোগ্য সম্পদ হতে হবে। যেহেতু অলঙ্কার বৃদ্ধি হয় না, এ কারণে অলঙ্কারে যাকাত নেই।

(৩) যাকাত আদায়ের আরেকটি শর্ত হলো, সম্পদ প্রয়োজনের অতিরিক্ত হতে হবে। আর

অলঙ্কার মহিলাদের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্যে অবশ্য প্রয়োজনীয়, এ কারণে অলঙ্কারে যাকাত নেই। সোনার অলঙ্কারে যাকাত দিতে হবে এ ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসসমূহ দুর্বল, এ প্রশ্নে শক্তিশালী হাদীস নেই। আর সোনার অলঙ্কারে যাকাত দিতে হবে না, এ মতের পক্ষে রয়েছে একটি হাদীস, সাহাবায়ে কেরামের কর্ম– ইসলামী শরিয়াতের পরিভাষায় যাকে **'আছার'** বলা হয় এবং সাহাবায়ে কেরামের যুক্তি।

পক্ষে বিপক্ষে হাদীসসমূহ সম্মুখে রেখে ইসলামী আইনজ্ঞগণ রায় দিয়েছেন, ধন-সম্পদশালী ব্যক্তিবর্গ যাদের পরিবারের সদস্যগণ প্রয়োজনের অতিরিক্ত সোনার অলঙ্কার ব্যবহার করেন, তাদেরকে যাকাত আদায় করতে হবে। অর্থাৎ নেসাব পরিমাণ হলে অবশ্যই যাকাত আদায় করতে হবে।

আর যাদের উপার্জন খুবই কম, তাঁরা অতি কষ্টে কিছু সোনার অলঙ্কার বানিয়েছে, যা নেসাব পরিমাণ নয়, তাদেরকে যাকাত আদায় করতে হবে না। কারণ যাদের পক্ষে পরিবারের ব্যয়ভার বহন করাই অসম্ভব তাদের পক্ষে সোনার অলঙ্কারের যাকাত দেয়ার প্রশ্নই আসে না। অথবা অলঙ্কার বিক্রি করে যাকাত দেয়ার আদেশও ইসলাম দেয়নি। তবে কতকগুলো কারণে বিশেষ অবস্থায় সোনার অলঙ্কারের যাকাত আদায় করতে হবে।

(১) অলঙ্কার যদি ব্যবসার উদ্দেশ্যে সঞ্চিত করা হয় তাহলে যাকাত আদায় করতে হবে।

(২) নেসাব পরিমাণ অলঙ্কার যদি সম্পদ হিসেবে সঞ্চিত রাখা হয় তাহলেও যাকাত আদায় করতে হবে।

(৩) অলঙ্কার যদি ভাড়া দেয়ার উদ্দেশ্যে রাখা হয় তাহলে এর মুনাফার ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে।

(৪) অলঙ্কারের পরিমাণ যদি পরিমাণে বেশী হয় তাহলে যাকাত দিতে হবে।

(৫) সোনা বা রোপার ব্যবহার যদি হারামভাবে প্রয়োগ করা হয়। যেমন দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার সামগ্রী তথা সোনার প্লেট, গ্লাস, বোতাম, কলম ইত্যাদি। যারা এই হারাম কাজ করবেন তাদেরকেও এসবের যাকাত দিতে হবে। তবে এ ধারণা করার কারণ নেই যে, ইসলামে নিষিদ্ধ কাজ করে যে গোনাহ্ হবে, এসবের যাকাত দিলে বোধহয় গোনাহ্ ক্ষমা করা হবে।

অবশ্য পুরুষদের জন্যে রোপার আংটি, পবিত্র কোরআনের জন্যে ব্যবহৃত সোনার গেলাফ, যুদ্ধাস্ত্রে ব্যবহৃত সোনার অংশ ইত্যাদিতে যাকাত আদায় করতে হবে না, কারণ এটা মোবাহ্।

সোনা ও রোপার মিলিত যাকাত

সোনা ও রোপা যদি মিলিতভাবে নেসাব পরিমাণও না হয়, তাহলে যাকাত আদায় করতে হবে না। আর যদি এ দুটো মিলিতভাবে হিসাব করলে নেসাব পরিমাণ হয় তাহলে অবশ্যই যাকাত আদায় করতে হবে। অর্থাৎ যাকাত ওয়াজিব হবে।

হযরত বুকাইর বিন আব্দুল্লাহ আল আশজা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন–

مَضَتِ السُّنَّةُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ضَمَّ الزَّهَبَ اِلَى الْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ اِلَى الزَّهَبِ وَاَخْرَجَ الزَّكَاةَ عَنْهُمَا– (مسالك الدلالة)

নবী করীম (সাঃ) সোনাকে রোপার সাথে এবং রোপাকে সোনার সাথে মিলিয়ে যাকাত আদায় করতেন।

কোনো ব্যক্তির কাছে যদি নেসাবের অর্ধেক পরিমাণ সোনা থাকে এবং নেসাবের অর্ধেক পরিমাণ রোপা থাকে, আর দুটো মিলিয়ে নেসাব পরিমাণ হয়, তাহলে তার ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে।

উদাহরণ স্বরূপ, এক ব্যক্তির কাছে ১৬০/= দিরহাম পরিমাণ সোনা আছে এবং ৪০/= দিরহাম পরিমাণ রোপা আছে। সোনা ও রোপা মিলিয়ে রয়েছে ১৬০ + ৪০ = ২০০/= দিরহাম। তাহলে যাকাত আদায় করা ওয়াজিব হবে।

(৪) ব্যবসা-বাণিজ্য

দেশের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ব্যবসা- বাণিজ্যের ওপর যাকাত রয়েছে। ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের সরকার তা আদায় করবে। হযরত যুনদুব বিন সামারাহ্ (রাঃ) বলেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَاْمُرُنَا اَنْ نَخْرُجَ الصَّدَقَةَ مِمَّا يُعَدُّ لِلْبَيْعِ–

নবী করীম (সাঃ) আমাদেরকে নির্দেশ দিতেন, আমরা যেনো ব্যবসার জন্যে রাখা সামগ্রীর যাকাত আদায় করি। (আবু দাউদ)

হযরত আবু আমর বিন হামাছ (রাহঃ) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেছেন, আমি চামড়া এবং ডেক্‌সি বিক্রি করতাম। হযরত উমার (রাঃ) আমার এ ব্যবসা দেখে বললেন–

اَدِّ صَدَقَةَ مَالِكَ– তোমার সম্পদের যাকাত আদায় করো।

আমি বললাম, হে আমিরুল মুমিনীন! এটা চামড়া মাত্র! তিনি বললেন– ثُمَّ اَخْرِجْ صَدَقَةً

এর মূল্য নির্ধারণ করো এবং এরপর যাকাত আদায় করো। (শা'ফী, আহ্‌মাদ, দারে কুতনী, বায়হাকী)

ব্যবসা-বাণিজ্যের যাকাত নির্ধারণ পদ্ধতি

বছর পূর্ণ হলে বিক্রির জন্যে প্রস্তুত সকল পণ্য- সামগ্রী, নগদ অর্থ এবং ফেরৎ পাবারযোগ্য ঋণ যোগ করা হবে। এরপর মোট হিসাব থেকে নিজের ঋণ বাদ দিয়ে তারপর যা অবশিষ্ট থাকবে তার শতকরা আড়াই টাকা হিসেবে যাকাত আদায় করতে হবে।

বাসগৃহ, অট্টালিকা, গাড়ী, যানবাহন, উৎপাদন যন্ত্র এবং অন্যান যন্ত্রাংশ বা যন্ত্র ইত্যাদির যাকাত আদায় করতে হবে না। তবে এসব যদি উপার্জনের মাধ্যম হয় বা এসব থেকে অর্থ- সম্পদ অর্জন করা যায়, তাহলে অর্জিত আয় থেকে যাকাত দিতে হবে।

(৫) কৃষি পণ্য।

কৃষি পণ্য বলতে ঐ সকল পণ্যকেই বোঝায় যা যমীনে উৎপাদিত হয়। যেমন ধান, গম, যব, মসুর, কলাই, ছোলা, মটর, অড়হড়, মুগ, শরিষা, পাট, পিঁয়াজ, রুসন, শাক- শব্জি ইত্যাদি।

ইমাম আবু হানীফা (রাহঃ) বলেছেন, যমীন থেকে যা উৎপাদন হয় তাতে এক দশমাংশ যাকাত তথা উ'শর ওয়াজিব। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেছেন-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ-

হে মুমিমনগণ! তোমাদের নিজেদের উপার্জিত সম্পদ এবং তোমাদের জন্য যা যমীন থেকে উৎপন্ন করেছি তা থেকে উৎকৃষ্ট অংশ ব্যয় করো (যাকাত দাও)। (সূরা বাকারা)

তেমনি বিভিন্ন রকম ফলমূলের এক দশমাংশ যাকাত দিতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন-

كُلُوْا مِنْ ثَمَرِه اِذَا اَثْمَرَ وَاتُوْا حَقَّه يَوْمَ حَصَادِه، وَلَا تُسْرِفُوْا، اِنَّه لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ-

এগুলোর ফল খাও যখন তা ফলন্ত হয় এবং ফসল কাটার দিন এর হক (যাকাত) আদায় করো। আর অপব্যয় করো না। আল্লাহ নিশ্চয়ই অপব্যয় কারীদের পছন্দ করেন না। (সূরা আনয়াম-১৪১)

বর্তমান যুগে ফলমূলের বাগান, শব্জি ক্ষেত, হাঁস-মুরগী ও গরু-ছাগলের হ্যাচারী এবং ফার্ম করে অর্থ উপার্জন করা হয়। এসব থেকে উপার্জিত অর্থ যদি নেসাব পরিমাণ হয় তাহলে তা থেকে যাকাত আদায় করতে হবে। এটাই ইমাম আবু হানীফা (রাহঃ) এর মতামত এবং তিনি বলেছেন-

كُلُّ مَا اَخْرَجَتْهُ الْاَرْضُ فَفِيْهِ الْعُشْرُ-

যমীন থেকে যা উৎপন্ন হয় তার এক দশমাংশ যাকাত দিতে হয়।

কৃষিপণ্য, ফল ও সব্জির নেসাব

যে সকল ফসলে শ্রমের মাধ্যমে পানি সিঞ্চন করতে হয় না, মহান আল্লাহর দেয়া বৃষ্টির পানি বা ঝর্ণার পানির মাধ্যমে বর্ধিত হয় এবং ফসল দান করে, এ সব ফসলের এক দশমাংশ যাকাত আদায় করতে হবে।

আর যেসব যমীনে শ্রম দিতে হয়, অর্থাৎ হাল-চাষ করতে হয়, পানি সেচ দিতে হয়, আগাছা পরিষ্কার করার জন্য শ্রমিক নিয়োগ করতে হয় ইত্যাদি। এসব যমীন থেকে উৎপাদিত ফসলের বিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত আদায় করতে হবে।

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

فِمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُوْنُ اَوْ كَانَ عَشَرِيًّا اَلْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ– (رواه البخارى)

যেসব যমীন বৃষ্টি ও ঝর্ণার পানি দ্বারা সিক্ত হয় অথবা স্বাভাবিকভাবেই সিক্ত থাকে, সেসব যমীনের উৎপাদনের এক দশমাংশ যাকাত আদায় করা ওয়াজিব। আর যেসব যমীনে পানি সেচ করে সিক্ত করে ফসল উৎপাদন করা হয়, তাতে উৎপন্ন ফসলের বিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত ওয়াজিব। (বোখারী)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

لَيْسَ فِيْهَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسَقٍ صَدَقَةٌ–

পাঁচ ওছকের কম হলে তাতে যাকাত নেই। (আহ্‌মাদ, বায়হাকী, বোখারী)

ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞদের মতে এক ওছক সমান ১৩১ কিলোগ্রাম বা কেজি। সুতরাং পাঁচ ওছক সমান ৬৫৫ কেজি বা কিলোগ্রাম হবে।

উৎপাদনের শ্রম এবং নিজের পরিবারের ব্যয় বাদ দিয়ে পাঁচ ওছকের পরিমাণ বা তার চেয়ে বেশী থাকে, তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে।

অপরদিকে গৃহপালিত পশু তথা উট, গরু, মেষ, ছাগল, হাস-মুরগী ইত্যাদির খামারসমূহ কৃষি খামার হিসেবে গণ্য হবে। এসব খামারের নেট আয়ের বিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত হিসেবে দিতে হবে।

(৬) চতুষ্পদ জন্তু।

গৃহ পালিত চতুষ্পদ জন্তুর যাকাত আদায়ের অন্যতম শর্ত হলো, এসব পশু বছরের অধিকাংশ সময় সরকারী চারণ ভূমিতে চরে নিজেদের আহার যোগাড় করে। অর্থাৎ পশুর মালিককে এদের পেছনে তেমন একটা খরচ করতে হয় না। আমাদের বাংলাদেশে এ ধরনের চারণ ভূমি নেই যেখানে পশুদল চরে নিজেদের আহার যোগাড় করবে। এ জন্যে এ মাস্‌আলাটি এখানে আলোচনার প্রয়োজন নেই।

উটের নেসাব

উট পাঁচটির কম হলে এতে যাকাত আদায় করতে হবে না। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

لَيْسَ فِيْهَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الابِلِ صَدَقَةٌ

উট পাঁচটির কম হলে যাকাত নেই। (বোখারী)

পশুর সংখ্যা অনুপাতে নেসাব

উটের সংখ্যা ১ থেকে ৪ টি পর্যন্ত হলে এতে কোনো যাকাত দিতে হবে না।

উটের সংখ্যা ৫ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১০ টি পর্যন্ত হলে এক বছর বয়সী একটি ছাগলের বাচ্চা যাকাত হিসেবে দিতে হবে।

উটের সংখ্যা ১০ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৪ টি হলে এক বছর বয়সী ২ টি ছাগলের বাচ্চা যাকাত হিসেবে দিতে হবে।

উটের সংখ্যা ১৫ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯ টি হলে এক বছর বয়সী ৩ টি ছাগলের বাচ্চা যাকাত হিসেবে দিতে হবে।

উটের সংখ্যা ২০ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২৪ টি হলে এক বছর বয়সী ৪ টি ছাগলের বাচ্চা যাকাত হিসেবে দিতে হবে।

উটের সংখ্যা ২৫ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৫ টি হলে এক বছর বয়সী ১ টি বাচ্চা উটনী যাকাত হিসেবে দিতে হবে।

উটের সংখ্যা ৩৬ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৪৫ টি হলে দুই বছর বয়সী ১ টি বাচ্চা উটনী যাকাত হিসেবে দিতে হবে।

উটের সংখ্যা ৪৬ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৬০ টি হলে ৩ বছর বয়সী ১ টি বাচ্চা উটনী যাকাত হিসেবে দিতে হবে।

উটের সংখ্যা ৬১ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭৫ টি হলে ৪ বছর বয়সী ১ টি বাচ্চা উটনী যাকাত হিসেবে দিতে হবে।

উটের সংখ্যা ৭৬ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৯০ টি হলে ২ বছর বয়সী ২ টি বাচ্চা উটনী যাকাত হিসেবে দিতে হবে।

উটের সংখ্যা ৯১ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১২০ টি হলে ৩ বছর বয়সী ৩ টি বাচ্চা উটনী দিতে হবে।

এরপর যত সংখ্যাই বৃদ্ধি পাবে এতে প্রত্যেক ৪০ টিতে ১ টি ২ বছর বয়সী বাচ্চা উটনী যাকাত হিসেবে দিতে হবে। আর প্রত্যেক ৫০ টিতে ৩ বছর বয়সী ১ টি বাচ্চা উটনী দিতে হবে।

গরুর নেসাব

হযরত মায়ায বিন জাবাল (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) আমাকে ইয়েমেনে পাঠানোর সময় আদেশ করেছেন, আমি যেনো প্রত্যেক ৩০ টি গরুর যাকাত হিসেবে ১ বছরের কম বয়সী ১ টি বকনা গরু গ্রহণ করি এবং গরুর সংখ্যা ৪০ টি হলে এক বছর বয়সী ১ টি বকনা গরু গ্রহণ করি।

গরুর সংখ্যা ১ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২৯ টি পর্যন্ত হলে এতে যাকাত দিতে হবে না।

গরুর সংখ্যা ৩০ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৯ টি পর্যন্ত হলে ১ বছরের কম বয়সী ১ টি বাচ্চা গরু تبعة যাকাত হিসেবে দিতে হবে।

গরুর সংখ্যা ৪০ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৫৯ পর্যন্ত হলে ২ বছর বয়সী বকনা গরু ১টা مسنة যাকাত হিসেবে দিতে হবে।

গরুর সংখ্যা ৬০ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৬৯ পর্যন্ত হলে ২ টি تبية গরু যাকাত হিসেবে দিতে হবে।

গরুর সংখ্যা ৭০ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭৯ পর্যন্ত হলে تبية ১টি এবং مسنة ১টি গরু যাকাত হিসেবে দিতে হবে।

গরুর সংখ্যা ৮০ থেকে ৮৯ সংখ্যায় উন্নিত হলে مسنان যাকাত হিসেবে দিতে হবে।

গরুর সংখ্যা ৯০ থেকে ৯৯ হলে تبية তিনটি যাকাত হিসেবে দিতে হবে।

গরুর সংখ্যা ১০০ থেকে ১০৯ হলে مسنة ১টি এবং تبية ২টি যাকাত হিসেবে দিতে হবে।

গরুর সংখ্যা ১১০ থেকে ১১৯ হলে مسنة ২টি এবং تبية ১টি যাকাত হিসেবে দিতে হবে।

গরুর সংখ্যা ১২০ টি হলে ৩টি مسنة যাকাত হিসেবে দিতে হবে।

এরপর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত প্রত্যেক ৩০টিতে ১টি تبية যাকাত হিসেবে দিতে হবে এবং প্রত্যেক ৪০টিতে ১টি مسنة যাকাত হিসেবে বৃদ্ধি হবে।

আর মহিষের যাকাত গরুর যাকাতের অনুরূপ দিতে হবে।

ছাগলের নেসাব

ছাগলের সংখ্যা ১ থেকে ৩৯ টি পর্যন্ত হলে কোনো যাকাত দিতে হবে না।

ছাগলের সংখ্যা ৪০ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১২০ টি পর্যন্ত হলে ১ বছর বয়সী ১ টি বাচ্চা ছাগী যাকাত হিসেবে দিতে হবে।

ছাগলের সংখ্যা ১২১ টি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০ টি পর্যন্ত হলে ১ বছর বয়সী ২ টি বাচ্চা ছাগী যাকাত হিসেবে দিতে হবে।

ছাগলের সংখ্যা ২০১ টি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩০০ টি পর্যন্ত বৃদ্ধি পেলে ৩ টি বাচ্চা ছাগী যাকাত হিসেবে দিতে হবে।

এরপর প্রত্যেক একশত সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে ১ টি বাচ্চা ছাগী যাকাত হিসেবে দিতে হবে।

মধুর যাকাত

মধু যদি বন- জঙ্গল বা অন্য কোনো স্থান থেকে সংগ্রহ করা হয় এবং সংগৃহীত মধু নেসাব পরিমাণ হলে এর ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে। যাকাতের অংশ হিসেবে এক দশমাংশ যাকাত দিতে হবে।

হযরত আমর বিন শুয়াইব (রাহঃ) তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (সাঃ) মধুর এক দশমাংশ যাকাত গ্রহণ করেছেন। (ইবনে মাজাহ্, দারে কুতনী)

আর মধু যদি চাষের মাধ্যমে অর্জন করা হয় এবং তা যদি নেসাব পরিমাণ হয় তাহলে এর বিশ ভাগের এক যাকাত হিসেবে দিতে হবে। কারণ এতে মূল ধন ও শ্রম ব্যয় করতে হয়েছে বিধায় নেসাব পরিমাণ মধুর বিশ ভাগের এক ভাগ।

চুক্তি ভিত্তিক যমীনে উৎপন্ন ফসলের যাকাত

কোনো ব্যক্তি যদি যমীন কারো কাছ থেকে ভাড়া হিসেবে বা বাৎসরিক চুক্তি হিসেবে গ্রহণ করে, তাহলে যমীনের মূল মালিককে যাকাত দিতে হবে না। তবে যমীন ভাড়া দিয়ে যে অর্থ তিনি আয় করলেন তা যদি নেসাব পরিমাণ হয় এবং এক বছর কাল অতিবাহিত হয় তাহলে তার অর্জিত অর্থের যাকাত দিতে হবে।

যিনি যমীন ভাড়া নিলেন, উক্ত যমীনে যদি নেসাব পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হয় তাহলে তাকে যাকাত দিতে হবে। উৎপন্ন ফসলের যাকাত যমীনের মালিককে দিতে হবে বরং যিনি ভাড়া নিয়েছেন তিনিই দিবেন। এটাই হলো অধিকাংশ ইসলামী আনজ্ঞদের মতামত। আর ইমাম আবু হানীফা (রাহঃ) এর মতামত হলো স্বয়ং যমীনের মালিককেই যাকাত দিতে হবে।

কিন্তু ইবনে কুদামা (রাহঃ) বলেন, অধিকাংশ চিন্তাবিদগণের মতামতই গ্রহণযোগ্য। কারণ–

(ক) শুধু ভূমির ওপর যদি যাকাত ওয়াজিব হতো তাহলে ভূমিতে ফসল উৎপন্ন না হলেও যাকাত ওয়াজিব হতো।

(খ) ভূমির ওপর যদি যাকাত ওয়াজিব হতো তাহলে ভূমির পরিমাণ অনুযায়ী যাকাত ওয়াজিব হতো। অথচ যাকাত ওয়াজিব হয় ফসলের পরিমাণ অনুযায়ী।

যাকাতের (উশুরের) মূল্য প্রদান করা

হযরত তাউছ (রাঃ) বলেছেন, হযরত মায়ায (রাঃ) ইয়েমেনের অধিবাসীদেরকে বলেছেন, আপনারা যব ও ভুট্টার পরিবর্তে কাপড় ও পোশাক দেন–

هُوَ اَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لاَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِيْنَةِ–

এটা তোমাদের জন্য বহন করা সহজ হবে এবং মদীনায় নবী করীম (সাঃ) এর সাহাবায়ে কেরামের জন্য উপকারী হবে। (বোখারী)

استدل البخاری بهذا التعليق على جواز اخراج القيمة فى الزكاة–

ইমাম বোখারী (রাহঃ) উক্ত বর্ণনার মাধ্যমে যাকাতের মূল্য প্রদান করা যায়েজ বলে প্রমাণ করেছেন।

ইমাম আহ্মাদ বিন হাম্বল সানাবিহী থেকে বর্ণনা করে বলেছেন, নবী করীম (সাঃ) একদিন যাকাতের উটের দলে দুই বছর বয়সী একটি বাচ্চা উটনী দেখে রাগত কণ্ঠে বললেন, 'এটা কি?' জবাবে তিনি বললেন, 'এটা আমি যাকাতের দুইটি উটের পরিবর্তে গ্রহণ করেছি।' এ কথা শুনে নবী করীম (সাঃ) নীরব থাকলেন।

অর্থাৎ দুইটি উটের মূল্য হিসেবে তিনি দুই বছর বয়সী বাচ্চা উটনি গ্রহণ করেছেন।

হযরত আবু বকর (রাঃ) এর সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, 'যার যাকাত হয়েছে ৪ বছরের বাচ্চা উটনী, কিন্তু তার কাছে তা নেই। রয়েছে ৩ বছর বয়সী বাচ্চা উটনী। এ অবস্থায় তার কাছ থেকে তা গ্রহণ করা হবে এবং সে দিবে ২০ দিরহাম অথবা ২ টি ছাগল। আর যার যাকাত হয়েছে ৩ বছর বয়সী বাচ্চা উটনী। কিন্তু তার কাছে তা নেই। রয়েছে ২ বছর বয়সী বাচ্চা উটনী। তার কাছ থেকে তা গ্রহণ করা হবে এবং সেই সাথে সে দিবে ২ টি ছাগল, যদি তার কাছে থেকে থাকে। আর না থাকলে সে দিবে ২০ দিরহাম। (বোখারী, আবু দাউদ, নাসাঈ, আহ্মাদ, দারে কুতনী)

উল্লেখিত হাদীসে ২ টি ছাগলের পরিবর্তে ২০ দিরহাম গ্রহণের নির্দেশ করা হয়েছে। আর এটাই হলো হযরত উমার, ইবনে উমার, ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস এবং হযরত মায়ায বিন জাবাল (রাঃ) এর মতামত এবং এটাই হযরত ইমাম আবু হানীফা (রাহঃ) এর মতামত।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে উশুর

ভূমি সাধারণত দুই প্রকার, এর একটি হলো উশুরিয়া এবং অপরটি হলো খারাজিয়া।

(ক) উশুরিয়া বলা হয় সেই সকল ভূমিকে যে ভূমির মালিক মুসলিমগণ অথবা ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের সরকার তা হস্তগত করে মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছে অথবা মুসলিমগণ তা চাষাবাদ করছেন। (ফিক্হুস্ সুন্নাহ্)

(খ) খারাজী ভূমি বলতে বোঝায় সেই সকল ভূমিকে যা ইসলামী সরকার দখল করে সেই যমীনের অধিবাসীদের থেকে বিনিময় গ্রহণ করে চাষাবাদ করার জন্য দিয়ে থাকে। আরবী ভাষায় সেই বিনিময়ের নাম হলো খারাজ। (ফিক্হুস্ সুন্নাহ্)

বাংলাদেশের সকল যমীনই হলো উশুরী যমীন। এ জন্যে বাংলাদেশের যমীনে যা কিছুই উৎপন্ন হোক না কেনো, তা যদি নেসাব পরিমাণ হয় তাহলে তাতে উশুর ওয়াজিব হবে।

যমীনের মালিকানার ওপর সরকার ভূমি-কর ধার্য্য করে থাকে। তাই এটা খারাজ নয়। আর উশুর ওয়াজিব হয় ফসলের ওপর, যমীনের ওপর নয়। সুতরাং ভূমি-কর উশুরের অন্তরায় হতে পারে না বা এ কথা বলার সুযোগ নেই যে, যেখানে কর বা খাজনা প্রদান করা হয়, সেখানে উশুর আদায় করা যাবে না। বাংলাদেশের ভূমিতে যা কিছুই উৎপন্ন হোক না কেনো, তা যদি

নেসাব পরিমাণ হয় তাহলে যমীনের খাজান বা ট্যাক্স যা-ই দেয়া হোক না কেনো, নেসাব পরিমাণ হলে উশুর আদায় করতেই হবে।

এ ভূমি-কর ধার্য্য করা হয় সরকার কর্তৃক, আর উশুর ধার্য্য করেছেন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। সুতরাং উশুর হলো ইবাদাত এবং এটি আদায় করতেই হবে। অপরদিকে উশুর এবং সরকারী ট্যাক্সের মধ্যে কোনোই পার্থক্য নেই।

অমুসলিম সম্প্রদায় ও উশুর

মুসলিম হোক অমুসলিম হোক, দেশের সকল অধিবাসীই বাংলাদেশের বৈধ নাগরিক। ধর্ম বিচারে নাগরকিদের মধ্যে কোনোই বৈষম্য নেই। এ জন্যে কৃষিপণ্যের উশুর অমুসলিম নাগরিকগণও মুসলমানদের অনুরূপ দিতে বাধ্য থাকবেন। তাঁরা ইচ্ছে করলে এটি উশুর নামেও দিতে পারেন অথবা উৎপাদন কর নামেও দিতে পারেন।

অমুসলিম নাগরিকবৃন্দ উশুর দিবেন এ কারণে যে, এটি হলো গরীব- দরিদ্র মানুষের অধিকার। আর সরকার ধনীদের কাছ থেকে গরীবদের অধিকার আদায় করে তা গরীবদের মধ্যে বন্টন করবে। এ ক্ষেত্রে দেশের পুজিপতি বা ধনীক সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মীয় বিচারে কোনোই পার্থক্য করা হবে না। উশুরের হিসাব করা হবে ফসল কাটার পূর্বে বা ফসল কাটার সময় যা খাওয়া হবে তা বাদ দিয়ে উশুরের হিসাব করা হবে।

শেয়ারের যাকাত

১৯৮৮ সালে ফেব্রুয়ারী মাসের ১১ তারিখে সাউদী আরবের জেদ্দা নগরীতে ইসলামী চিন্তাবিদদের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং উক্ত বৈঠকে শেয়ারের যাকাত সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তা আমরা নিম্নে উল্লেখ করলাম।

১। যদি কোম্পানী তার সকল সম্পদের যাকাত আদায় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে অথবা সরকারী আইন অনুযায়ী কোম্পানী যাকাত আদায় করতে বাধ্য হয় তাহলে সকল সম্পদ একক ব্যক্তির সম্পদ হিসেবে গণ্য করে কোম্পানীর পরিচালক বা পরিচালকগণ বছর পূর্ণ হলে শতকরা আড়াই টাকা হিসেবে সকল সম্পদের যাকাত আদায় করবে।

২। আর যদি কোনো কারণে কোম্পানী যাকাত আদায় না করে এবং শেয়ার মালিকগণও কোম্পানীর সম্পদের হিসাব না জানে, তাহলে শেয়ারের মালিকগণ নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে যাকাত আদায় করবে।

(ক) যদি কোনো ব্যক্তি বাৎসরিক মুনাফার উদ্দেশ্যে কোনো কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করে তাহলে তার মূল শেয়ারের ওপর যাকাত বর্তাবে না। বরং মুনাফার ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে। মুনাফা লাভের সাথে সাথে কেবল মুনাফার যাকাত আদায় করবে এবং এরপর ওপর বছর পূর্ণ হওয়া শর্ত নয়। তবে মুনাফার অর্থ তার মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত হতে হবে।

(খ) আর কেউ যদি ব্যবসার উদ্দেশ্যে এমন ধরনের শেয়ার ক্রয় করে যা স্টক মার্কেটে ক্রয়-বিক্রয় করা হয়, তাহলে বছর পূর্ণ হলে তার কাছে যত টাকা থাকবে তা হিসেবে করে যাকাত আদায় করতে হবে।

কর্মচারীদের বেতন থেকে যাকাত আদায়

সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন থেকে যাকাত আদায় করার পদ্ধতি হলো দুটো। যেমন–

(ক) উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের বছর শেষে যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ অবশিষ্ট থাকে এবং তা যদি যাকাতের নেসাব পরিমাণ হয় তাহলে সরকার তা থেকে শতকরা আড়াই টাকা হিসেবে যাকাত গ্রহণ করবে।

(খ) উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা– যাদের বেতন যাকাতের নেসাব থেকে অধিক, তাদের বেতন থেকে সরকার যাকাতের টাকা কর্তন করে রাখবে।

হযরত উমার বিন আব্দুল আযিয (রাহঃ) যখন কর্মচারীদের বেতন দিতেন তখন বেতন থেকেই যাকাত রেখে দিতেন। হযরত ইবনে মাসউদ ও হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) এর মতামত এটাই ছিলো। তাঁদের দলিল হলো, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন–

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ–

আমি তাদেরকে যে রিযক্ দান করেছি তা থেকে তারা ব্যয় করে। (সূরা বাকারা)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ–

হে মুমিনগণ! তোমাদের উপার্জিত অর্থ এবং আমি যা তোমাদের জন্য যমীন থেকে উৎপন্ন করেছি তা থেকে উত্তম অংশ ব্যয় করো। (সূরা বাকারা)

(ذكره ابو عبيد فى "الاموال")

দানকৃত সম্পদ থেকে যাকাত আদায়

উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি, অসয়্যিত, ওয়াকফ্ ও সব ধরনের অনুদান এবং প্রাপ্ত পুরস্কার ইত্যাদিও দানের অন্তর্ভুক্ত। সরকার এসব থেকে যাকাত আদায় করবে। হযরত ইবনে শিহাব (রাঃ) বলেন–

اَوَّلُ مَنْ اَخَذَ مِنَ الْاَعْطِيَةِ الزَّكَاةَ مَعَاوِيَةُ بِنْ اَبِىْ سُفْيَانَ–

সর্বপ্রথম দান থেকে যাকাত গ্রহণ করেছেন হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রাঃ)। (রাওয়াহু মালিক ফিল মুয়াত্তা)

সামুদ্রিক সম্পদ

মাছ, মুক্তা, পানির নীচের অর্থকরী পাথর ও অন্যান্য যা কিছু পানির নীচে পাওয়া যাবে তারএক পঞ্চমাংশ যাকাত দিতে হবে। হযরত উমার (রাঃ) বলেছেন–

فِيْمَا اَخْرَجَ اللّٰهُ جَلَّ ثَنَاهُ عَنِ الْبَحْرِ الْخُمُسُ- (كتاب الخراج)

মহান আল্লাহ তা'য়ালা যা কিছু সমুদ্র থেকে বের করে দিয়েছেন তার এক পঞ্চমাংশ যাকাত দিতে হবে। (কিতাবুল খারাজ)

হযরত ইবনে আব্বাস ও হযরত আলী (রাঃ), হযরত উমার বিন আব্দুল আযীয, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম যুহ্‌রী (রাহঃ) সহ অন্যান্য আইনবিদদের একইরূপ মতামত। (ফতহুল বারী, ফিকহুল ইসলামী)

বনজ সম্পদ

অর্থকরী বৃক্ষ, বাঁস, বেত, রবার বৃক্ষ ইত্যাদি বনজ সম্পদের মধ্যে শামিল। বনজ সম্পদের এক দশমাংশ যাকাত দিতে হবে। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন-

لا مَا اَخْرَجَتْهُ الاَرْضُ فَفِيْهِ الْعُشُرُ-

যমীন থেকে কিছু উৎপন্ন হয় তার এক দশমাংশ (উশুর) যাকাত দিতে হবে। (আল হাদীস)

খনিজ সম্পদ

তৈল, গ্যাস, স্বর্ণ-রৌপ্য, তামা, দস্তা, আকরিক্‌সহ অন্যান্য সকল বস্তু- যা ভূগর্ভ থেকে উত্তোলন করা হয় তা সবই খনিজ সম্পদ। এই সম্পদের এক পঞ্চমাংশ যাকাত ওয়াজিব। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন-

وَفِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ- (رواه البخارى)

ভূগর্ভ থেকে প্রাপ্ত সম্পদের যাকাত হলো এক পঞ্চমাংশ। (বোখারী)

ইসলামী আইনবিদদের সিদ্ধান্ত অনুসারে ভূগর্ভে প্রাপ্ত সম্পদকে রিকাজ বলা হয়। যাবতীয় খনিজ ও গচ্ছিত সম্পদ আর আওতাভুক্ত। এটাই ইমাম আবু হানীফা (রাহঃ) এর মতামত। সুতরাং ভূগর্ভ থেকে যা কিছু খনিজ সম্পদ উত্তোলন করা হবে তার যাকাত আদায় করতে হবে।

বিভিন্ন প্রকার যান-বাহনের যাকাত

যে কোনো ধরনের যান-বাহন, তা হতে পারে আকাশ পথে, নৌপথে বা স্থল পথে, এসব বাহন থেকে যা কিছু উপার্জিত হবে বছর শেষে উপার্জিত আয় থেকে শত করা আড়াই টাকা হারে যাকাত দিতে হবে।

যোগাযোগের মাধ্যম থেকে যাকাত আদায়

ডাক ব্যবস্থা, রেডিও, টেলিভিশন, ডিস, টেলিফোন, মোবাইল, ইন্টারনেট, ফ্যাক্স, টেলেক্সসহ যা কিছু রয়েছে তা থেকে যা উপার্জন করা হবে এবং বছর শেষে উপার্জিত আয় থেকে শত করা আড়াই টাকা হারে যাকাত আদায় করতে হবে।

বিদ্যুৎ ব্যবস্থা থেকে যাকাত আদায়

বিদ্যুৎ বিভাগ থেকে যা কিছু উপার্জন করা হবে এবং বছর শেষে উপার্জিত আয় থেকে শত করা আড়াই টাকা হারে যাকাত হিসেবে আদায় করতে হবে। (আল মুগ্নী)

বাড়ী ও অন্যান্য স্থাপনা থেকে যাকাত আদায়

বাড়ী, শপিং মল, দোকান ঘর, ব্যাংক বা অন্যান্য অপিস, বিভিন্ন ধরনের শিল্প কলকারখানা এবং অন্যান্য ভবন বা স্থাপনা যদি ভাড়া দেয়া হয় এবং এসব থেকে উপার্জিত অর্থের বছর শেষে শত করা আড়াই টাকা হারে যাকাত আদায় করতে হবে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেশের অতি হতদরিদ্র মানুষই জাতীয় সম্পদ ভোগ করা থেকে বঞ্চিত থাকে, যদিও এসব সম্পদে তাদেরই অধিকার সর্বাধিক। অপরদিকে যাকাতের মূল উদ্দেশ্যই হলো জাতীয় সম্পদের বিভিন্ন উৎস থেকে দরিদ্র ও বঞ্চিত মানুষের অধিকার বের করে তা দরিদ্র ও অভাবী লোকদের মাঝে বন্টন করে তাদের অভাব মোচন করার কার্যকর ব্যবস্থা করা। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَفِىْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ–

তাদের সম্পদে রয়েছে প্রার্থনাকারী ও বঞ্চিতদের অধিকার। (সূরা যারিয়াত-১৯)

পবিত্র কোরআনের আদেশ অনুসারে ইসলামী সরকার জাতীয় সম্পদের বিভিন্ন উৎস থেকে অভাবী ও দরিদ্র মানুষের অধিকার বের করে এনে তা পরিকল্পনা ভিত্তিক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের মধ্যে বন্টন করে অভাব মোচন করা। এ কথা অবশ্যই সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে, প্রত্যেকটি মুসলিম দেশের জাতীয় সম্পদের বিভিন্ন উৎস থেকে দরিদ্র মানুষের অধিকার বের করে এনে যাকাত ফাণ্ডে জমা করলে যাকাত ফাণ্ড কল্পনাতীতভাবে স্ফীত হবে। পরিকল্পনা ভিত্তিক এসব সম্পদ দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করা হলে দেশ থেকে দরিদ্রতা উচ্ছেদ করা মোটেও অসম্ভব নয়। ইসলাম যাকাত ভিত্তিক অর্থনীতির ব্যবস্থাই করেছে দেশ থেকে দরিদ্রতার উচ্ছেদ সাধন করার লক্ষ্যে।

বর্তমান পৃথিবীতে যদি কেউ কল্যাণ রাষ্ট্র গড়তে চায় তাহলে যাকাত ভিত্তিক অর্থনীতির কোনোই বিকল্প নেই। জনকল্যাণ মূলক রাষ্ট্র পরিকল্পনা করে দেশের মানুষের আয় ও ব্যয়ের খাত নির্ধারণ করবে এবং যাকাত ব্যবস্থা এতে কোনো প্রভাব ফেলবে না। কারণ ইসলামী আইনবিদদের সর্বসম্মত মূলনীতি হলো–

فِىْ مَالِكَ حَقٌّ سِوَاىِ الزَّكٰوةِ–

"আপনার সম্পদে যাকাত ব্যতীতও সমাজের অধিকার রয়েছে।" (কিতাবুল আমওয়াল)

সুতরাং দেশের সরকার প্রয়োজন অনুযায়ী যাকাত দাতার ওপর করও ধার্য্য করতে পারে, এতে যাকাতের ওপর কোনো প্রভাব পড়বে না।

যাকাতের অর্থ-সম্পদ ব্যয়ের খাতসমূহ

মহান আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করেছেন-

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ، فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ، وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ-

এসব সাদাকা (যাকাতের অর্থ-সম্পদ) হচ্ছে ফকীর- মিসকীনদের জন্যে, এ (ব্যবস্থার আওতাধীন) কর্মচারীদের জন্যে, যাদের অন্তকরণ (দ্বীনের প্রতি) অনুরাগী করা প্রয়োজন তাদের জন্যে, (কোনো ব্যক্তিকে) গোলামীর (বন্ধন) থেকে মুক্ত করার জন্যে, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিদের (ঋণ মুক্তির) জন্যে, আল্লাহ তা'য়ালার পথে (সংগ্রামী) ও মুসাফিরদের জন্যে (এ সাদাকার অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতে হবে); এটা আল্লাহ তা'য়ালার নির্ধারিত ফরজ, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'য়ালা (সব কিছু) জানেন এবং তিনিই হচ্ছেন বিজ্ঞ কুশলী। (সূরা তাওবা- ৬০)

পবিত্র কোরআনের উল্লেখিত আয়াতে যাকাতের অর্থ- সম্পদ ব্যয়ের যে আটটি খাত বর্ণিত হয়েছে এ আটটি খাতে যাকাতের অর্থ- সম্পদ ব্যয় করা যাবে।

ফকীর ও মিসকীন

যে সব লোকদের ধন- সম্পদ বলতে কিছুই নেই তারাই হলো ফকীর। যে সব লোকদের এমন পরিমাণ ধন- সম্পদ রয়েছে যা দিয়ে তাদের জীবন যাত্রা নির্বাহ করা সম্ভব হয় না, তাদেরকেই মিসকীন বলা হয়। ফকীর ও মিসকীন উভয় শ্রেণীর মানুষই যাকাত লাভের অধিকারী।

ফকীর ও মিসকীন এই উভয় শ্রেণীর লোকদেরকে কেবলমাত্র নগদ অর্থে যাকাত দিতে হবে ইসলামের নির্দেশ এমন নয়। বরং তাদের উপস্থিত চাহিদা পূরণার্থে যাকাত ফাণ্ড থেকে কিছু নগদ অর্থ প্রদান করে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে, ফকীর ও মিসকীনদের বাসগৃহ নির্মাণ, কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়া, যেখানে তারা শ্রম বিনিয়োগ করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারবে।

যাকাতের অর্থ- সম্পদ ব্যয় করে অভাবী লোকদের বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান ও ওষুধের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

নিরাপদ মাতৃত্বের জন্যে গর্ভকালীন চিকিৎসা ও ঝুঁকিমুক্ত ডেলিভারির ব্যবস্থা করা এবং মা ও শিশুর পরিচর্যার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

যেখানে সুপেয় জীবানু মুক্ত পানির অভাব রয়েছে, সেখানে যাকাত ফাণ্ড থেকে সুপেয় ও জীবানু মুক্ত পানির ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

নিরক্ষরতা দূর করার লক্ষ্যে ইসলামী ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় ঘটিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে অভাবী লোকদেরকে ও তাদের সন্তান-সন্ততিদেরকে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

অভাবী পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাপোকরণ সরবরাহ ও শিক্ষাভাতার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

দুর্বল, বৃদ্ধ, ইয়াতিম ও পঙ্গুদের মাসিক ভাতার ব্যবস্থাও যাকাত ফাণ্ড থেকে করা যেতে পারে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও আকস্মিক দুর্ঘটনা কবলিত মানুষদের সাহায্যও যাকাত ফাণ্ড থেকে করা যেতে পারে।

যাকাত বিভাগের কর্মচারীদের বেতন- ভাতা

যাকাত আদায়ে নিয়োজিত কর্মচারী ও বন্টন কর্মচারীদের বেতন ভাতাও যাকাত ফাণ্ড থেকে দেয়া যেতে পারে। যারা যাকাত আদায় করবেন এবং যারা বন্টন কাজে নিয়োজিত থাকবেন, তাদের বেতন ও যাতায়াতসহ অন্যান্য ব্যয় যাকাত ফাণ্ড থেকেই গ্রহণ করা যেতে পারে।

অমুসলিমদের আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে

ইসলাম বিরোধী জনগোষ্ঠীকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে যাকাত ফাণ্ড থেকে নগদ অর্থে হোক বা অন্য কোনো মাধ্যমে ব্যয় করা যেতে পারে। ইসলামী আন্দোলন বিস্তারের লক্ষ্যে, ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে বাধা এলে, মুসলিমদের ওপর অন্যায়- অবিচার অত্যাচার হলে এসব ক্ষেত্রে যদি অর্থ- সম্পদের মাধ্যমে এসব বাধা দূর করা, অত্যাচার বন্ধ করা যায় তাহলেও যাকাত ফাণ্ড থেকে অর্থ- সম্পদ ব্যয় করা যেতে পারে। এক কথায় অমুসলিমদেরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে এবং নওমুসলিমদের সাহাযার্থে যাকাত ফাণ্ড ব্যবহার করা যেতে পারে।

ক্রীতদাসদের স্বাধীন করার ক্ষেত্রে যাকাত ফাণ্ড ব্যবহার

বর্তমান আধুনিক পৃথিবীতে দাসপ্রথা নেই, কিন্তু কোথাও যদি যুদ্ধে মুসলিম সৈন্য বন্দী হয় এবং অর্থ- সম্পদের বিনিময়ে তাদেরকে মুক্ত করা যায় তাহলে যাকাত ফাণ্ড ব্যবহার করা যেতে পারে। একইভাবে অন্যায়ভাবে কেউ যদি বন্দী থাকে তাহলে তাকে কারাগার থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যেও প্রয়োজনে যাকাত ফাণ্ড ব্যবহার করা যেতে পারে।

ঋণগ্রস্ত লোকদের ঋণ মুক্তকরণ

মুসলমানদের মধ্যে যারা দৈনন্দিন জীবন নির্বাহ করতে গিয়ে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে তাহলে তাদেরকে ঋণমুক্ত করার লক্ষ্যে যাকাত ফাণ্ড থেকে অর্থ- সম্পদ প্রদান করা যেতে পারে।

আল্লাহর পথে ব্যয়

আল্লাহর পথে ব্যয় বলতে বুঝায়, ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় নিবোদিত সংগঠনে অর্থ- সম্পদ ব্যয় করা, ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় করা। কারণ দেশ না থাকলে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করার স্থান থাকে না। এ জন্যে দেশ রক্ষা করা সবথেকে বড় জিহাদ। এ লক্ষ্যে অস্ত্র কারখান প্রতিষ্ঠা করা, প্রতিরক্ষার যন্ত্রাংশ ক্রয় করা, সৈন্য বাহিনীর খাতে ব্যয় করা ইত্যাদি। এসব খাতে যাকাতের অর্থ- সম্পদ ব্যয় করা যেতে পারে।

এ ছাড়া যাকাত ফাণ্ড থেকে প্রতি বছর দেশের দরিদ্র শ্রেণীর লোকদেরকে হজ্বেও পাঠানো যেতে পারে। পৃথিবীর যেখানেই মুসলমানরা বিপদ গ্রস্ত হলে তাদের কল্যাণার্থে যাকাতের অর্থ দ্বারা সাহায্য- সহযোগিতা করা যেতে পারে।

মুসাফির ও পথিকদের পাথেয় সরবরাহ করা

দেশী- বিদেশী মুসাফির- নিজ এলাকায় তারা যতো বড় ধনীই হোন না কোনো, যদি মুসাফির অবস্থায় বিপদগ্রস্ত হয় তাহলে তাদেরকে যাকাত ফাণ্ড থেকে সাহায্য করা যেতে পারে। এ ছাড়া পথিকদের কল্যাণার্থে পথের বিভিন্ন স্থানে পান এবং গোসলের পানির ব্যবস্থা, ছাউনীর ব্যবস্থা এমনকি মুসাফির খানার ব্যবস্থাও করা যেতে পারে।

পবিত্র কোরআনে যাকাতের অর্থ- সম্পদ ব্যয়ের যে আটটি খাত নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে, উক্ত আটটি খাতে যে একই সাথে অর্থ ব্যয় করতে হবে এমন কোনো বিধান নেই। বরং পর্যায়ক্রমে প্রয়োজনে এসব খাতে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতে হবে। তবে সর্বপ্রথমে অগ্রাধিকার দিতে হবে দারিদ্র দূরকরণে। কারণ দারিদ্রতা দূর করারই হলো ইসলামে যাকাত ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য।

যারা যাকাতের হকদার নয়

১। নিজ পিতামাতা এবং নিজ সন্তানদের যাকাত দেয়া জায়েয নয়। কারণ পিতামাতা ও সন্তানদের ভরণ-পোষণের দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণ নিজের ওপর অর্পিত হয়েছে।

২। নিজের স্ত্রীকেও যাকাত দেয়া জায়েয নয়। কারণ স্ত্রীর ভরণ-পোষণের যাবতীয় দায়িত্বও স্বামীর ওপর অর্পিত হয়েছে। কিন্তু স্ত্রী যদি নেসাব পরিমাণ সম্পদের অধিকারী হয় আর স্বামী যদি হয় অভাবী, তাহলে স্ত্রী তার স্বামীকে যাকাত দিতে পারে।

৩। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেছেন, হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর স্ত্রী যায়নব (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমার অলঙ্কার রয়েছে, আমি এর থেকে যাকাত আদায় করতে চাই। আমি কি আমার স্বামী ও তাঁর সন্তানদের যাকাত দিতে পারি? নবী করীম (সাঃ) বললেন-

زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ اَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتَ عَلَيْهِمْ-

তোমার স্বামী এবং তোমার পুত্র যাকাতের অধিক হকদার। (বোখারী)

৪। কাফির ও নাস্তিকদের যাকাত দেয়া জায়েয নয়। কারণ হাদীসে বলা হয়েছে, 'তোমাদের ধনীদের কাছ থেকে যাকাত গ্রহণ করা হবে এবং তোমাদের (মুমিনদের) দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করা হবে।'

৫। ধনী ও কর্মক্ষম লোকদের যাকাত দেয়া জায়েয নয়। কারণ নবী করীম (সাঃ) বলেছেন-

لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِىٍّ وَلاَ لِذِىْ مِرَّةٍ سَوِىٍّ-

ধনী ব্যক্তির জন্য যাকাত হালাল নয় এবং কর্মক্ষম, রোগমুক্ত ব্যক্তিকেও (যাকাত দেয়া হালাল নয়) (আবু দাউদ)

হযরত উবাইদুল্লাহ বিন আদী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বিদায় হজ্জের সময় যাকাত বন্টন করছিলেন। এমন সময় কর্মক্ষম দুই ব্যক্তি এসে যাকাত পেতে চাইলো। রাসূল (সাঃ) বললেন, তোমরা চাইলে দেবো। কিন্তু–

لاَ حَظَّ فِيْهَا لِغَنِيِّ وَلاَ قَوِيِّ مُكْتَسِبٍ–

এতে (যাকাতে) ধনীর কোনো অংশ নেই এবং শক্তিশালী ও কর্মক্ষম ব্যক্তিরও (অংশ নেই) (আবু দাউদ, নাসাঈ)

ইমাম আবু হানীফা (রাহঃ) এর মতে শক্তিশালী ব্যক্তি দরিদ্র হলে তাকে যাকাত দেয়া যাবে।

৬। বনী হাশেম জনগোষ্ঠীর লোককে যাকাত দেয়া জায়েয নয়। কারণ তাঁরা হলেন হযরত আলী, হযরত ওয়াকিল, হযরত জাফর, হযরত আব্বাস ও হযরত হারিস (রাঃ) এর পরিবার। আর রাসূল (সাঃ) বলেছেন–

اِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَنْبَغِيْ لاٰلِ مُحَمَّدٍ اِنَّمَا هِيَ اَوْسَاخُ النَّاسِ–(رواه مسلم)

যাকাত জায়েয নয় মুহাম্মাদ (সাঃ) এর পরিবারের জন্য। কারণ এটা মানুষের ময়লা মাত্র।

যাকাত সম্পর্কিত মাসায়েল

(এক) যে ব্যক্তি তার সম্পদের যাকাত আদায় না করে ইন্তেকাল করলো, এ অবস্থায় তার সম্পদ থেকে সর্বপ্রথমে যাকাত আদায় করতে হবে। এরপর সে ঋণগ্রস্ত থাকলে উক্ত আদায় করা হবে। এরপর তার ওয়াজিব অসিয়্যত আদায় করা হবে। তারপর যে সম্পদ থাকবে তা তার ওয়ারিসদের মধ্যে শরিয়াত আনুযায়ী বন্টন করা হবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

فَدَيْنُ اللّٰهِ اَحَقُّ اَنْ يُقْضٰى–

আল্লাহ তা'য়ালা অধিক হকদার যেনো তাঁর ঋণ (ফরজ) আদায় করা হয়। (রাওয়াহুশ শাইখান)

(দুই) যাকাত প্রদানকারীর জন্য দোয়া করা মুস্তাহাব। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُ هُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ–

তাদের সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ করো যাতে তুমি সেগুলোকে পবিত্র ও বরকতময় করতে পারো এর মাধ্যমে। আর তুমি তাদের জন্য দোয়া করো। নিশ্চয়ই তোমার দোয়া তাদের জন্য সান্ত্বনা স্বরূপ। (সূরা তাওবা-১০৩)

হযরত ওয়ায়েল ইবনে হাজর (রাঃ) বলেছেন, এক ব্যক্তি দেখতে সুন্দর এমন একটি উট নিয়ে এলো। নবী করীম (সাঃ) বললেন–

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ فِيْهِ وَفِىْ اِبِلِهٖ–

হে আল্লাহ! তার মধ্যে এবং তার উটের মধ্যে বরকত দাও। (নাসাঈ)

যাকাত ওয়াজিব হয় সম্পদের ওপর

ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালিক (রাহঃ) এর কাছে এবং ইমাম শা'ফী ও ইমাম আহ্‌মাদ (রাহঃ) এর বর্ণনা অনুসারে যাকাত ওয়াজিব হয় সম্পদের ওপর। এ কারণে কারো প্রতি যদি যাকাত ওয়াজিব হয় এবং যাকাত আদায় করার পূর্বে সম্পদ বিনষ্ট হয়, তাহ্‌লে তার ওপর আর যাকাত আদায় করা ওয়াজিব থাকবে না। কারণ যাকাত তো সম্পদের ওপর ওয়াজিব ছিলো, এখন সম্পদই যখন থাকলো না তখন যাকাত আদায়ের প্রশ্নও থাকে না। তবে সম্পদ যদি কিছুটা অবশিষ্ট থাকে আর যদি তা নেসাব পরিমাণ হয় তাহ্‌লে এটুকুর যাকাত আদায় করতে হবে।

ইমাম শাফী ও ইমাম আহমাদ (রাহঃ) এর আরেকটি বর্ণনা হ্‌লো, যাকাত ওয়াজিব হয় সম্পদের অধিকারী লোকটির ওপর। এ জন্যে যাকাত আদায় করার পূর্বে যদি সম্পদ বিনষ্ট হয় তাহ্‌লে সম্পদের অধিকারীর ওপর যাকাত আদায় করা ওয়াজিব হবে।

ইবনে কুদামা (রাহঃ) বলেছেন, সঠিক সিদ্ধান্ত হ্‌লো যাকাত ওয়াজিব হয় সম্পদের ওপর। আর সম্পদের অধিকারী হ্‌লেন উক্ত সম্পদের জিম্মাদার এবং এ কারণেই যাকাত আদায় করা জিম্মাদারের ওপর ওয়াজিব হয়। সুতরাং সম্পদের মালিক যদি তার জিম্মাদারী আদায় করতে কোনো অবহেলা না করে আর এর মধ্যে সম্পদও বিনষ্ট হয়, তাহ্‌লে জিম্মাদারকে বিনষ্ট সম্পদের যাকাত আদায় করতে হবে না। (ফিক্‌হুস্ সুন্নাহ্)

আল্লাহর সম্পদের জিম্মাদার কারা

সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ্ তা'য়ালা। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা যাকে সম্পদ দান করেছেন সেই হ্‌লো সম্পদের জিম্মাদার। আল্লাহ্ তা'য়ালা উক্ত জিম্মাদার বা প্রতিনিধিকে সম্পদের যাকাত আদায় করার আদেশ দিয়েছেন–

وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ–

আল্লাহ্ তা'য়ালা তোমাদেরকে যে সম্পদের প্রতিনিধি (জিম্মাদার) করেছেন, তা থেকে ব্যয় করো (যাকাত দাও) (সূরা হাদীদ)

আল্লাহর সম্পদের প্রতিনিধি তথা জিম্মাদার হ্‌লো দুই শ্রেণীর মানুষ। (এক) সম্পদের ব্যক্তিগত অধিকারীরা। (দুই) ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিরা। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেছেন–

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا

بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ–

আমি যদি তাদেরকে পৃথিবীতে ক্ষমতায় আসীন করি তাখন তারা নামাজ কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে। (সূরা হজ্জ)

ইমাম যাহ্হাক (রাহঃ) বলেছেন, এই আয়াতে তাদের জন্য নির্দেশ রয়েছে যাদেরকে আল্লাহ তা'য়ালা ক্ষমতার মালিক করেছেন। ক্ষমতার মালিককে এসব কাজ আঞ্জাম দেয়া উচিত। (কুরতুবী)

ইবনে আবু নাজিহ্ (রাহঃ) বলেছেন, এই আয়াতে ক্ষমতার মালিক ব্যক্তিদের কাজের বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে। (কুরতুবী)

সাবাহ্ বিন সাওদা আল ফিন্দী (রাহঃ) বলেছেন, আমি হযরত উমার ইবনে আব্দুল আযীয (রাহঃ) কে এক বক্তৃতায় বলতে শুনেছি–

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الاَرْضِ–

তিনি এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন–

اَلاَ اِنَّهَا لَيْسَتْ عَلَى الْوَالِىْ وَلٰكِنَّهَا عَلَى الْوَالِىْ وَالْمَوْلٰى عَلَيْهِ–

সাবধান! এটা (যাকাত) কেবল শাসকের ওপর নয়, বরং এটা শাসক ও শাসিতদের ওপর ওয়াজিব। (ইবনে কাসির)

আর সাইয়্যেদ কুতুব (রাহঃ) তাঁর তাফসীর গ্রন্থ 'ফী যিলাযিল কোরআন' এ উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন–

فَحَقَّقْنَا لَهُمُ النَّصْرُ وَ ثَبَّتْنَا لَهُمُ الاَمْرَ–

আমরা যাদেরকে বিজয় দান করি এবং ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করি।

সুতরাং বুঝা গেলো যে, আল্লাহর সম্পদের প্রতিনিধি এবং জিম্মাদার হলো ক্ষমতার মালিক ব্যক্তিরা এবং সম্পদের অধিকারী ব্যক্তিরা। এদের উভয়ের ওপর যাকাত আদায় করা ওয়াজিব।

ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিরা কারা

(ক) দেশের রাষ্ট্র প্রধান অথবা সরকার প্রধান।

(খ) কোনো সংগঠনের শীর্ষ নেতা।

(গ) কোনো কোম্পানীর শীর্ষ ব্যক্তি বা পরিচালকগণ।

(ঘ) কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের প্রধান বা পরিচালকগণ।

এরা সকলেই যাকাত ভিত্তিক আদেশের অন্তর্ভুক্ত। এ জন্যে সরকার দেশের ধনী নাগরিকদের কাছ থেকে যাকাত সংগ্রহ করবে এবং পরিকল্পনা ভিত্তিক ব্যয়ের খাতসমূহে ব্যয় করবে। ঠিক

একইভাবে কোনো সংগঠন, প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানীর শীর্ষ ব্যক্তি বা পরিচালকগণ যাকাত বের করে ইসলামী সরকারের যাকাত ফাণ্ডে জমা দিবে।

কোনো দরিদ্র ব্যক্তিকে এমন পরিমাণ যাকাত দেয়া হলো এবং তা যদি সেই ব্যক্তি জমা রাখে বা ব্যবসায় বিনিয়োগ করে, বছর শেষে দেখা গেলো জমাকৃত সম্পদ থেকে বা ব্যবসায় থেকে এমন সম্পদ তার রয়েছে যা নেসাব পরিমাণ। তাহলে উক্ত ব্যক্তিকে ঐ সম্পদের যাকাত আদায় করতে হবে। কারণ যাকাত গ্রহণ করার পরে উক্ত ব্যক্তি ঐ সম্পদের মালিক হয়ে যায়। এ জন্যে বছর শেষে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ- সম্পদ নেসাব পরিমাণ হলে তা থেকে যাকাত আদায় করতে হবে।

সম্পদ যতোই বেশী হোক না কেনো, সম্পদের যাকাত আদায় করা হলে তা আর কন্‌জ হয় না। হযরত ইবনে উমার (রাঃ) বলেছেন–

كُلُّ مَا اَدَّيْتَ زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ وَكُلُّ مَالاَ تُؤَدِّىْ زَكَاتَهُ فَهُوَ كَنْزٌ–

যে সকল সম্পদের যাকাত দিয়েছো, তা কন্‌জ নয়। আর যে সকল সম্পদের যাকাত দাও নি, তাই কন্‌জ। (বায়হাকী)

সম্পদ থেকে সর্বোৎকৃষ্ট বা সর্বোনিকৃষ্ট ধরনের কিছু যাকাত হিসেবে গ্রহণ করা হবে না। বরং মধ্যম মানের যা তাই যাকাত হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। নবী করীম (সাঃ) হযরত মায়ায (রাঃ) কে বলেছেন–

اِيَّاكَ وَكَرَائِمُ الاَمْوَالِ–

তুমি উত্তম সম্পদ গ্রহণ করবে না। (আল জামায়াহ্)

যাকাত ও সাদাকার সম্পদ ক্রয় করা জায়েয নয়। হযরত ইবনে উমার (রাঃ) বলেন, হযরত উমার (রাঃ) একটি ঘোড়া আল্লাহর পথে দান করলেন। এরপর দেখলেন, ঘোড়াটি বিক্রির জন্যে রাখা হয়েছে। তিনি ওটি কিনতে চাইলেন এবং বিষয়টি নবী করীম (সাঃ) এর কাছে জানতে চাইলে তিনি বললেন–

لاَ تَبْتَعْهُ وَلاَ تَعُدُ فِىْ صَدَقَتِكَ–

ওটা কিনবে না এবং তোমার সাদাকাতে ফিরে এসো না। (আবু দাউদ, নাসাঈ)

আরেক বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে–

لاَ تَشْتَرْ وَلاَ تَعُدْ فِىْ صَدَقَتِكَ وَاِنْ اَعْطَاكَ بِدِرْهَمٍ فَاِنَّ الْعَائِرَ فِىْ صَدَقَتِه كَالْعَائِرِ فِىْ قَيْئِه– (رواه البخارى)

তুমি ক্রয় করো না এবং তোমার সাদাকাতে ফিরে এসো না যদিও তোমাকে এক দিরহামে দেয়। কারণ সাদাকাতে প্রত্যাবর্তনকারী ব্যক্তি নিজের বমি ভক্ষণকারী ব্যক্তির সমান।

নিজ স্বামী এবং দরিদ্র আত্মীয়-স্বজনদেরকে যাকাত প্রদান।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর স্ত্রী যায়নব বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমার অলঙ্কার রয়েছে, আমি এর যাকাত আদায় করতে চাই। ইবনে মাসউদ মনে করেন, যাকাত তাকে দিলেই আদায় হবে যাবে। নবী করীম (সাঃ) বললেন, ইবনে মাসউদ সত্যই বলেছে–

اَوْجُكِ وَوَلَدُهُ اَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَيْهِمْ–

তোমার স্বামী ও তার ছেলে তোমার সাদাকার অধিক হকদার। (বোখারী)

আর ইমাম মালেক ও ইমাম আবু হানিফা (রাহঃ) এর মতানুসারে স্বামীকে যাকাত দেয়া জায়েয নয়।

উক্ত হাদীসটি হলো নফল সাদাকা সম্পর্কে– ফরজ যাকাত সম্পর্কে নয়।

আর অধিকাংশ ইসলামী চিন্তাবিদদের মতানুসারে আত্মীয়- স্বজনকে যাকাত প্রদান করা উত্তম যদি তারা দরিদ্র হয়। যেমন ভাই, বোন, চাচা, খালু, খালা, মামা, ফুফু ইত্যাদি।

নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

اَلصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِوِى الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ، صِلَةٌ وَصَدَقَةٌ–

মিসকীনকে সাদাকা করলে কেবল সাদাকা হয়, আর আত্মীয়কে সাদাকা দিলে দুটো হয়– রক্ত সম্পর্কিত এবং সাদাকা। (আহ্‌মাদ, নাসাঈ, তিরমিযী)

ইমাম মালিক ও ইমাম আবু হানিফা (রাহঃ) এর মতানুসারে এ হাদীসটিতে নফল সাদাকা সম্পর্কে বলা হয়েছে, ফরজ যাকাত সম্পর্কে নয়।

যাকাতুল ফিৎর

রমজান মাসের রোযা ভঙ্গ করার কারণে যে যাকাত ওয়াজেব হয়, তার নাম হল যাকাতুল ফিৎর বা ফিৎরা। হযরত উমার (রাঃ) বলেছেন–

فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم زَكَاةُ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمَرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالاُنْثى وَالصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ– (متقف عليه)

নবী করীম (সাঃ) ধার্য করেছেন রমজানের রোযা ভঙ্গ করার যাকাত- খেজুর অথবা যব এক ছা' (প্রায় পনে তিন কিলো) দাস হোক কিংবা আযাদ ব্যক্তি হোক, নারী হোক কিংবা পুরুষ হোক, ছোট শিশু হোক বা বড় হোক, সকল মুসলমানের উপর। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

ফিৎরার আদেশ

দ্বিতীয় হিজরীর শাবান মাসে ফিৎরা ওয়াজিব করা হয়। হযরত ইবনে আববাস (রাঃ) বলেছেন–

فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم زَكَاةُ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ، مَنْ اَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُوْلَةٌ وَ مَنْ اَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ–

নবী করীম (সাঃ) ফিৎরা ধার্য করেছেন রোযাদারকে অনর্থক কথা, কাজ এবং অশোভন কাজের পাপ থেকে পাক করার জন্যে এবং মিসকীনদের খাদ্যের জন্যে। যে ব্যক্তি ঈদের নামাযের পূর্বে ফিৎরা আদায় করলো তার ফিৎরা কবুল হলো। আর যে নামাযের পর দিল তার জন্য তা সাদাকা হলো। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ্, দারে কুতনী)

ফিৎরার নেসাব

ইমাম মালেক, ইমাম শাফী এবং ইমাম আহমদ (রাহঃ) এর মতে যদি কোন স্বাধীন মুসলমান ব্যক্তির পরিবারের এক দিন ও এক রাতের খাদ্যের অতিরিক্ত এক ছা' পরিমান খাদ্য থাকে, তাহলে তার উপর ফিৎরা ওয়াজিব হবে। (ছা' হলো পনে তিন কিলোর সমান)

আর ইমাম আবু হানীফা (রাহঃ) এর মতে যদি কোন ব্যক্তির পরিবারের খাদ্যের অতিরিক্ত নেসাব পরিমান সম্পদ থাকে, তাহলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে।

ফিৎরা আদায় করবে নিজের পক্ষ থেকে নিজের স্ত্রী, সন্তান ও কাজের লোকের পক্ষ থেকে এবং যে সব লোক তার দায়িত্বে আছে তাদের পক্ষ থেকে।

ঈদের পূর্বে ফিৎরা প্রদান

ইমাম আবু হানীফা (রাহঃ) এর মতে রমজানের পূর্বে ই ফিৎরা দেয়া জায়েয।

ইমাম শাফী (রাহ) এর মতে রমজান মাসের প্রথম দিকে ফিৎরা দেয়া জায়েয।

ইমাম মালেক ও ইমাম আহমাদ (রাহঃ) এর মতে ঈদের এক কিংবা দুই দিন পূর্বে দেয়া জায়েয।

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) বলেছেন, নবী করীম (সাঃ) আমাদেরকে আদেশ করেছেন, 'আমরা যেন ঈদের নামযের পূর্বে ফিৎরা আদায় করি।'

হযরত নাফে (রাহঃ) বলেছেন, হযরত ইবনে উমার (রাঃ) ঈদের দুই দিন পূর্বে ফিৎরা দিতেন।

ফিৎরা সংগ্রহ করার দায়িত্ব সরকারের

ইসলামী সরকারের যাকাত মন্ত্রণালয় ফিৎরা সংগ্রহ করবে এবং পরিকল্পনা মোতাবেক ফিৎরালব্ধ টাকা দরিদ্রতা দূরীকরনে ব্যয় করবে। নবী করীম (সাঃ) ফিৎরা সংগ্রহ করার জন্য কর্মচারী নিযুক্ত করতেন। তারা ফিৎরা সংগ্রহ করে মসজিদে নববীতে জমা করতেন। নবী করীম (সাঃ) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)কে ফিৎরালব্ধ সম্পদ পাহারা দেয়ার জন্যে নিযুক্ত করতেন।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেছেন। নবী করীম (সাঃ) আমাকে মসজিদে জমা কৃত ফিৎরালব্ধ সম্পদ পাহারা দেয়ার জন্যে নিযুক্ত করলেন। রাতে জনৈক ব্যক্তি খাদ্য চুরি করতে এলো। আমি তাকে ধরে বললাম, 'আমি তাঁকে নবী করীম (সাঃ) এর নিকট পাঠাবো। সে বললো, আমাকে ছেড়ে দিন। আমার সন্তানরা ক্ষুধার্ত তাই আমি বাধ্য হয়ে এসেছি। আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। সকালে নবী (সাঃ) আমকে বললেন হে আবু হুরায়রা!

مَافَعَلَ اَسِيْرُكَ الْبَارِحَةَ– গত রাত্রে তোমার বন্দী কি করেছে?

তিনি বললেন, সে বলেছে তার সন্তানরা ক্ষুধার্ত। তাই সে খাদ্যের জন্য এসেছে। সে আর আসবে না। আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। নবী করীম (সাঃ) বললেন–

اِنَّهُ وَ اللّٰهِ كَذَبَكَ وَسَيَعُوْدُ–

আল্লাহর শপথ! সে মিথ্যা বলেছে এবং সে আবশ্যই আসবে।

পরদিন রাতে সে আবার এলো। আমি তাকে ধরে বললাম, ওকে এবার নবী করীম (সাঃ) এর নিকট পাঠাবো। সে এবারো বললো তার সন্তানরা ক্ষুধার্ত। তাদের খাদ্যের জন্য এসেছে। আমার দয়া হলো এবং আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। সে বলেছে আর আসবে না।

সকালে নবী করীম (সাঃ) বললেন, হে আবু হুরায়রা! তামার বন্দী গত রাতে কি করেছে? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! সে আজো বললো, তার সন্তানরা ক্ষুধার্ত। তাদের খাদ্যের জন্যে এসেছে। সে আর কখনো আসবে না। নবী করীম (সাঃ) বললেন, সে মিথ্যা বলেছে সে অবশ্যই আসবে।

পরদিন রাত্রে সে আবার এলো। আমি তাকে ধরে বললাম, এবার দিয়ে তিনবার হলো। এবার তোমাকে অবশ্যই নবী করীম (সাঃ) এর নিকট পাঠাবো। সে বললো, আমাকে ছেড়ে দিন। আমি এমন কয়েকটি বাক্য আপনাকে শিক্ষা দেব, যা তোমার জন্য উপকারী হবে। আমি বললাম, তা কি? সে বললো, তুমি যখন শুতে যাবে তখন আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে। তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাকে হেফাজত করা হবে এবং ফজর পর্যন্ত শয়তান তোমার নিকটে আসবে না। তখন আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। নবী করীম (সাঃ) বললেন–

اِنَّهُ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوْبٌ– সে অবশ্যই সত্য কথা বলেছে, তবে সে মিথ্যুক।

তুমি কি জান, সে কে? আমি বললাম না- হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! নবী করীম (সাঃ) বললেন, সে হলো শয়তান। (বোখারী)

উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমানিত হয় যে, নবী করীম (সাঃ) ফিৎরা সংগ্রহ করে জমা করতেন। এরপর দারিদ্রতা দূর করার লক্ষে তা ব্যয় করতেন।

ফিৎরার মূল্য প্রদান

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ছা'লবা (রাঃ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সাঃ) এক খুতবায় বলেছেন–

اَدُّوْا عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَ عَبْدٍ صَغِيْرٍ وَكَبِيْرٍ نُصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ اَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ اَوْمِنْ تَمَرٍ–

ফিৎরা আদায় কর প্রত্যেকে স্বাধীন ও দাস এবং ছোট ও বড় সকলের পক্ষ থেকে অর্ধেক ছা' ময়দা অথবা এক ছা' যব কিংবা খেজুর। (আবু দাউদ, দারে কুতনী, তিবরাণী, হাকিম)

উক্ত হাদীসে নবী করীম (সাঃ) বলেছেন যে, ফিৎরা দাও অর্ধেক ছা' ময়দা অথবা এর মূল্য হিসাবে এক ছা' যব বা খেজুর। (এক ছা' সমান প্রায় পৌনে তিন কিলো।)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেছেন, আমরা নবী করীম (সাঃ) এর যুগে খাদ্য, খেজুর, যব এবং যবীব থেকে ফিৎরা এক ছা' দিতাম। যখন হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) হজ্ব অথবা উমরার উদ্দেশ্যে এলেন, তখন তিনি মিম্বারে দাঁড়িয়ে মানুষকে বললেন, আমি মনে করি যে, শাম দেশের ময়দা) অর্ধেক ছা' এক ছা' খেজুরের সমান হবে–

فَاَخَذَ النَّاسُ بِذٰلِكَ– মানুষ এ কথা গ্রহণ করলেন। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

ইবনে হাজার ফাতহুল বারী গ্রন্থে বলেছেন–

اِنَّ الْمُرَادَ بِالنَّاسِ الصَّحَابَةُ فَيَكُوْنُ اِجْمَاعًا–

এখানে (উক্ত হাদীসে) মানুষ (শব্দ) দ্বারা সাহাবায়ে কেরামকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং এ বিষয়ে সাহাবায়ে কেরাম ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

উপরোক্ত দুটি হাদীসই প্রমান করছে যে, ফিৎরার মূল্য প্রদান করা জায়েয।

পক্ষান্তরে ফিৎরার মূল উদ্দেশ্য হলো, দারিদ্রদের খাদ্য দান করা এবং তাদের প্রয়োজন পূর্ণ করা যেন, ঈদের দিন তাদেরকে অন্যের কাছে হাত বাড়াতে না হয়। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

اَغْنُوْهُمْ عَنِ السُّوَالِ– তাদেরকে অন্যের কাছে চাওয়া থেকে গণী (স্বচ্ছল) করে দাও।

আর টাকা হলো উত্তম খাদ্য এবং প্রয়োজন পূর্ণ করার উত্তম মাধ্যম। কোন দরিদ্র ব্যক্তির ঘরে হয়তঃ চাউল বা গম আছে। কিন্তু তার ছেলে-মেয়ের কাপড় নেই। গম বা চাউল দ্বারা তো বাচ্চাদের কাপড়ের প্রয়োজন মিটানো যাবে না। কিন্তু টাকা পেলে সে তার সকল প্রয়োজনই পূর্ণ করতে পারবে। এ জন্য বর্তমান উলামাদের বড় অংশ বলেন যে, টাকা দেয়াই উত্তম।

হযরত উমার, ইবনে উমার ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও ইমাম আবু হানীফা এবং ইমাম বুখারী (রাহঃ) এর মত এটাই।

ফিৎরা বন্টনের খাতসমুহ

কোরআনে বর্ণিত আটটি খাতেই যাকাত ও ফিৎরা বন্টন করা হবে। সকল খাতেই বন্টন করতে হবে এমন কোন কথা নেই। তবে যে কোন তিনটি খাতে দেওয়া উত্তম। কোরআনে বর্ণিত আটটি খাত হলো– ১। ফকীর, ২। মিসকীন, ৩। যাকাত বিভাগের কর্মচারী, ৪। তালিবে কুলুব, ৫। ক্রীতদাস মুক্তি, ৬। ঋণ-মুক্তি, ৭। আল্লাহর পথে ব্যয়, ৮। মুসাফির।

নফল সাদাকা

নফল সাদাকার ফজিলত

আল্লাহ্ তালা বলেছেন–

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلاَ نِيَّةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُوْنَ–

যায়া স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে, তাদের জন্যে রয়েছে সওয়াব স্বীয় প্রভূর কাছে। তাদের জন্য কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। (সূরা বাকারা-২৭৪)

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ، وَاللّٰهُ يُضعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ، وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ–

যারা আল্লাহর পথে স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ একটি বীজের মত, যা থেকে সাতটি শিষ জন্মায়। প্রত্যেকটি শীষে একশ করে দানা থাকে। আল্লাহ্ যাকে চান, তাকে দ্বিগুণ বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ্ অতি দানশীল, সর্বজ্ঞাত। (সূরা বাকারা-২৬১)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

يَقُوْلُ الْعَبْدَ مَالِىْ مَالِىْ وَاِنَّمَلَهُ مِنْ مَالِه ثَلاَثٌ مَا اَكَلَ فَاَفْنى اَوْ لَبِسَ فَاَبْلى اَوْ اَعْطى فَاَقْتَنى مَاسِوى ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَ تَارِكُهُ لِلنَّاسِ– (رواه مسلم)

বান্দা বলে আমার সম্পদ, আমার সম্পদ। মূলতঃ তার সম্পদ তিনটি। যা আহার করলো, তা শেষ হয়ে গেল, যা পরল, তা পুরাতন হয়ে গেল, আর যা আল্লাহর পথে দিল, তা বাকি রইল। আর এ ছাড়া সব কিছু মানুষের জন্য রেখে চলে গেল। হযরত মায়ায বিন জাবাল (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيْئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ–

রোযা হল (শয়তানের উপর বিজয় লাভের) মাধ্যম। আর সাদাকা পাপকে মিটিয়ে দেয় যেমন পানি অগ্নিকে নিভিয়ে দেয়ে। (তিরমিযী)

হযরত আমর বিন আওফ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

اِنَّ صَدَقَةَ الْمُسْلِمِ تَزِيْدُ فِىْ الْعُمُرِ وَتَمْنَعُ مَيْتَةَ السُّوْءِ–

সাদাকা করলে মুসলমানের বয়স বৃদ্ধি হয় এবং কুমরণ হয় না। (তিবরাণী)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন। আল্লাহ বলেছেন–

اَنْفِقْ يَاابْنَ ادَمَ يُنْفَقْ عَلَيْكَ–

হে আদম সন্তান! ব্যয় কর, তোমার উপর ব্যয় করা হবে। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

হযরত ইবনে মাসাউদ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

اَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِه اَحَبُّ اِلَيْهِ مِنْ مَالِه، قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! مَامِنَّا اَحَدٌ اِلاَّ مَالُهُ اَحَبُّ اِلَيْهِ، قَالَ فَاِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ وَمَالَ وَرِثِه مَا تَأَخَّرَ– (رواه البخارى)

তোমাদের মধ্যে কে নিজের সম্পদের চেয়ে তার উত্তরাধিকারীর সম্পদ বেশী পছন্দ করে? তারা বললেন, আমরা সকলেই নিজের সম্পদ বেশী পছন্দ করি। নবী করীম (সাঃ) বললেন, তোমাদের সম্পদ হল, যা তোমরা সাদাকা করেছ। আর যা রইল, তা তো উত্তরাধিকারী সম্পদ।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেছেন। আমি নবী করীম (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ সাত ব্যক্তিকে আরশের ছায়া তলে স্থান দেবেন সেদিন, যেদিন আরশের ছায়া ব্যতিত অন্য কোন ছায়া থাকবে না–

اَلاِمَامُ الْعَادِلُ وَرَجُلٌ نَشَاءَ فِىْ عِبَادَةِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ رَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ وَرَجُلاَنِ تَحَابًّا فِى اللّٰهِ اِجْتَمَعَا عَلَى ذَلِكَ وَ تَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ اِنِّىْ اَخَافُ اللّٰهَ وَ رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَاَخْفَاهَا حَتّٰى لاَ نَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ– (متفق عليه)

ন্যায়-পরায়ণ নেতা, যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদাতে লালিত-পালিত হয়েছে, যার অন্তর মাসজিদের সাথে সর্বদা যুক্ত থাকে, দু ব্যাক্তি- যারা আল্লাহর ওয়াস্তে একে অপরকে ভালোবাসে এবং

তাদের ওঠা-বসা একমাত্র আল্লাহর জন্যে হয়। যাকে উচ্চ বংশের সুন্দরী মহিলা আহবান করছে এবং সে বলছে, 'আমি আল্লাহকে ভয় করি।' যে ব্যক্তি গোপনে সাদাকা করে এবং তার বাম হাত জানে না যে, ডান হাত কি দিচ্ছে। যে একাকী নির্জনে আল্লাহকে স্বরন করে এবং তার চক্ষু দিয়ে পানি ঝরে।(মুত্তাফাকুন আলাইহি)

সাদকা কবুল হওয়ার শর্ত সমুহ

১। সাদাকা খালেছ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে হবে, তাতে দুনিয়ার কোন সার্থ থাকবে না। আল্লাহ বলেছেন–

وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ، وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُوْنَ–

আল্লাহর সন্তুষ্টি ব্যতিত অন্য কোন উদেশ্যে ব্যয় করো না। তোমরা যে অর্থ ব্যয় করবে তার পুরুস্কার পুরোপুরি পেয়ে যাবে। তোমাদের প্রতি কোন অন্যায় করা হবে না। (সূরা বাকারা)

২। যাকে সাদাকা দেয়া হবে, তার সামনে কোন অনুগ্রহ প্রকাশ করতে নেই কিংবা তাকে কোন কষ্ট দিতে নেই। কারন অনুগ্রহ প্রকাশ এবং কষ্ট দেওয়া সাদাকার ছওয়াবকে বিনষ্ট করে দেয়। আল্লাহ তা'লাআ বলেছেন–

يَااَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا لاَتُبْطِلُوْا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالاَذى–

হে মুমিনগণ! অনুগ্রহ প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে তোমাদের সাদাকা সমূহকে বিনষ্ট করো না। (সূরা বাকারা)

হযরত আবু দারদা (রাঃ) নবী করীম (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন–

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌ وَلاَ مَنَّانٌ وَلاَ مُدْمِنُ خَمْرٍ وَلاَ مُكَذِّبٌ بِقَدَرٍ–

জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না মাতাপিতাকে কষ্টদাতা, সাদাকা করে অনুগ্রহ প্রকাশকারী, মদ পরিবেশনকারী এবং তাকদীর কে অস্বীকারকারী। (আহ্‌মাদ, ইবনে মাজাহ্‌)

৩। লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে সাদাকা করা যেন না হয়। কারন, লোক দেখানো তথা রিয়া সাদাকার ছওয়াবকে নষ্ট করে দেয়। আল্লাহ্‌ বলেছেন–

كَالَّذِىْ يُنْفِقُ مَالَه رِئَاءَ النَّاسِ وَلاَيُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الاخِرِ، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، لاَ يَقْدِرُوْنَ عَلى شَئٍ مِّمَّا كَسَبُوْا–

(অনুগ্রহ প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে তোমাদের সাদাকা সমুহ বিনষ্ট করো না।) সেই ব্যক্তির

মত, যে তার সম্পদ লোক-দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে না। তার উদাহরণ হল একটি মসৃণ পাথরের মত, যার উপর কিছু মাটি পড়েছিল। এরপর প্রবল বৃষ্টি বর্ষণ হল এবং একে পরিষ্কার করে দিল। তারা ঐ বস্তুর কোন ছওয়াব পায় না, যা তারা উপার্জন করেছে। (সূরা বাকারা)

হযরত সাদ্দাদ বিন আওফ (রাঃ) থেকে মারফু হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

مَنْ صَلَّى يُرَائِيْ فَقَدْ اَشْرَكَ وَمَنْ صَامَ يُرَائِيْ فَقَدْ اَشْرَكَ وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِيْ فَقَدْ اَشْرَكَ- (رواه احمد)

যে লোক দেখানোর জন্যে নামায পড়ল, সে শির্‌ক করল, যে লোক দেখানোর জন্যে রোযা রাখল, সে শিরক করল এবং যে লোক দেখানোর জন্যে সাদাকা করল, সে শিরক করল।

৪। হালাল সম্পদ থেকে সাদাকা করতে হবে কারণ, হারাম সম্পদ আল্লাহ্ গ্রহণ করেন না।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

مَنْ جَمَعَ مَالاً حَرَامًا ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ اَجْرٌ وَكَانَ اِصْرُهُ عَلَيْهِ-

যে হারাম পন্থায় সম্পদ সঞ্চয় করল, এরপর সাদাকা করল তার কোন ছওয়াব হবে না, বরং তার পাপ হবে। (ইবনে খুযাইমাহ্)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمَرٍ مِنْ كَسَبٍ طَيِّبٍ، وَلاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ اِلاَّ الطَّيِّبَ، وَاِنَّ اللّٰهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ يُرَبِّهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّىْ اَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُوْنُ مِثْلَ الْجَبَلِ-

যে ব্যক্তি হালাল উপার্জন থেকে একটি খেজুর পরিমান সাদাকা করল, আর আল্লাহ তো হালাল ব্যতিত কিছুই কবুল করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ এ সাদাকা তার ডান হাতে গ্রহণ করবেন। এরপর তা তার মালিকের জন্য বৃদ্ধি করতে থাকবেন, যেমন তোমাদের কেউ মহরকে বৃদ্ধি করতে থাকে। এমন কি তা পাহাড়ের সমান হয়ে যাবে। (বোখারী)

৫। উত্তম সম্পদ সাদাকা করতে হবে। কারন, আল্লাহ মন্দ সম্পদ গ্রহণ করেন না। আল্লাহ বলেছেন–

وَلاَ تَيَمَّمُوْا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلاَّ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ-

আর নিকৃষ্ট জিনিষ ব্যয় করতে মনস্ত করো না, যা তোমরা কখনও গ্রহণ করবে না। তবে যদি তোমরা চোখ বন্ধ করে নাও। (সূরা বাকারা)

সাদাকা কোন্ শ্রেণীর মানুষকে দিতে হবে

১। পরহেজগার দেখে সাদাকা করা উত্তম।

নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

لاَ تَصَاحِبْ اِلاَّ مُؤْمِنًا وَلاَ يَأْكُلُ طَعَامَكَ اِلاَّ تَقِىٌّ–

মুমিন ব্যক্তির সাথী হও এবং পরহেজগার ব্যক্তিকেই খাদ্য দাও। (আবু দাউদ)

২। দরিদ্র আত্মীয়-স্বজনকে সাদাকা করা উত্তম।

নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

اَلصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذَوِى الرَّحْمِ اِثْنَتَانِ، صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ–

মিসকীনকে সাদাকা করলে কেবল সাদাকা হয়। আর আত্মীয়কে সাদাকা দিলে দুটি হয়- সাদাকা ও সিলায়ে রেহমী। (তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে খুযাইমাহ্, ইবনে হাব্বান)

৩। যে ব্যক্তি সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক এবং অভাবগ্রস্থ, কিন্তু কারো কাছে হাত পাততে লজ্জা বোধ করে, তাকেই সাদাকা দেওয়া উত্তম।

৪। যে নিজেকে ইসলামী আন্দোলনে সর্বদা নিয়োজিত রাখার দরুন কোন কাজ কর্ম করার সময় পায় না, তাকেই সাদাক করা উচিত। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِى الاَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ، تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمـهُمْ، لاَيَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا–

সাদাকা ঐ সব দরিদ্র লোকের জন্যে, যারা আল্লাহর পথে সংগ্রামে আবদ্ধ হয়ে আছে, জীবীকার সন্ধানে জমীনে ঘোরাফেরা করতে সক্ষম নয়। এ কারণে লোকেরা তাদেরকে অভাব মুক্ত কলে ধারনা করে কারো কাছে হাত না পাতার দরুন। তোমরা তাদেরকে লক্ষণ দ্বারা চিনবে। তারা মানুষের কাছে কাকুতী-মিনতী করে ভিক্ষা চায় না। (সূরা বাকারা)

৫। সাদাকা গোপনে করা ই উত্তম।

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেছেন–

وَ اِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ–

যদি তোমরা সাদাকা গোপন কর এবং দরিদ্রদেরকে দিয়ে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য আরও উত্তম। (সূরা বাকারা)

নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ–

গোপন সাদাকা প্রভূর রাগকে ঠান্ডা করে দেয়। (তিবরাণী আন আবি উমামাহ্)

৬। সুস্থ ও কৃপন ব্যক্তি, যে দরিদ্রতার আশংকা করে, তার সাদাকা সব চেয়ে উত্তম।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেছেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ) এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! কোন সাদাকা উত্তম? নবী করীম (সাঃ) বললেন–

اَنْ تُصَدَّقَ وَاَنْتَ صَحِيْحٌ شَحِيْحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلَ الْغِنى–

তুমি সাদাকা করছো এমন অবস্থায় যে তুমি সুস্থ-কৃপন, দরিদ্রতার ভয় করছো এবং ধনী হওয়ার আশা করছো। (বোখারী)

রোযা অধ্যায়

রোযার সংজ্ঞা

রোযা শব্দের আরবী হল, (الصوم) আল-ছাউম এবং এর অর্থ হল, বিরত থাকা এবং ছেড়ে দেওয়া।

আর শরীয়াতের ভাষায় রোযা হল, আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে ফজর উদয় হওয়া থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিয়ত সহ পানাহার ও স্ত্রী-সহবাস থেকে বিরত থাকা।

ইসলামের প্রথম যুগে রমজানের রোযা

ইসলামের প্রথম দিকে প্রত্যেক মাসে তিন দিন এবং আশুরার রোযা রাখা হত। এরপর দ্বিতীয় হিজরীর সাবান মাসে রমজানের রোযা ফরজ করা হয়।

ইসলামের প্রথম দিকে রমজান মাসে রাতে ঘুমানোর পর আর পানাহার করা বা স্ত্রী সহবাস করার অনুমতি ছিল না।

কায়েছ বিন সুরমা (রাঃ) রমজান মাসে দিনের বেলায় কাজ করেছিল এবং রাতে কিছু না খেয়ে ঘুমিয়ে যায়। অর্ধেক রাত অতিবাহিত হলে সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। সকালে নবী করীম (সাঃ) এর নিকট তা বর্ণনা করা হল।

এদিকে হযরত উমার (রাঃ) রমজান মাসে রাতে ঘুমানোর পর স্ত্রী-সহবাস করে ফেললেন। তিনিও এসে নবী করীম (সাঃ) এর নিকট অভিযোগ পেশ করলেন। তখন আল্লাহ্ তা'য়ালা কোরআনের আয়াত নাযিল করে ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সহবাসের অনুমতি দিলেন।

اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ، عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ، فَالْئٰنَ

بَاشِـرُوْهُنَّ وَابْتَـغُوْا مَـا كَـتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ، وَكُلُوْا وَاشْـرَبُوْا حَـتّٰى يَـتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الاَسْوَدِ مِنَالْفَجْرِ، ثُمَّ اَتِمُّوْا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ-

রোজার রাতে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক। আল্লাহ অবগত আছেন, তোমরা যে আত্ম-প্রতারনা করে ছিলে। তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন এবং তোমাদেরকে অব্যাহতি দিয়েছেন। এখন তোমরা স্ত্রী সহবাস কর এবং যা কিছু আল্লাহ তোমাদের জন্য দান করেছেন, তা তলব (প্রার্থনা) কর। আর পানাহার কর যতক্ষণ না কালো রেখা থেকে শুভ্র রেখা পরিস্কার হয়ে যায়। এরপর রোজা পূর্ণ কর রাত পর্যন্ত। (সূরা বাকারা- ইবনে কাসীর)

রোযার ফজিলত

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন– আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন–

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ ادَمَ لَهُ اِلاَّ الصَّوْمُ فَاِنَّهُ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهِ، وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَـدِهِ لَخَلُوْفُ فَمِ الصَّـائِـمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِـسْكِ، لِلصَّـائِـمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا، اِذَا اَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ وَاِذَا لَقِىَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ-

'আদম-সন্তানের সকল কাজই তার নিজের জন্য- কিন্তু রোযা– এটা একমাত্র আমার জন্যে এবং আমি নিজ হাতে এর প্রতিদান দেই।' সেই সত্ত্বার শপথ যার হতে মুহাম্মাদের প্রাণ! নিশ্চয়ই রোযাদারের মুখের ঘ্রান আল্লাহর নিকট মিছ্‌কে আম্বরের ঘ্রানের চেয়ে উত্তম। রোযাদারের জন্যে রয়েছে দুটি খুশী। তারা ইফতারের সময় খুশী প্রকাশ করে এবং যখন তার প্রভূর সাথে সাক্ষাৎ হবে, তখন তারা আনন্দ প্রকাশ করবে। (বোখারী)

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ ادَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا اِلى سَبْعُمَائَـةِ ضَعْفٍ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى اِلاَّ الصَّوْمُ فَاِنَّهُ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ اَجْلِىْ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، فَرْحَةٌ عِنْدَ فَطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ-

মুসলিম শরীফের বর্ণনায় এসেছে, আদম-সন্তানের সকল আমলই বৃদ্ধি হয় নেকী দশ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি হয়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, কিন্তু রোযা- এটা আমার জন্য এবং আমি নিজের হাতে এর প্রতিদান দেই কারন- সে তার খাহেশ এবং খাদ্য আমার সন্তুষ্টির) জন্যে ত্যাগ করেছে। রোজাদারের জন্যে রয়েছে দুটি খুশী, ইফতারের সময় এবং তার প্রভূর সাথে সাক্ষাতের সময়। (মুসলিম)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন অমর (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

اَلصِّيَامُ وَالْقُرْاٰنُ يعفعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُوْلُ الصِّيَامُ اَىْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهْدَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِىْ فِيْهِ وَ يَقُوْلُ الْقُرْاٰنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِىْ فِيْهِ، فَيَشْفَعَانِ- (رواه احمد بسند صحيح)

রোযা ও কোরআন পরকালে বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোযা বলবে, হে প্রভূ আমি তাকে দিনের বেলায় খাদ্য ও খাহেশ থেকে বিরত রেখেছি। সুতরাং তার সম্পর্কে সুপারিশ করার অনুমতি দিন। আর কোরআন বলবে, আমি তাকে রাতের বেলায় ঘুম থেকে বিরত রেখেছি। সুতরাং আমাকে তার সম্পর্কে সুপারিশ করার অনুমতি দিন। অতঃপর তারা সুপারিশ করবে।

হযরত আবু উমামা (রাঃ) বলেছেন, আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমাকে এমন একটি আমল বলে দিন, যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। নবী করীম (সাঃ) বললেন–

عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَانَّهُ لَامِدْلَ لَهُ– তুমি রোযা রাখবে, এর সমান অন্য কিছু নেই।

আমি আবার বললাম হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমাকে এমন একটি আমল বলে দিন, যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। নবী করীম (সাঃ) বললেন–

عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَانَّهُ لاَ مِدْلَ لَهُ– তুমি রোযা রাখবে- এর সমান অন্য কিছু নেই।

আমি আবার বললোাম, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমাকে এমন একটি আমল বলেদিন, যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। নবী করীম (সাঃ) বললেন–

عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَانَّهُ لاَ مِثْلَ لَهُ–

তুমি রোযা রাখবে- এর সমতুল্য অন্য কিছু নয়। (নাসাঈ, আহ্‌মাদ, হাকিম)

হযরত সহল বিন সা'দ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

اِنَّ فِى الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، يُقَالُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَيْنَ الصَّائِمُوْنَ؟ فَاذَا دَخَلُوْا اخِرَهُمْ اُغْلِقَ ذَلِكَ الْبَابُ– (متفق عليه)

নিশ্চয়ই জান্নাতে একটি দরজা আছে, এর নাম রাইয়ান। পরকালে বলা হবে রোযাদারগণ কোথায়? যখন তারা সবাই প্রবেশ করবে, তখন এ দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

ثَلاَثَةٌ لاَ تُرَدُّ دَعْوَتَهُمْ، اَلصَّائِمُ حِيْنَ يُفْطِرُ وَ الاِمَامُ الْعَادِلُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ يَرْفَعُهَا اللّٰهُ فَوْقَ الْغَمَامِ وَتُفْتَحُ لَهَا اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَيَقُوْلُ الرَّبُّ وَعِزَّتِىْ

وَجَلاَلِىْ لاَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِيْنَ- (رواه احمد والترمذى وابن ماجة)

তিন ব্যক্তির দোয়া ফিরত দেয়া হয় না। রোযাদার- যখন সে ইফতার করে, ন্যায়-পরায়ণ নেতা এবং অত্যাচারিত ব্যক্তির দোয়া। আল্লাহ একে সর্বোচ্চে উঠান এবং আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়। প্রভূ বলেন, আমার সম্মান ও মহানত্বের শপথ! আমি তাকে অবশ্যই সাহায্য করবো, যদিও কিছু দেরীতে হয়।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন-

صُوْمُوْا تَصِحُّوْا- রোযা রাখো, সুস্থ থাকবে। (তিবরাণী)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন-

لِكُلِّ شَىْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ وَالصِّيَامُ نِصْفُ الصَّبْرِ-

প্রত্যেক জিনিষেরই যাকাত আছে। আর শরীরের যাকাত হল রোযা। রোযা হল অর্ধেক সবর। (ইবনে মাজাহ্)

রমজান মাসের গুরুত্ব ও মর্যাদা।

হযরত যাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন-

أُعْطِيَتْ أُمَّتِى فِىْ شَهْرِ رَمْضَانَ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ نَبِىٌّ قَبْلِىْ، اِذَا كَانَ اَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمْضَانَ نَظَرَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اِلَى الصَّائِمِيْنَ، وَ مَنْ نَظَرَ اللّٰهُ اِلَيْهِ لَمْ يُعَذِّبْهُ اَبَدًا، وَالثَّانِيَةُ لَخَلُوْفُ اَفْوَاهِهِمْ تِيْنَ يُمْسُوْنَ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ، وَاَمَّا الثَّالِثَةُ فَاِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يَسْتَغْفِرُ لَهُمْ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَاَمَّا الرَّابِعَةُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ جَنَّتَهُ فَيَقُوْلُ لَهَا اسْتَعِدِّىْ وَتَزَيِّنِىْ لِعِبَادِىْ اَوْشَكَ اَنْ يَسْتَرِيْحُوْا مِنْ تَعَبِ الدُّنْيَا اِلَى دَارِىْ وَكَرَامَتِىْ، وَاَمَّا الْخَامِسَةُ فَاِنَّهُ اِذَا كَانَ اٰخِرُ لَيْلَةٍ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُمْ جَمِيْعًا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، أَهِىَ لَيْلَةُ الْقَدَرِ، فَقَالَ لاَ، اَلَمْ تَرَ اِلَى الْعُمَّالِ يَعْمَلُوْنَ فَاِذَا فَرِغُوْا مِنْ اَعْمَالِهِمْ وَفُّوْا اُجُوْرَهُمْ- (رواه البيهقى واحمد)

রমযান মাসে আমার উম্মাতকে পাঁচটি জিনিষ দেওয়া হয় যা আমার পূর্বে কোন নবীকে দেওয়া হয়নি।

(১) রমযানের প্রথম রাতে আল্লাহ্ তা'য়ালা রোযাদারদের দিকে দৃষ্টি দেন। আর আল্লাহ্ যার দিকে দৃষ্টি দেন তাকে কখনও শাস্তি দেন না।

(২) সন্ধ্যার সময় রোযাদারদের মুখের ঘ্রান আল্লাহর নিকট মিছ্কের ঘ্রানের চেয়ে উত্তম।

(৩) ফিরিশ্‌তাগণ (রমজানে) দিন-রাত রোযাদারদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

(৪) আল্লাহ তা'য়ালা জান্নাতকে নির্দেশ দেন এবং বলেন যে, তুমি আমার বান্দার জন্য প্রস্তুত থাকো এবং সাজ-সজ্জা করো।

(৫) যখন রমযানের শেষ রাত হয়, তখন আল্লাহ্ সকল রোযাদারকে ক্ষমা করে দেন। এক ব্যক্তি বললো, এটা কি লাইলাতুল কদর? নবী করীম (সাঃ) বললেন, না। তুমি কি দেখনি যে, কাজ শেষ হলে শ্রমিকদেরকে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। (বায়হাকী, আহ্‌মাদ)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, তিনি নবী করীম (সাঃ) থেকে বর্ণনা করে বলেছেন–

مَنْ صَامَ رَمْضَانَ اِيْمَانًا وَاِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ رَمْضَانَ اِيْمَانًا وَاحْتِسَبًا غُفِرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ–

যে ব্যক্তি রমজান মাসে ঈমানসহ্ সওয়াবের উদ্দেশ্যে রোযা রাখল, তার অতীতের সকল পাপ ক্ষমা করা হল। আর যে ব্যক্তি রমজান মাসে ঈমানসহ্ সওয়াবের উদ্দেশ্যে নামাজ আদায় করলো তার অতীতের সকল পাপ ক্ষমা করা হল। আর যে ব্যক্তি লাইলাতুল কদরে নামায পড়ল, তার অতীতের সকল পাপ মুছে ফেলা হল। (বোখারী, মুসলিম, নাসাঈ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ্)

হযরত সালমান ফার্সী (রাঃ) বলেছেন, নবী করীম (সাঃ) শা'বান মাসের শেষ দিন খুৎবা দিলেন এবং বললেন–

يَااَيُّهَا النَّاسُ قَدْ اَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيْمٌ مُبَارَكٌ، شَهْرٌ فِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ، شَهْرٌ جَعَلَ اللّٰهُ صِيَامَهُ فَرِيْضَةً وَقِيَامَ لَيْلَةٍ تَطَوَّعًا، مَنْ تَقَرَّبَ فِيْهِ بِخَصْلَةٍ مِنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ اَدَّى فَرِيْضَةً فِيْمَا سِوَاهُ، وَمَنْ اَدَّى فَرِيْضَةً فِيْهِ كَمَنْ اَدَّى سَبْعِيْنَ فَرِيْضَةً فِيْمَا سِوَاهُ، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرُ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةَ، وَهُوَ شَهْرٌ اَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَ اَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَاخِرُهُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ، وَاسْتَكْثِرُوْا فِيْهِ اَرْبَعَ خِصَالٍ، خَصْلَتَيْنِ تَرْضَوْنَ بِهِمَا رَبَّكُمْ وَ خَصْلَتَيْنِ

لاَ غِنَاءَ بِكُمْ عَنْهُمَا، فَاَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تَرْضَوْنَ بِهِمَا رَبَّكُمْ، شَهَادَةُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَتَسْتَغْفِرُوْنَهُ وَاَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ لاَغِنَاءَ بِكُمْ عَنْهُمَا فَتَسْأَلُوْنَ اللّٰهَ الْجَنَّةَ وَتَعُوْذُوْنَهُ عَنِ النَّارِ، وَمَنْ سَقى صَائِمًا سَقَاهُ اللّٰهُ مِنْ حَوْضِيْ شَرْبَةً لاَ يَظْمَاءُ حَتّٰى يَدْخُلُ الْجَنَّةَ–

হে মানব সমাজ! এক মহান বরকতময় মাস তোমাদের জন্যে আসছে। সেই মাসে একটি রাত আছে- যা হাজার রাতের চেয়ে উত্তম। সেই মাসে আল্লাহ তা'য়ালা রোযা ফরয করেছেন এবং রাতের নামাজকে নফল করে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি এই মাসে কোনো ভালো কাজ করল, সে যেন একটি ফরয আদায় করল। আর যে ব্যক্তি এ মাসে একটি ফরজ আদায় করলো, সে যেন সত্তরটি ফরয আদায় করলো। এটা সবরের মাস এবং সবরের ফল হল জান্নাত। এ মাসের প্রথম ভাগ হল রহমত, মধ্যম ভাগ হল ক্ষমা এবং শেষ ভাগ হল জাহান্নাম থেকে মুক্তি। অতঃএব এ মাসে বেশী করে চারটি কাজ করবে।

প্রথম দুটি দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হয় এবং দ্বিতীয় দুটি হল নিজের জন্যে।

প্রথম দুটি হল, (ক) সাক্ষ্যদান যে, আল্লাহ ব্যতিত অন্য কোন মাবুদ নেই (খ) আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা।

আর দ্বিতীয় দুটি হল, আল্লাহর নিকট জান্নাত প্রার্থনা করা এবং জাহান্নাম থেকে পানাহ চাওয়া।

যে ব্যক্তি কোন রোযাদার ব্যক্তিকে পানি পান করালো, আল্লাহ তাকে আমার হাউজ থেকে পানি পান করাবেন। আর যে আমার হউজ থেকে পানি পান করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করা পর্যন্ত আর পিপার্সিত হবে না। (বায়হাকী, ইবনে খুযাইমাহ্, ইবনে হাব্বান)

হযরত উবাদা বিন ছামিত (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

اَتَاكُمْ شَهْرُ بَرَكَةٍ يَغْشَاكُمُ اللّٰهُ فِيْهِ يَنْزِلُ الرَّحْمَةُ فِيْهِ وَيَسْتَجِيْبُ فِيْهِ الدُّعَاءُ وَ يُبَاهِيْ بِكُمُ الْمَلاَئِكَةَ فَاَدُوْا اللّٰهَ مِنْ اَنْفُسِكُمْ خَيْرًا، فَاِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِيْهِ رَحْمَةَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ–

তোমাদের নিকট বরকতময় মাস আসছে। এই মাসে আল্লাহর রহমত তোমাদেরকে আবৃত করে রাখবে। এই মাসে আল্লাহ দোয়া কবুল করেন এবং ফিরিশতাদের কাছে তোমাদেরকে নিয়ে গর্ব করেন। অতএব তোমরা নিজের পক্ষ থেকে উত্তম কাজ করে আল্লাহকে দেখাও। দূর্ভাগ্যবান সেই ব্যক্তি, যে এই মাসে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত থাকবে। (তিবরাণী)

রমজান মাসে রোযার আদেশ

রমজান মাসে রোযা রাখা ফরয। আল্লাহ্ তালা বলেছেন–

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ–

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে। যেমন ফরয করা হয়ে ছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর যেন, তোমরা পরহেজগারী অর্জন করতে পার। (সূরা বাকারা)

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

بُنِيَ الاِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةُ اَنْ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَ اِقَامُ الصَّلاَةِ وَاِيْتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمْضَانَ وَحَجُّ الْبَيْتِ–

ইসলামের স্তম্ভ হল পাঁচটি। সাক্ষ্য দান করা যে আল্লাহ্ ব্যতিত অন্য কোন মাবুদ নেই এবং হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর রাসূল। আর নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, রমজান মাসে রোযা রাখা এবং হজ্ব করা। (বোখারী, মুসলিম)

হযরত ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

عُرى الاِسْلاَمِ وَقَوَعِدُ الدِّيْنِ ثَلاَثَةٌ، عَلَيْهِنَّ اُسِىَ الاِسْلاَمِ، مَنْ تَرَكَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ فَهُوَ بِهَا كَافِرٌ حَلاَلُ الدَّمِ، شَهَادَةُ اَنْ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَالصَّلاَةُ الْمَكْتُوْبَةُ وَ صَوْمُ رَمْضَانَ–

ইসলামের মূল এবং দ্বীনের ভিত্তি হল তিনটি জিনিষ। এ গুলোর উপরই ইসলামের বুনিয়াদ। যে ব্যক্তি এগুলো থেকে কোন একটি ছেড়ে দিল সে কাফির হয়ে গেল। সাক্ষ্য দান করা যে, আল্লাহ ব্যতিত অন্য কোনো মাবুদ নেই, ফরজ নামাজসমূহ এবং রমজানের রোযা। (আবু ইয়ালা, দাইলামী)

উম্মাতে মুহাম্মাদীর ইজমা হল, রমজান মাসে রোযা ফরয। রমজানের রোযা ইসলামের রুকুন। রোযা অস্বীকারকারী মূর্তাদ ও কাফির।

রোযার প্রকার

রোযা ছয় প্রকারঃ- ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব, হারাম ও মাকরূহ।

১। **ফরয রোযাঃ** রমজান মাসে রোযা রাখা ফরয।

২। **ওয়াজিব রোযাঃ** কাফ্‌ফারা এবং মান্নাতের রোযা রাখা ওয়াজিব।

৩। **সুন্নাত রোযাঃ** আশুরার রোযা রাখা সুন্নাত। হযরত আবু কাতাদাহ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) কে আশুরার রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি বললেন–

يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ– (رواه مسلم) বিগত এক বৎসরের গোনাহ মা,ফ করা হবে।

৪। **মুস্তাহাব রোযাঃ** যেমন শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযা রাখা।

হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

مَنْ صَامَ رَمْضَانَ ثُمَّ اَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ –

যে ব্যক্তি রমযান মাস রোযা রাখল, অতঃপর সাওয়াল মাসে ছয়টি রোযা রাখল, সে যেন সমস্ত বৎসরই রোযা রাখল। (মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ)

৫। **হারাম রোযাঃ** যেমন দুই ঈদের দিন রোযা রাখা হারাম।

হযরত আবু সাইদ খুদরী (রাঃ) বলেন–

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهى عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ– (متفق عليه)

নবী করীম (সাঃ) দু দিন রোযা রাখা নিষেধ করেছেন- ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা।

৬। **মাকরূহ রোযাঃ** যেমন আরাফার মাঠে রোযা রাখা।

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন–

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ–

নবী করীম (সঃ) আরাফার মাঠে আরফার রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। (আবু দাউদ, নাসাঈ)

রমজানের চাঁদ দেখা

রমজান মাস প্রমানিত হয় দুইভাবে। যেমন (ক) এক জন ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তির চাঁদ দেখার মাধ্যমে।

(খ) শা'বান মাস ত্রিশ দিন পূর্ণ হলে। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِه وَافْطُرُوْا لِرُؤْيَتِه، فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِيْنَ يَوْمًا– (متفق عليه)

রোযা রাখো চাঁদ দেখে এবং ইফ্‌তার করো চাঁদ দেখে। যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয় তবে শাবান মাস ত্রিশ দিন পূর্ণ কর। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

ইমাম তিরমিযী (রাহঃ) বলেছেন, উক্ত হাদীসের উপর অধিকাংশ উলামাদের আমল রয়েছে। ইমাম শাফী, ইমাম আহমাদ এবং ইমাম ইবনে মুবারক (রাহঃ) এর রায় এটাই। ইমাম নববী (রাহঃ) বলেছেন, এটাই সঠিক।

আর শাওয়ালের চাঁদ (ঈদের চাঁদ) প্রমানিত হয় (ক) রমজান মাস ত্রিশ দিন পূর্ণ হলে, (খ) দুজন সত্যনিষ্ট ব্যক্তির চাঁদ দেখার মাধ্যমে। একজনের দেখা যথেষ্ট নয়।

আর ইবনুল মুনযির ও আবু ছাওর এর মতামত হলো, সত্যনিষ্ট এক ব্যক্তি ঈদের চাঁদ দেখলে তা গ্রহন করা হবে।

চন্দ্রোদয়ের পার্থক্য

ذَهَبَ الْجَمْهُوْرُ اِلى اَنَّهُ لاَعِبْرَةَ بِاخْتِلاَفِ الْمُطَالِعِ فَمَتَى رَأَى الْهِلاَلَ اَهْلُ بَلَدٍ وَجَبَ الصَّوْمُ عَلَى جَمِيْعِ الْبِلاَدِ لِقَوْلِ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، صُوْمُوا لِرُؤْيَتِهِ وَافْطَرُوْا لِرُؤْيَتِهِ، وَهُوَ خِطَابٌ لِجَمِيْعِ الاُمَّةِ، فَمَنْ رَاَهُ فِىْ اَىِّ مَكَانٍ كَانَ ذَلِكَ رُؤْيَةً لَهُمْ جَمِيْعًا-

অধিকাংশ ইমামগণের রায় হল, চন্দ্র উদয়ের পার্থক্য ধর্তব্য নয়। যদি কোন একটি দেশে চাঁদ দেখা হয়, তবে সকল দেশের মুসলমানদের উপর রোযা ওয়াজিব হবে। নবী করীম (সঃ) বলেছেন, 'চাঁদ দেখে রোযা রাখ এবং চাঁদ দেখে ইফ্‌তার করা।' এ কথা সকল উম্মাতের জন্য প্রযোজ্য। এ জন্যে যে কোন স্থানে কোন এক ব্যক্তির চাঁদ দেখা হবে সকলেরই দেখা।

اِذَا ثَبَتَ رُؤْيَةُ الْهِلاَلِ بِقُطْرٍ مِنَ الاَقْطَارِ وَجَبَ الصَّوْمُ عَلَى سَائِرِ الاَقْطَارِ، لاَ فَرَقَ بَيْنَ الْقَرِيْبِ مِنْ جِهَةِ الشُّبُوْتِ وَالْبَعِيْدِ، اِذَا بَلَغَهُمْ عَنْ طَرِيْقِ مُوْجِبِ الصَّوْمِ فَلاَ عِبْرَةَ بِاخْتِلاَفِ مَطْلَعِ الْهِلاَلِ مَطْلَقًا عِنْدَ ثَلاَثَةٍ مِنَ الاَئِمَّةِ (امام مالك و امام ابو حنيفة و امام احمد بن حنبل، ميذاهب الاربعة)

যদি পৃথিবীর কোন একটি অংশে চাঁদ দেখা প্রমানিত হয়, তবে সমগ্র পৃথিবীতেই রোযা রাখা ওয়াজিব হবে। নির্ভরযোগ্য সূত্রে যদি খবর পৌছে, তবে নিকট ও দূরের মধ্যে কোন পার্থক্য গ্রহণযোগ্য নয়। নির্ভর যোগ্য সুত্রে যদি সংবাদ পৌছে তাহলে চন্দ্র উদয়ের পার্থক্য গ্রহণযোগ্য হবে না। এ রায় হল, ইমাম মালেক, ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আহমাদ (রাহঃ) এর।

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন-

صَوْمُكُمْ يَوْمَ تَصُوْمُوْنَ وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تَفْطِرُوْنَ وَاَضْحَاكُمْ يَوْمَ ضِحُّوْنَ–

তোমাদের রোযা সেই দিন, যে দিন তোমরা সকলে রোযা রাখবে এবং তোমাদের ঈদ সেই দিন, যে দিন সকলে রোযা ভঙ্গ করবে (ঈদ করবে)। আর তোমাদের কুরবানী হবে সেই দিন, যে দিন তোমরা সকলেই কুরবানী করবে। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ্, তিরমিযী)

হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

اَلْفِطْرُ يَوْمَ يَفْطِرُ النَّاسُ وَالاَضْحى يَوْمَ يُضَحِّى النَّاسُ–

ঈদুল ফিতর সেই দিন, যে দিন মানুষ রোযা ভঙ্গ করবে। আর ঈদুল আজহা সেই দিন, যে দিন সকল মানুষ কুরবানী করবে। ((তিরমিযী)

উক্ত হাদীসদ্বয় দ্বারা প্রমানিত হচ্ছে যে, রোযা রাখা, ঈদ করা এবং কুরবানী করা সমগ্র বিশ্বের মুসলমানগণ এক সাথে একই দিনে সম্পাদন করবে এবং এতে বিশ্ব মুসলিমের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

আর হযরত কুরাইব (রাঃ) বলেছেন, আমি সিরিয়া থেকে মদিনায় এলাম। ইবনে আব্বাস (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন চাঁদ কবে দেখছো। আমি বললাম জুম্মার রাতে। তিনি বললেন, আমরা শনিবার রাতে চাঁদ দেখেছি। আমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখব। আর না দেখলে ত্রিশ দিন পূর্ণ করব। আমি বললাম, হযরত মুয়াবিয়ার চাঁদ দেখা কি যথেষ্ট নয়? তিনি বললেন, না। এমনটিই নবী করীম (সাঃ) আদেশ করেছেন। (তিরমিযী, আহ্মাদ, মুসলিম)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর হাদীসের জবাব

(ক) উক্ত হাদীসের বর্ণনাকারী কুরাইব একা। তাই ইবনে আব্বাস (রাঃ) এক ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করেননি। কারন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

وَاِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ مُسْلِمَانِ فَصُوْمُوْا وَافْطُرُوْا–

যদি দুজন মুসলমান সাক্ষ্য দেয়, তাহলে রোযা রাখ এবং ইফ্তার কর। (নাসাঈ, আহ্মাদ)

(খ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর এ কথাটি উপরে বর্ণিত হযরত আবু হুরায়রা এবং হযরত আয়িশা (রাঃ) এর হাদীসের বিপরীত। দুই হাদীসেই নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, রোযা, ঈদ এবং কুরবানী সমগ্র বিশ্বের মুসলমানগণ একই দিনে করবে।

ইমাম কুরতুবী (রাহঃ) বলেছেন, আমাদের প্রবীনগণ মনে করতেন, যদি কোন স্থানে চাঁদ দেখা প্রমানিত হয় এবং দুজন সাক্ষীর মাধ্যমে তা অন্যত্র পাঠানো হয়, তাহলে পৃথিবীর সকল মুসলমানের উপর রোযা রাখা ওয়াজিব হবে। (ফতহুল বারী)

ইমাম আবু হানীফা (রাঃ) এর রায় হল, চাঁদ দেখার সংবাদ দুজন বিশ্বস্ত ব্যক্তির মাধ্যমে অন্যত্র যদি পাঠানো হয়, তাহলে সকলের উপর রোযা রাখা ওয়াজিব হবে।

لِاَنَّ الْبِلاَدَ فِىْ حَقّهِ كَالْبَلَدِ الْوَاحِدِ اِذْ حُكْمُهُ نَافِزٌ فِى الْجَمِيعِ-

কারন সমগ্র পৃথিবীর দেশসমূহ মূলতঃ একই রাষ্ট্র। কাজেই সকলের উপর একই হুকুম কার্যকরী হবে। (ফতহুল বারী)

বর্তমান আধুনিক বিশ্ব একই দেশ, পৃথিবীর কোথায় কি হচ্ছে তা ঘরে বসে দেখা যায়। জ্বিল হজ্বের দশ তারিখ মসজিদে হারামে ঈদের নামায হচ্ছে এবং মিনাতে কুরবানী করা হচ্ছে, তা উপমহাদেশের ঘরে বসে টেলিভিশনে দেখা যাচ্ছে। ঈদের দিন রোযা রাখা হারাম। অথচ ঐ দিন উপমহাদেশের মানুষ আরাফার রোযা রাখে। আরাফার মাঠ তো একটিই। আর আরাফায় অবস্থান তো আগের দিন জিল হজ্বের নয় তারিখ শেষ হয়ে গেল, তাহলে পরদিন কোন আরফার রোযা রাখা হয়? উপমহাদেশে তো কোন আরাফার মাঠ নেই। কেউ যদি বলে যে, তাদের চাঁদ দেখা মত তারা আরাফার রোযা রাখছে। কিন্তু তাদের হিসাব তো বাস্তবের সাথে কোন মিল হচ্ছে না। অধিকন্তু ইমাম আবু হানীফা (রাহঃ) সহ অধিকাংশের মত হল চন্দ্র উদয়ের পার্থক্য ধর্তব্য নয়।

আল্লাহ তা'য়ালা মক্কা নগরীকে পছন্দ করেছেন। কাবা গৃহ, মিনা ও আরাফা সবই সেখানে অবস্থিত। পৃথিবীর মানুষ সেখানে আসেন হজ্ব আদায় করতে। মক্কার চাঁদ দেখা অনুযায়ী হাজীগণ ঈদ করেন ও কুরবানী করেন এবং রমজানে উমরা আদায় কারীরা ঈদুল ফিতর আদায় করেন, তাহলে মক্কার চাঁদ দেখা অনুযায়ী রোযা রাখতে এবং ঈদ করতে আপত্তি থাকবে কেন?

সন্দেহের দিন রোযা রাখা

যদি শা'বান মাসের ২৯ তারিখ আস্‌মান পরিস্কার না থাকার দরুন চাঁদ দেখা না যায়, তাহলে শা'বানের ত্রিশ তারিখ হবে সন্দেহের দিন। ঐ দিন রোযা রাখা মাকরূহ।

হযরত আম্মার বিন ইয়াসির (রাঃ) বলেছেন-

مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الذِيْ يُشَكُّ فِيْهِ فَقَدْ عَصَى اَبَا الْقَاسِمِ مُحَمَّدًا-

যে ব্যক্তি সন্দেহের দিন রোযা রাখল, সে আবুল কাশিম মুহাম্মাদ (সাঃ) এর নাফরমানী করল। (বোখারী, তিরমিযী)

ঐ দিন দ্বিপ্রহর পর্যন্ত পানাহার থেকে বিরত থাকবে। অতঃপর চাঁদ দেখার কোন খবর পাওয়া না গেলে ইফতার করবে।

আর যদি দিনের কোন এক মূহুর্তে চাঁদ দেখার সংবাদ আসে, তাহলে সংবাদ পাওয়া মাত্র পানাহার থেকে বিরত থাকবে। অতঃপর এর কাজা আদায় করবে।

আর যদি চাঁদ দেখার সংবাদ পাওয়া সত্ত্বেও পানাহার থেকে বিরত না থাকে, তাহলে কাজা ও কাফ্‌ফারা দুটিই ওয়াজিব হবে।

রোযার শর্ত সমূহ

১। **ইসলামঃ** রোযা ওয়াজিব হওয়ার জন্য মুসলমান হওয়া শর্ত। কাজেই অমুসলমানের উপর রোযা ওয়াজিব নয়।

২। **প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়াঃ** রোযা ওয়াজিব হওয়ার জন্য প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া শর্ত। এ কারণে অপ্রাপ্ত বয়স্কদের উপর রোযা ওয়াজিব নয়।

হযরত রুবাইয়ী বিনতে মুয়াওয়ীজ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) আশুরার দিন ভোরে আনসারদের গ্রামে লোক পাঠিয়ে জানিয়ে দিলেন, যে ব্যক্তি রোযা রেখেছে সে পূর্ণ করবে। আর যে রোযা রাখেনি সে বাকি দিন রোযা থাকবে। আমরা রোযা রাখলাম এবং আমাদের শিশুদেরকেও রোযা রাখালাম, তাদেরকে খেলনা দিতাম। এভাবে আমরা ইফতার পর্যন্ত করতাম। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমানিত হয় যে, যদিও শিশুর উপর রোযা ওয়াজিব নয়, কিন্তু তাদেরকে অভ্যাস করানো উচিত।

৩। **বুদ্ধি হওয়াঃ** অতএব নির্বোধ ও পাগলের উপর রোযা ওয়াজিব নয়। হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

رُفِعَ الْقَلَمُ مَنْ ثَلاَثَةٍ، عَنِ الصَّبِيِّ حَتّٰى يَبْلُغَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتّٰى يَسْتَيْقَظَ وَ عَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتّٰى يَفِيْقَ– (رواه الترمذى و احمد)

তিন ব্যক্তির উপর থেকে বাধ্য-বাধ্যকতা (কলম) উঠানো হয়েছে। শিশু বালেগ হওয়া পর্যন্ত, ঘুমন্ত ব্যক্তি জাগ্রত হওয়া পর্যন্ত এবং পাগল ব্যক্তি তার জ্ঞান আসা পর্যন্ত।

৪। **হায়েজ ও নেফাছে থেকে পবিত্র হওয়াঃ** হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেছেন, আমাদের হায়েজ ও নেফাজ হত। নবী করীম (সাঃ) আমাদেরকে রোযার কাজা করার নির্দেশ দিতেন। নামাযের জন্য নয়। আল জামায়া'হ্)

৫। **ইকামাঃ** রোযার জন্য মুকীম হওয়া শর্ত। তাই মুসাফিরের উপর রোযা ওয়াজিব নয়। তবে তার জন্য রোযা রাখা ভাল যদি সম্ভব হয়।

وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ–

যদি তোমরা রোযা রাখ, তবে তা হবে তোমাদের জন্য উত্তম।

৬। **সুস্থতাঃ** সুস্থ ব্যক্তির উপরই রোযা ওয়াজিব। অসুস্থ ব্যক্তির উপর রোযা ওয়াজিব নয়। আল্লাহ তালা বলেছেন–

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ–

তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ হয় অথবা সফরে থাকে, সে অন্য সময় তা পূর্ণ করবে। (সূরা বাকারা)

রোযার রুকুন

রোযার রুকুন দুটিঃ

১। ফজর উদয় হওয়া থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোযা ভঙ্গকারী কাজ সমূহ থেকে বিরত থাকা। আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন–

ثُمَّ اَتِمُّوْا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ– অতঃপর রাত পর্যন্ত রোযা রাখ। (সূরা বাকারা)

২। নিয়াত করা ঃ- নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

اِنَّمَا الاَعْمَالُ بِالنِّيَاتُ– আমল সহীহ হয় নিয়াত দ্বারা। (বোখারী)

নিয়াতের স্থান হল অন্তর। তা মুখে উচ্চারণ করলেও চলে। রমজান মাসে ফজর উদয়ের পূর্বে নিয়ত করা জরুরী।

হযরত হাফসা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

مَنْ لَمْ يَجْمَعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجَرَ فَلاَ صِيَامَ لَهُ–

যে ফজরের পূর্বে নিয়ত করল না, তার রোযা হল না। (আহ্‌মাদ, আসহাবুস সুনান, ইবনে হাব্বান)

যে সেহরী খেল তার নিয়ত হয়ে গেল। আর নফল রোযার নিয়ত দিনের বেলায় করলেই হয়।

হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেছেন, এক দিন নবী করীম (সাঃ) আমার ঘরে প্রবেশ করে বললেন–

هَلْ عِنْدَكِ شَيئٌ–

তোমার নিকট কি কিছু আছে? আমি বললাম, না। তখন নবী করীম (সাঃ) বললেন–

فَاِنِّى صَائِمٌ– তা হলে আমি রোযা রাখলাম। (মুসলিম, আবু দাউদ)

রোযা ভঙ্গকারী কাজসমূহ।

যা দ্বারা ক্বাজা ও কাফ্‌ফার ওয়াজিব হয়।

(ক) অধিকাংশের মতানুসারে জেনে বুঝে ইচ্ছা করে রমজান মাসে দিনের বেলায় স্ত্রী-সহবাস করলে ক্বাজা ও কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হয়।

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রমজান মাসে নবী করীম (সাঃ) এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমি ধ্বংশ হয়ে গেছি। নবী করীম (সাঃ) বললেন, তোমাকে কি জিনিষ ধ্বংশ করল? সে বললো, আমি রমজানে দিনের বেলায় স্ত্রী সহবাস করেছি। নবী করীম (সাঃ) বললেন, তুমি কি দাসি আযাদ করতে পারবে? সে বললো, না। নবী করীম (সাঃ) বললেন, তুমি কি ষাটজন মিসকীনকে খাদ্য দিতে পারবে? সে বললো, না।

অতঃপর নবী করীম (সাঃ) বললেন, তুমি বসো। এরপর নবী করীম (সাঃ) এর নিকট এক ঝুড়ি খেজুর এলো। তিনি বললেন–

تُصَدَّقْ بِهٰذَا এটা সাদাকা করে দাও।

সে বললো, আমার চেয়ে বেশী ফকীরকে কি দিব? হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! মদিনার মধ্যে আমার চেয়ে বেশী ফকীর আর কেউ নেই।

فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى بَدَتْ تَوَاجِزُهُ–

নবী করীম (সাঃ) হাসলেন, এমন কি তাঁর দন্ত মোবারক বিকশিত হলো। তিনি বললেন–

اِذْ هَبْ فَاَطْعِمْهُ اَهْلَكَ– যাও, এগুলো তোমার পরিবারকে খেতে দাও। (আল জামায়া'হ)

অধিকাংশের মতানুসারে স্বামী-স্ত্রী দুই জনের উপর কাজা ও কাফ্‌ফারা ওয়াজিব যদি তারা জেনে বুঝে ইচ্ছা করে সহবাস করে থাকেন। আর যদি স্বামী- স্ত্রীকে জবরদস্তী করে বাধ্য করে, তবে কাজা দুই জনের উপর ওয়াজিব হবে। কিন্তু কাফ্‌ফারা আসবে কেবল স্বামীর উপর, স্ত্রীর উপর নয়।

আর ইমাম শাফী ও ইমাম আহমাদ (রাহঃ) এর মতানুসারে স্ত্রী উপর কোন অবস্থাতেই কাফ্‌ফারা নেই।

ইমাম আহমাদ (রাহঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হল, কেউ রমজান মাসে দিনের বেলায় স্ত্রী সহবাস করলে স্ত্রীর উপর কি কোন কাফ্‌ফারা আছে? তিনি বললেন–

مَاسَمِعْنَا اَنَّ عَلَى اِمْرَأَةٍ كَفَّارَةٌ–

স্ত্রীর উপর কোন কাফ্‌ফারা আছে আছে বলে আমি শুনি নাই।

কোন ব্যক্তি যদি দিনের বেলায় একাধিক বার স্ত্রী সহবাস করে, তবে সর্ব সম্মত রায় হল একই কাফ্‌ফারা ওয়াজের হবে।

আর যদি দু দিনে দু বার সহবাস করে, তবে ইমাম আবু হানীফা এবং ইমাম আহমাদ (রাহঃ) এর মতানুসারেএকই কাফ্‌ফারা যথেষ্ট হবে। আর ইমাম শাফী ও ইমাম মালিক (রাহঃ) এর মতানুসারে দুই কাফ্‌ফারা দিত হবে।

(খ) ইমাম আবু হানীফা এবং ইমাম মালিক (রাঃ) এর মতানুসারে রমজান মাসে দিনের বেলায় ইচ্ছাকৃত ভাবে পানাহার করলে কাজা ও কাফ্‌ফারা দুটিই ওয়াজিব হবে।

যা দ্বারা কেবল কাজা ওয়াজেব হয়

১। রমজান মাসে দিনের বেলা জেনে-বুঝে ইচ্ছাকৃত ভাবে পানাহার করলে অধিকাংশের মতে কেবল কাজা ওয়াজিব হবে কাফ্‌ফারা নয়। কিন্তু কবীরা গোনাহ হবে।

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসুল (সঃ) বলেছেন–

مَنْ اَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمْضَانَ فِيْ غَيْرِ رَخْصَةٍ رَخَّصَهَا اللّٰهُ لَهُ لَمْ يُقْضَ عَنْهُ صِيَامَ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَاِنْ صَامَهُ–

যে ব্যক্তি আল্লাহর দেওয়া অনুমতি ব্যতিত রামজানের একটি রোযা ভঙ্গ করল, সে সমস্ত বৎসর রোযা রাখলেও এর কাজা আদায় হবে না।

আর ইমাম বুখারী (রাহঃ) হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে মারফু হাদীস বর্ণনা করে বলেছেন–

مَنْ اَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمْضَانَ مِنْ غَيْرِ عُزْرٍ وَلاَ مَرَضٍ لَمْ يُقْضِهِ صَوْمُ الدَّهْرِ وَاِنْ صَامَهُ– قال ابن مسعود)

যে ব্যক্তি বিনা ওজরে কিংবা সুস্থাবস্থায় রমজানের একটি রোযা ভঙ্গ করল, সে সমস্ত বৎসর রোযা রাখলেও এর কাজা আদায় হবে না। ইবনে মাসউদ (রাঃ) একথা বলেছেন।

২। কেউ যদি অসুস্থ হয় কিংবা সফরে থাকে এবং রমজানের রোযা না রাখে, তাহলে তার উপর কাজা আদায় করা ওয়াজিব হবে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন–

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرَ–

তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অসুস্থ কিংবা মুসাফির সে অন্য সময় রোযার কাজা আদায় করবে। (সূরা বাকারা)

হযরত হামজা আল আসলামী (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমাদের মধ্যে কেউ রোযা রাখতে সক্ষম। সফরে রোযা রাখলে কি তার পাপ হবে? রাসুল (সঃ) বললেন–

هِىَ رَخْصَةٌ مِنَ اللّٰهِ تَعَالَى فَمَنْ اَخَزَ بِهَا فَحَسَنٌ وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يَصُوْمَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ–

এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুমতি মাত্র। কেউ যদি তা গ্রহণ করে তো ভাল। আর কেউ যদি রোযা রাখে তাতেও কোন পাপ নেই।

৩। হায়েজ ও নেফাসের সময় রোযা রাখা যায়েজ নয়। পরে এর কাজা আদায় করা ওয়াজেব।

হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেছেন–

كُنَّا نَحِيْضُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ–

নবী করীম (সাঃ) এর সময় আমাদে হায়েজ হত। আমাদেরকে বোযার কাজা করার নির্দেশ দেওয়া হত। আর নামাজের কাজা আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হত না।

৪। ইচ্ছা করে বমি করলে রোযা ভঙ্গ হবে এবং কাজা আদায় করা ওয়াজিব হবে।

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূল (সঃ) বলেছেন–

مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمَدًا فَلْيَقْضِ–

যার বমি হল, তার উপর কাজা নেই । আর যে ইচ্ছা করে বমি করেলো সে অবশ্যই কাজা আদায় করবে। (আহ্‌মাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্‌, হাকেম)

৫। সূর্যাস্ত হয়ে গেছে মনে করে যদি কেউ পানাহার করে অথবা ফজর উদয় হয়নি মনে করে যদি কেউ পানাহার করে এবং পরে দেখা যায় যে তার ধারনা ভূল হয়েছে, তাহলে তার উপর কাজা ওয়াজিব হবে। এটা হল চার জন ইমামের মাজহাব বা মতামত।

আর ইসহাক, দাউদ, আতা, হাসান বাসরী এবং মুজাহিদ (রাহঃ) এর মতানুসারে তার উপর কাজা ওয়াজিব হবে না। কারন, আল্লাহ্‌ বলেছেন–

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا اخْطَأْتُمْ بِهِ–

তোমরা যা ভূল করেছ তাতে কোন পাপ নেই। (সূরা বাকারা)

হযরত যায়েদ বিন ওহাব (রাঃ) বলেছেন, হযরত উমার (রাঃ) এর যুগে সূর্যাস্ত হয়েছে মনে করে ইফতার করলেন। আমি দেখলাম হযরত হাফসা (রাঃ) এর গৃহ থেকে খাদ্য আসছে। সকলে ইফতার করলেন অতঃপর আকাশ পরিস্কার হয়ে গেল এবং সূর্য দেখা গেল। আমরা বললাম, এ দিনের রোযা গেল। আমরা বললাম, এ দিনের রোযা কাযা করবো। হযরত উমার (রাঃ) বললেন, কেন?

وَ اللّٰهِ مَا تَجَانَفْنَا الاثْمَ–(رواه عبد الرزاق) আল্লাহর শপথ! আমরা পাপ করিনি।

৬। যে ব্যক্তি রমজান মাসে দিনের বেলায় ভূলে পানাহার করল। তারপর তার রোযা ভঙ্গ হয়ে গেছে মনে করে আবার পানাহার করল, তার উপর সর্বসম্মতিক্রমে এ রোযার কাজা ওয়াজিব।

৭। রমজানে দিনের বেলায় যদি কোন অজ্ঞান ব্যক্তির জ্ঞান ফিরে আসে অথবা কোন পাগল ব্যক্তি ভাল হয়ে যায়, তবে ঐ দিনের রোযার কাজা তার উপর ওয়াজিব হবে।

৮। কেউ যদি অসম্পূর্ণ খাহেশ পূর্ণ করে তবে তার উপর ঐ দিনের রোযার কাজা ওয়াজিব হবে। যেমন, কেউ রমজানে দিনের বেলায় ছোট শিশু, মূর্দা কিংবা পশুর সাথে সহবাস করে মনি বের করল, তাহলে তার উপর ঐ রোযার কাজা করা ওয়াজিব হবে।

৯। কারো যদি নাক ও কান দিয়ে পানি প্রবেশ করে পেট পর্যন্ত পৌছে যায়, তবে তার উপর উক্ত রোযার কাজা ওযাজিব হবে।

হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

انَّمَا الافْطَارُ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ/

কিছু প্রবেশ করলে রোযা ভঙ্গ হয়। আর কিছু বের হলে রোযা ভঙ্গ হয় না। (আবু ইয়া'লা)

যা দ্বারা কেবল কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হয়

কেউ যদি অন্য কাউকে রমজানের রোযা ভঙ্গ করতে শক্তি প্রয়োগ করে এবং রোজা ভাঙায়, তবে তার উপর ঐ রোযার কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে।

আর কেউ যদি রমজানে দিনের বেলায় জবরদস্তী করে স্ত্রীকে সহবাস করতে বাধ্য করে, তবে স্ত্রীর উপর কেবল কাজ ওয়াজিব হবে এবং স্বামীর উপর কাজাসহ দুটি কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে। একটি তার এবং অন্যটি স্ত্রীর কাফ্‌ফারা।

ফিদিয়া

হযরত আতা (রাহঃ) বলেন, তিনি হযরত ইবনে আববাস (রাঃ) কে পাঠ করতে শুনেছেন–

وَ عَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ–

আর বৃদ্ধ (নর-নারী) যাদের জন্য রোযা বেশী কষ্টদায়ক হয়, তারা এর পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করবে। (সূরা বাকারা)

হযরত ইবনে আববাস (রাঃ) বলেছেন, এ আয়াত রহিত হয়নি। বরং এটা হল অতি বৃদ্ধ নর-নারীর জন্য, যারা রোযা রাখতে অক্ষম। তারা প্রতি দিন একজন মিসকীনকে খাদ্য দেবে। তাদের উপর কোন কাজা নেই। (বোখারী)

হযরত ইবনে উমার ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর মতানুসারে গর্ভবতী মহিলা এবং শিশুকে বুকের দুধ পানকারী মহিলা যদি নিজের অথবা বাচ্চার ক্ষতি হওয়ার আশংকা করে, তবে তারাও ফিদিয়া দেবে তাদের উপর কাজা ওয়াজিব হবে না।

হযরত ইকরামা (রাঃ) বলেন, হযরত ইবনে আববাস (রাঃ) বলেছেন–

وَ عَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ–

এটা হল বৃদ্ধ নর-নারীর জন্য অনুমতি, যাদের রোযা রাখতে কষ্ট হয়। তারা ইফ্‌তার করবে এবং প্রতি দিন একজন মিসকীনকে খাদ্য দেবে। তেমনি অনুমতি হল গর্ভবতী নারী এবং দুধ পানকারী নারীর জন্য, যারা নিজের কিংবা বাচ্চার ক্ষতি হওয়ার আশংকা করে তারা ইফতার করবে এবং ফিদিয়া দেবে। (আবু দাউদ)

হযরত নাফে (রাহঃ) বলেন, হযরত ইবনে উমার (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হল গর্ভবতী নারী সম্পর্কে, যে তার বাচ্চার ক্ষতির আশংকা করে। তিনি বললেন, সে ইফতার করবে এবং প্রতি দিন একজন মিসকীনকে খাদ্য দেবে। (মালিক, বায়হাকী)

হযরত আনছ বিন মালিক আল-ক'বী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ وَعَنِ الْمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ–

আল্লাহ তা'য়ালা মুসাফিরের উপর থেকে অর্ধেক নামায তুলে নিয়েছেন এবং মুসাফির, গর্ভবতী নারী ও দুধ পানকারী নারীর উপর থেকে রোযা তুলে নিয়েছেন। (বোখারী, মুসলিম, আহ্‌মাদ)

ইমাম আবু হানীফা (রাহঃ) এর মতানুসারে গর্ভবতী নারী এবং দুধ পানকারী নারী ইফ্‌তার করবে এবং পরে কাজা আদায় করবে-ফিদিয়া দেবে না।

কাফ্‌ফারা

রোযার কাফ্‌ফারা হলঃ-

(ক) কৃতদাস আযাদ করা।

(খ) কৃতদাস না পেলে একাধারে ষাট দিন রোযা রাখা। মধ্য খানে একদিন বাদ দিলে আবার নতুন ভাবে ষাট দিন রোযা রাখতে হবে।

(গ) রোযা রাখা সম্ভব না হলে ষাট মিসকীন কে দু বেলা খাদ্য দিতে হবে।

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রমজান মাসে নবী করীম (সাঃ) এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমি ধ্বংশ হয়ে গেছি। নবী করীম (সাঃ) বললেন–

مَا اَهْلَكَكَ؟ তোমাকে কি জিনিষ ধ্বংশ করল?

সে বললো, আমি রমজানে দিনের বেলায় স্ত্রী সহবাস করেছি। নবী করীম (সাঃ) বললেন, তুমি কি দাসি আযাদ করতে পারবে? সে বললো, না। নবী করীম (সাঃ) বললেন, তুমি কি ষাটজন মিসকীনকে খাদ্য দিতে পারবে? সে বললো, না। অতঃপর নবী করীম (সাঃ) বললেন, তুমি বসো। এরপর নবী করীম (সাঃ) এর নিকট এক ঝুড়ি খেজুর এলো। তিনি বললেন–

تُصَدَّقْ بِهٰذَا এটা সাদাকা করে দাও।

সে বললো, আমার চেয়ে বেশী ফকীরকে কি দিব? হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! মদিনার মধ্যে আমার চেয়ে বেশী ফকীর আর কেউ নেই।

فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِزُهُ–

নবী করীম (সাঃ) হাসলেন, এমন কি তাঁর দন্ত মোবারক বিকশিত হলো। তিনি বললেন–

اِذْهَبْ فَاَطْعِمْهُ اَهْلَكَ– (رواه الجماعة)

যাও, এগুলো তোমার পরিবারকে খেতে দাও।

যা দ্বারা রোযা ভঙ্গ হয় না

১। কারো যদি রোযার কথা স্মরন না থাকে আর পানাহার করে, তবে তার রোযা নষ্ট হবে না।

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَاَكَلَ اَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَاِنَّمَا اَطْعَمَهُ اللّٰهُ وَسَقَاهُ–

যে ব্যক্তি রোযার কথা ভূলে গেল এবং পানাহার করল, সে তার রোযা পূর্ণ করবে। কারণ, আল্লাহ ই তাকে পানাহার করায়েছেন। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

مَنْ اَفْطَرَ فِيْ رَمْضَانَ نَاسِيًا فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلاَ كَفَّارَةَ–

যে ব্যক্তি রমজান মাসে ভুলে ইফ্‌তার করল, তার উপর কোন কাজা নেই এবং কাফ্‌ফারা ও নেই। (হাকেম, দারে কুতনী, বায়হাকী)

২। অনিচ্ছাকৃতভাবে যদি বমি হয় তাহলে রোযা নষ্ট হবে না।

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْئُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمَدًا فَلْيَقْضِ–

যে রোযাদার ব্যক্তির বমি হল, তার উপর কোন কাজা নেই। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ভাবে বমি করলো, সে অবশ্যই কাজা আদায় করবে। (বোখারী, মুসলিম, আহ্‌মাদ)

৩। রোযা অবস্থায় দিনের বেলায় স্বপ্নদোষ হলে অথবা শিংগা লাগালে রোযা বিনষ্ট হবে না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

ثَلاَثَةٌ لاَيُفْطِرْنَ الصَّائِمَ، اَلْقَيُّ وَالْحَجَامَةُ وَالاِحْتِلاَمُ–

তিনটি জিনিষ রোযাদারের রোযা ভঙ্গ করে না। বমি, শিংগা লাগানো এবং স্বপ্নদোষ।

৪। রোযা অবস্থায় ঠাণ্ডা গ্রহণ করা। যেমন, রোযা অবস্থায় মাথায় পানি দেওয়া, কুলি করা, গোসল করা এবং নাকে পানি দেওয়া ইত্যাদি জায়েয।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আমি নবী করীম (সাঃ)কে দেখেছি, তিনি রোযাবস্থায় মাথায় পানি দিচ্ছেন, গরমের জন্যে কিংবা পিপাসার জন্যে। অতঃপর তিনি রোযা রাখলেন। কাদীদ নামক স্থানে এসে তিনি পানি তলব করে ইফ্‌তার করলেন এবং মানুষও ইফ্‌তার করলেন। এটা হয়েছে ফাতেহ মক্কার সময়। (আহ্‌মাদ, আবু দাউদ, নাসাঈ)

৫। রোযা অবস্থায় সুরমা লাগালে রোযা নষ্ট হয় না।

হযরত আনাস বিন মালিক বলেন, তিনি রোযাবস্থায় সুরমা লাগাতেন। (আবু দাউদ)

৬। রোযা অবস্থায় দিনের বেলায় ইনজেকশন নেয়া জায়েয। এতে রোযা নষ্ট হয় না। কিন্তু খাদ্য জাতীয় ইনজেকশন নেয়া জায়েয নয়।

৭। চুলে অথবা শরীরে তেল দিলে রোযা নষ্ট হয় না।

রোযা অবস্থায় যা করা মাকরূহ

১। হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেছেন–

اَنَّ النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ كَانَ یُقَبِّلُ بَعْضَ اَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ، وَیُبَاشِرُوْ هُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ اَمْلَكَكُمْ لاَرِجِهِ–

নবী করীম (সাঃ) রোযা অবস্থায় নিজের স্ত্রীকে চুমু দিতেন এবং স্ত্রীর সথে শুতেন। আর তিনি ছিলেন স্বীয় প্রবৃত্তির উপর বেশী কর্তৃত্বশীল।

অতএব যার প্রবৃত্তির উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ নেই, তার জন্য রোযা অবস্থায় স্ত্রীকে চুমু দেওয়া বা তার সাথে শোয়া মাকরূহ।

২। রোযা অবস্থায় কুলি করতে এবং নাকে পানি দিতে বাড়াবাড়ি করা মাকরূহ।

হযরত লকিত বিন সাবরা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

فَاذَا اسْتَنْشَقْتَ فَاَبْلِغْ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ صَائِمًا– (احمد، البخارى، مسلم)

যখন তুমি নাকে পানি দেবে, তখন ভাল করে নাকে পানি দেবে। কিন্তু যদি রোযা হও।

৩। খুশবু (সুগন্ধি) লাগানো। রোযা অবস্থায় কোন রকম খুশবু লাগানো মাকরূহ।

৪। রোযা অবস্থায়া কিছু চাবানো মাকরূহ।

হযরত উম্মে হাবীবা বলেছেন–

لاَ یَمْضَغُ الْعِلْكَ الصَّائِمُ– রোযাদার কিছু চাবাবে না। (বায়হাকী)

৫। রোযা অবস্থায় কোন যুবককে চুমু দেওয়া অথবা যুবকের চুমু গ্রহণ করা মাকরূহ।

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) বলেছেন, আমরা নবী করীম (সাঃ) এর নিকট ছিলাম, এক যুবক এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমি কি রোযা অবস্থায় চুমু দেব? নবী করীম (সাঃ) বললেন, না। অতঃপর এক বৃদ্ধ ব্যক্তি এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমি কি রোযা অবস্থায় চুমু দেব? নবী করীম (সাঃ) বললেন, হাঁ। তখন মানুষ একে অপরের দিকে তাকাতে লাগলেন। নবী করীম (সাঃ) বললেন, আমি জানি তোমরা কেন একে অপরের দিকে তাকাচ্ছ?

اِنَّ الشَّیْخَ یَمْلِكُ نَفْسَهُ– বৃদ্ধ তার প্রবৃত্তির মালিক। (আহ্‌মাদ, তিবরাণী ফিল কাবীর)

৬। কোন কিছুর স্বাদ গ্রহণ করা মাকরূহ। কিন্তু স্বামী যদি কঠোর মেজাজী হয় তাহলে খাদ্য বস্তুর স্বাদ গ্রহণ করে লবণ বা ঝাল দেখা জায়েয।

৭। রোযা অবস্থায় মুখে থু থু জমা করে তা গিলে ফেলা মাকরূহ।

রোযার সুন্নাত সমুহ

১। সূর্যাস্তের পর দ্রুত ইফ্‌তার করা সুন্নাত।

হযরত সহল বিন সা'দ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوْا الْفِطْرِ–

মানুষ মঙ্গলময় থাকবে যতক্ষন তারা দ্রুত ইফতার করতে থাকবে। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

হযরত আছিম বিন আব্দুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যখন রাত চলে আসে এবং দিন চলে যায়, আর সূর্য অস্ত হয়ে যায়–

فَقَدْ اَفْطَرَ الصَّائِمُ– তখনই রোযাদার ইফ্‌তার করবে। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

২। তাজা খেজুর দ্বারা ইফ্‌তার করা সুন্নাত।

হযরত আনাছ (রাঃ) বলেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ عَلَى رُطُبَاتٍ قَبْلَ اَنْ يُصَلِّى فَاِنْ لَمْ تَكُنْ فَعَلَى تَمَرَاتٍ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ– (ابوداؤد)

নবী করীম (সাঃ) মাগরিবের নামাযের পূর্বে কয়েকটি তাজা খেজুর দ্বারা ইফ্‌তার করতেন। আর তা না পেলে শুকনো খেজুর দিয়ে ইফ্‌তার করতেন। আর তা না পেলে পানি দিয়ে ইফ্‌তার করতেন। (আবু দাউদ)

হযরত সালমান বিন আমের (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন রোযা রাখবে–

فَلْيُفْطِرْ عَلَى التَّمْرِ فَاِنْ لَمْ تَجِدِ التَّمْرَ فَعَلَى الْمَاءِ فَاِنَّهُ طَهُوْرٌ–

তখন সে খেজুর দিয়ে ইফ্‌তার করবে। আর খেজুর না পেলে পানি দিয়ে ইফতার করবে। কারণ, পানি হল পবিত্র। (আহ্‌মাদ, তিরমিযী)

৩। ইফতারের সময় দোয়া করা সুন্নাত।

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

اِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَاتُرَدُّ–

নিশ্চয়ই ইফতারের সময় রোযাদারের দোয়া ফিরত হয় না। (ইবনে মাজাহ্)

আর তিরমিযী শরীফের বর্ণনায় এসেছে, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

ثَلاَثَةٌ لاَ تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ اَلصَّائِمُ حِيْنَ يُفْطِرُ وَالاِمَامُ الْعَادِلُ وَالْمَظْلُوْمُ–

তিন ব্যক্তির দোয়া ফিরত হয় না। ইফতারের সময় রোযাদারের দোয়া ইনসাফকারী ইমাম (নেতার) দোয়া এবং অত্যাচারিত ব্যক্তির দোয়া।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) যখন ইফ্তার করতেন, তখন বলতেন–

اَللَّهُمَّ لَكَ صُمْنَا وَعَلَى رِزْقِكَ اَفْطَرْنَا فَتَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ–

হযরত আনাছ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

اِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَابْدَؤُا بِهِ قَبْلَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ وَلاَ تَعْجِلُوْا عَنْ عَشَائِكُمْ–

যদি রাতের খাদ্য উপস্থিত করা হয়, তাহলে মাগরিবের পূর্বেই খানা খেয়ে নেবে। আর খানা ফেলে রেখে নামাযে জলদি করবে না। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

৪। অন্য কারো নিকট ইফতার করলে, তার জন্য দোয়া করা সুন্নাত।

হযরত মাসয়াব বিন ছাবিত, হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী করীম (সাঃ) হযরত সা'দ বিন মায়ায (রাঃ) এর নিকট ইফ্তার করলেন এবং বললেন–

اَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ وَاَكَلَ طَعَامَكُمُ الاَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ–

৫। সেহরী খাওয়া সুন্নাত

হযরত আনাছ বিন মালিক (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

تَسَحَّرُوْا فَاِنَّ فِى السُّحُوْرِ بَرَكَةً–

সেহরী খাও কারন সেহরীতে বরকত রয়েছে। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

হযরত অমর বিন আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, আমাদের রোযা এবং আহলে কিতাবের রোযার মধ্যে পার্থক্য হল, সেহরী খাওয়া। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

হযরত যাবের বিন আব্দুল্লাহ বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

مَنْ اَرَادَ اَنْ يَصُوْمَ فَلْيَتَسَحَّرْ بِشَيْءٍ–

যে রোযা রাখতে চায়, সে অবশ্যই সেহরী খাবে। (আহ্মাদ, আবু ইয়ালা)

সেহরীর সময়

দেরীতে সেহরী খাওয়া মুস্তাহাব। হযরত আবুযার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

لاَ تَزَالُ اُمَّتِىْ بِخَيْرٍ مَا عَجَلُوْا الْفِطْرَ وَاَخَّرُوْا السُّحُوْرَ– (رواه احمد)

আমার উম্মাত মঙ্গলময় থাকবে যতক্ষণ তারা ইফ্‌তার জলদি করবে এবং দেরীতে সেহরী খবে।

হযরত আনাছ (রাঃ) হযরত যায়দ বিন ছাবিত (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। আমরা নবী করীম (সাঃ) এর সাথে সেহরী খেতাম। অতঃপর নামাযে যেতাম। আমি বললাম, সেহরী ও নামাযের মধ্যে পার্থক্য কতটুকু ছিল? তিনি বললেন, পঞ্চাশ আয়াত পাঠ করার পরিমান। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন–

وَ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ– (سورة البقرة)

আর পানাহার কর, যতক্ষণ না কালো রেখা থেকে ভোরের শুভ্র রেখা পরিস্কার হয়ে যায়।

হযরত ছুমরা বিন যুনদাব (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

لاَ يَمْنَعُكُمْ مِنْ سُحُوْرِكُمْ اَذَانُ بِلاَلٍ وَلاَ الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيْلُ وَلكِنَّ الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيْرُ–

বেলালের আযান যেন তোমাদেরকে সেহরী খাওয়া থেকে বিরত না রাখে এবং বিরত না রাখে সেই শুভ্র রেখা যা পূর্বাকাশে উদিত হয়। কিন্তু বিরত থাকবে যখন পূর্বাকাশে শুভ্রতা পরিষ্কার হয়ে যায়। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

হযরত সাঈদ বিন মনসুর (রাঃ) হযরত হুজায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন–

تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّهِ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم هُوَ وَاللّهِ اَلنَّهَارُ غَيْرَ اَنَّ الشَّمْسَ لَمْ تَطْلُعْ– (رواه الطحاوى)

আল্লাহর শপথ! আমরা নবী করীম (সাঃ) এর সাথে সেহরী খেয়েছি দিনেই, সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে। (রাওয়াহুল তাহাভী)

সাহাবাগনের আছার (কথা ও কাজ)

হযরত সাইদ বিন মনসুর, ইবনে আবু শাইবা এবং ইবনে মুন্‌যির হযরত আবুবকর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

اَنَّهُ اَمَرَ بِغَلَقِ الْبَابِ حَتّٰى لاَ يُرَى الْفَجَرَ–

তিনি দরজা বন্ধ করার আদেশ করেন যেন, ফজরের শুভ্রতা দেখা না যায়। (ফতহুল বারী)

ইবনে মুনযির সঠিক সনদ সহ হযরত সালিম বিন উবায়দ আল-আশযায়ী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একদিন হযরত আবুবকর (রাঃ) তাকে বললেন– اُخْرُجْ فَانْظُرْ هَلْ طَلَعَ الْفَجَرَ

বের হয়ে দেখ, সুবেহ সাদেক হয়েছে কি না? আমি দেখে এসে বললাম–

قَدْ اَبْيَضَ وَسَطَعَ– শুভ্রতা পরিষ্কার হয়েছে।

তিনি আবার বললেন, যাও দেখো সুবেহ্ সাদিক পরিষ্কার হয়েছে কি না? আমি দেখে এসে বললাম–

قَدْ اِعْتَرَضَ فَقَالَ الاٰنَ اَبْلِغِنِىْ شَرَابِىْ–

আলো বিস্তার লাভ করেছে। তখন তিনি বললেন, এখন আমার শরবত দাও। (ফতহুল বারী)

আর ইবনুল মুন্‌যির সঠিক সানাদ সহ হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন–

اَنَّهُ صَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ قَالَ الاٰنَ حِيْنَ تَبَيَّنَ الْخَيْطُ الاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الاَسْوَدِ–

হযরত আলী (রাঃ) ফজরের নামাজ পড়ার পর বললেন, এখনই রাতের কালিমা থেকে ফজরের শুভ্রতা ফুটে উঠার সময় হয়েছে। (ফতহুল বারী)

হযরত আ'মাশ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন–

لَوْ لاَ الشَّهْوَةَ لَصَلَّيْتُ الْغَدَاةَ ثُمَّ تَسَحَّرْفُ–

যদি খাওয়ার ইচ্ছা না থাকত, তাহলে ফজরের নামায পড়েই সেহরী খেতাম। (ফতহুল বারী)

হযরত আহনাফ (রাহঃ) এর মতামত

وقت الصوم من حين يطلع الفجر الثانى وهو المستطير المنتشر فى الافق الى غروب الشمس–

রোযার সময় সুবেহ সাদেক অর্থাৎ পূর্বাকাশে শুভ্রতা বিস্তৃতি লাভ করা থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

কিন্তু উলামাগণের মধ্যে মতবিরোধ হল, রোযার সময়, ফজর উদিত হওয়া থেকে না আলো বিস্তার লাভ করা থেকে। সামসুল আইম্মা হালওয়ানী বলেছেন–

اَلْقَوْلُ الاَوَّلُ اَحْوَطُ وَالثَّانِیْ اَوْ سَعَ–

প্রথম কথায় সতর্কতা এবং দ্বিতীয় কথায় প্রশস্ততা।

وفيه مال اكثر العلماء كذا فى خزانة الفتوى–

আর এ দ্বিতীয় কথার প্রতি অধিকাংশ উলামাগণের মত। এমনি ভাবে 'খাজানাতুল ফতোয়ায়' উল্লেখ করা হয়েছে। (ফতাওয়ায়ে আলমগীরী)

মাওলানা মাওদুদী (রাহঃ) এর মতামত

شریعت نے سحری اور افطار کی اوقات کی کوئی ایس حد بندی نهں کی ہے جس سے چند سیکنڑ چند منٹ ادھر اُدھر ہوجانے سے آدمی کا روزہ خراب ہوجاتا ے، بلکه طلوع فجر کے وقت میں وسعت ے، اگر عین طلوع فجر کے وقت کسی شخص کی آکنه کھلی ہو، تو وہ جلدی سے اٹھکر کچ کھالی لے، حدیث میں آیا ہے که حضور (صلی) نے فرمایا ہے اگر تم میں سے کوئی شخص سحری کھا رہاہو اور اذان کی آواز آجائے تو فوراً کھانا چھڑ نه دیے، بلکه آپنے حاجت بھر کھالی لے–

ইসলামী শরিয়াত সেহরী এবং ইফ্তারের সময় এমনভাবে বেঁধে দেয়নি যে, কয়েক সেকেন্ড কিংবা কয়েক মিনিট এদিক ওদিক হলেই রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। বরং ফজর উদয় হওয়ার সময়ে রয়েছে প্রশস্ততা। যদি ফজর উদিত হওয়ার সময় কারো নিদ্রা ভঙ্গ হয়, তাহলে সে তাড়াতাড়ি কিছু পানাহার করে নেবে। হাদীসে এসেছে, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যদি তোমাদের কেউ সেহরী খাওয়ার সময় আযানের ধ্বনি শুনতে পাও, তবে সহসা খানা ত্যাগ করবে না। বরং প্রয়োজন পরিমানে পানাহার করে নেবে।' (দেখুন, সুরা বাকারার ১৮৭ নং আয়াতে তাফসীর, তাফহীমুল কোরআন।)

এখানে তিরমিযী শরীফের একটি হাদীস উল্লেখ যোগ্য। হযরত কায়েছ বিন তলক তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَعْتَرِضَ لَكُمُ الاَحْمَرُ–

পূর্বাকাশে লালিমা বিস্তার লাভ করা পর্যন্ত পানাহার কর।

ইমাম তিরমিযী বলেছেন উক্ত হাদীসের উপরই উলামাগণের আমল– পূর্বাকাশে লালিমা বিস্তার লাভ করা পর্যন্ত রোযাদারের উপর পানাহার করা হারাম নয়।

রমজানের রোযার কাজা

রমজানের রোযার কাজা জলদি আদায় করা ওয়াজিব নয়। যখন সম্ভব হয় তখনই আদায় করা যাবে।

হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন–

اَنَّهَا كَانَتْ تَقْضِىْ مَا عَلَيْهَا مِنْ رَمْضَانَ فِىْ شَعْبَانَ وَلَمْ تَكُنْ تَقْضِىْ فَوْرًا عِنْدًا قُدْرَتِهَا عَلَى الْقَضَاءِ–

তিনি রমজানের কাজা শা'বান মাসে আদায় করতেন। কাজা আদায় করা সম্ভব হওয়া সত্ত্বেও তিনি জলদি আদায় করতেন না। (মুসলিম, আহ্‌মাদ)

রোযার কাজা একাধারে আদায় করা জরুরী নয়। বরং এর মধ্যে পার্থক্য করে রাখা বৈধ। অর্থাৎ আজ একটি এবং দু দিন পর আরকটি রাখা জায়েয।

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) রমজানের রোযার কাজা সম্পর্কে বলেছেন–

اِنْ شَاءَ فَرَّقَ وَاِنْ شَاءَ تَتَابَعَ– ইচ্ছা হলে পার্থক্য কর এবং ইচ্ছা হলে একাধারে রাখ।

যদি কেউ রমজানের রোযার কাজা আদায় না করে এবং অন্য রমজান এসে যায়, তাহলে সে উপস্থিত রমজানের রোযা রাখবে। অতঃপর কাজা আদায় করবে। তাকে কোন ফিদিয়া দিতে হবে না। এটা হলো আহনাফের মাজহাব।

আর মালেকী, শাফী ও হাম্বলী মাজহাব হল, যদি বিনা ওযরে কাজা আদায় না করে এবং অন্য রমযান এসে যায়, তাহলে উপস্থিত রমজানের রোযা রাখবে। অতঃপর কাজা আদায় করবে এবং ফিদিয়াও দেবে। কিন্তু তাঁদের এ কথা হাদীস দ্বারা প্রমানিত নয়।

ফরয রোযার কাজা আদায় না করে মৃত্যুবরন করা

উলামাগনের ইজমা হল, কেউ যদি ফরয নামায অনাদায় রেখে মৃত্যুরবন করে, তবে তার ওলী বা ওয়ারেসগণ তার পক্ষ থেকে রোযা রাখতে পারবে। আর ওলীর অনুমতিক্রমে অন্য কেউও রাখতে পারবে।

হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ– (رواه الشيخان)

যে ব্যক্তি তার উপর ফরয রোযা রেখে মৃত্যুবরণ করল, তার ওলী তার পক্ষ থেকে রোযা রাখবে। (রাওয়াহুশ শাইখান)

আর বাররাযের বর্ণনায় অতিরিক্ত হল, 'যদি সে চায়।'

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ) এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমার মা এক মাসের রোযা অনাদায় রেখে মৃত্যুবরণ করেছেন। আমি কি তার পক্ষ থেকে রোযা রাখতে পারব? নবী করীম (সাঃ) বললেন–

لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللّٰهِ اَحَقُّ اَنْ يُقْضٰى– (رواه احمد و اصحاب السنن)

তোমার মাতার উপর যদি ঋণ থাকত, তাহলে কি তুমি তা আদায় করতে না? সে বললো, হ্যাঁ। নবী করীম (সাঃ) বললেন, আল্লাহ্ বেশী হকদার হলেন যেন তার ঋণ আদায় করা হয়। (আহ্‌মাদ ওয়া আস্‌ হাবুস্‌সুনান)

ইমাম নববী বলেছেন, এটাই সহীহ এবং সঠিক। কেউ যদি কোন কারণে রমজানের রোযা রাখতে না পারে এবং পরে, কারণ দূর হওয়ার পর কাজা আদায় না করে সে মৃত্যুবরণ করে তবে তার পক্ষ থেকে অন্য কেউ রোযা রাখতে পারবে না। বরং ফিদিয়া দিতে হবে।

প্রত্যেক দিন এক মুদ পরিমান দিতে হবে। আর আহনাফের মতানুসারে অর্ধেক ছা' আটা দেবে। আর গম বা অন্য কিছু হলে এক ছা' দেবে।

যেসব দিনে রোযা রাখা নিষিদ্ধ

১। দুই ঈদের দিন রোযা রাখা হারাম, রোযা ফরয বা নফল হোক।

হযরত আবু সাইদ খুদরী (রাঃ) বলেছেন–

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ، يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ– (متفق عليه)

নবী করীম (সাঃ) দুই দিন রোযা রাখা নিষেধ করেছেন, ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আজহা।

২। আইয়ামে তাশরীকে তিন দিন রোযা রাখা হারাম।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) এক ব্যক্তিকে পাঠালেন, সে উচ্চকণ্ঠে বলতে লাগল–

اَنْ لاَ تَصُوْمُوْا هٰذِهِ الاَيَّامَ فَاِنَّهَا اَيَّامُ اَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ–(رواه الطبرانى)

তাশরীকের দিন গুলোয় রোযা রাখবে না। কারণ, তা পানাহার ও স্ত্রী সহবাসের দিন।

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) আব্দুল্লাহ বিন হুজাইফা (রাঃ) কে পাঠালেন। তিনি মিনায় ঘুরে ঘুরে বলতে লাগলেন–

اَنْ لاَ تَصُوْمُوْا هٰذِهِ الاَيَّامَ فَاِنَّهَا اَيَّامُ اَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ–

ঐ দিন গুলোয় রোযা রাখবে না। কারন তা পানাহার ও আল্লাহর যিকরের দিন। (আহ্মাদ)

৩। কেবল মাত্র শুক্রবারে রোযা রাখা মাকরূহ। কিন্তু যদি আগে বা পিছনে আরেক দিন মিলিয়ে রাখা হয় কিংবা ঐ দিন আরাফা বা আশুরা হয়, তাহলে মাকরূহ হবে না।

হযরত যাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

لاَ تَصُوْمُوْا يَوْمَ الْجُمُعَةِ الاَّ وَقَبْلَهُ يَوْمٌ اَوْ بَعْدَهُ– (متفق عليه)

শুক্রবারে রোযা রাখবে না। কিন্তু যদি আগে বা পরে এক দিন রাখ। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

হযরত আমের আল-আশয়ায়ী (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (সাঃ) কে বলতে শুনেছি–

اِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عِيْدُكُمْ فَلاَ تَصُوْهُ اِلاَّ اَنْ تَصُوْمُوْا قَبْلَهُ اَوْ بَعْدَهُ– (رواه البزاز بسند حسن)

নিশ্চয়ই শুক্রবার হল তোমাদের ঈদ। তাই ঐ দিন তোমরা রোযা রাখবে না। কিন্তু যদি এর আগে বা পরে এক দিন রাখ।

৪। কেবল শনিবারে রোযা রাখা মাকরূহ।

হযরত বুছর আছ-ছালমী তাঁর বোন আল-সাম্মা থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

لاَ تَصُوْمُوا يَوْمَ السَّبْتِ اِلاَّ فِيْمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ وَاِنْ لَمْ يَجِدْ اَحَدُكُمْ اِلاَّ لَحَاءَ عِنَبٍ اَوْ عُوْدَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضَغْهُ–

তোমরা শনিবারে রোযা রাখবে না, কিন্তু যা তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে। যদি কিছু না পাও, তবে আংগুরের ছাল অথবা কাঠের টুকরা চিবিয়ে নেবে। (আহ্মাদ)

৫। সন্দেহের দিন রোযা রাখা মাকরূহ।

হযরত আম্মার বিন ইয়াছির (রাঃ) বলেন–

مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِىْ شَكَّ فِيْهِ فَقَدْ عَصَى اَبَاالْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– (رواه اصحاب السنن)

যে ব্যক্তি সন্দেহের দিন রোযা রাখল, সে অবশ্যই আবুল কাসেম (সাঃ) এর নাফরমানী করল।

৬। সারা বৎসর রোযা রাখা জায়েজ নয়।

নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الاَبَدِ– (رواه البخارى ومسلم واحمد)

যে ব্যক্তি সারা বৎসর রোযা রাখল, তার রোযা হল না। (বোখারী, মুসলিম, আহ্মাদ)

৭। স্বামী উপস্থিত থাকলে বিনা অনুমতিতে স্ত্রীর রোযা রাখা জায়েজ নয়।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

لاَ تَصُمُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا وَحِدًا وَزَوْجُهَا شَاهِرٌ الاَّ بِاذْنِه الاَّ رَمْضَانَ–

রমযান ব্যতিত স্বামী উপস্থিত থাকলে বিনা অনুমতিতে স্ত্রী একদিনও রোযা রাখবে না। (বোখারী, মুসলিম, আহ্মাদ)

৮। সিয়ামুল ইসাল বৈধ নয়।

সিয়ামুল ইসাল হল, ইফ্তার ও সেহরী না খেয়ে এক রোযার সাথে অন্য রোযা মিলিয়ে রাখা। এটা জায়েজ নয়।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

اِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ–

তোমরা অবশ্যই সিয়ামুল ইসাল থেকে বিরত থাকবে, তিন বার বললেন।

সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আপনি তো সিয়ামুল ইসাল রাখেন। জবাবে তিনি বললেন–

اِنَّكُمْ لَسْتُمْ فِيْ ذَلِكَ مِثْلِيْ، اِنِّيْ اَبِيْتُ يُطْعِمُنِيْ وَ يُسْقِيْنِيْ، فَاُكَلَّفُوْا مِنَ الاَعْمَالِ مَا تُطِيْقُوْنَ– (متفق عليه)

তোমরা এতে আমার মত নও। আমি রাত যাপন করি এবং আমার প্রভূ আমাকে পানাহার করান। সুতরাং তোমাদের পক্ষে যতটুকু করা সম্ভব তাই করবে। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

৯। শা'বান মাসের শেষ পনের দিন রোযা রাখা মাকরূহ।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

اِذَا كَانَ نِصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَامْسِكُوْا عَنِ الصَّوْمِ حَتَّى يَكُوْنَ رَمْضَانَ–

যখন শা'বানের অর্ধেক হয়ে যায়, তখন রমজান পর্যন্ত রোযা রাখা থেকে বিরত থাকবে। (বোখারী, মুসলিম, আহ্মাদ)

রোযাদারের জন্য বর্জনীয় কাজসমুহ

১। মিথ্যা কথা এবং মিথ্যা কাজ বর্জন করা জরুরী।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِيْ اَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ

وَشَرَابَهُ– (رواه البخاری، ابوداؤد، الترمذی، والنسائ)

কাওলুয্ যাওর-এর অর্থ, মিথ্যা সাক্ষ্য মিথ্যা কথা, শিরক, বেদআত এবং মিথ্যা লেনদেন ইত্যাদি সকল অসত্য ও বাতিল কাজ। তাই হাদীসের অর্থ হল, যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা এবং অসত্য কাজ বর্জন করল না, তার পানাহার ত্যাগ করার আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।

২। অনর্থক ও লজ্জাজনক কাজ ও কথা থেকে বিরত থাকা জরুরী।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الاَكْلِ وَالشُّرْبِ، اِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، فَاِنْ سَابَّكَ اَحَدٌ اَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ فَقُلْ اِنِّىْ صَائِمٌ، اِنِّىْ صَائِمٌ–

রোযা কেবল পানাহার ত্যাগ করার নাম নয়। বরং রোযা হল, অনর্থক ও ফাহেশা কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকা। যদি কেউ তোমাকে গালি দেয়, তবে তুমি বলবে আমি রোযাদার, আমি রোযাদার। (ইবনে খুযাইমা, ইবনে হাব্বান)

৩। অন্যের গীবত করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

হযরত উবাইদ (রাঃ) যিনি ছিলেন নবী করীম (সাঃ) এর দাস, তিনি বলেন– দু'জন মহিলা রোযা ছিল। এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর নবী (সাঃ)! দুজন মহিলা রোযা রেখেছে এবং পিপাসায় মরণাপন্ন হয়ে গেছে। নবীজী নীরব রইলেন। সে চলে গেল এবং ফেরত এসে বলল, হে নবী! আল্লাহর কসম এরা মরণাপন্ন হয়ে গেছে। নবীজী বললেন, একটি বাসন নিয়ে এসো। অতঃপর তাদের একজনকে বললেন, বমি কর। সে রক্ত, পুঁজ এবং মাংসসহ বমি করল। তারপর অন্যজনকে বললেন, তুমি বমি কর। সেও রক্ত, পুঁজ এবং মাংসসহ বমি করে বাসন ভর্তি করে দিল। তখন নবীজী বললেন, এরা হালাল বস্তু থেকে বিরত রয়েছে এবং হারাম বস্তু খেয়েছে। তারা দুজন একত্রে বসে মানুষের গীবত করেছে। (আহ্‌মাদ)

৪। সব রকম ইসলাম বিরোধী কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهٖ اِلاَّ الْجَوْعُ وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهٖ اِلاَّ السَّهْرُ– (رواه ابن ماجة)

অনেক রোযাদার আছে, যারা তাদের রোযা দ্বারা ক্ষুধা ব্যতিত অন্য কিছুই পায়না। আর অনেক নামাযী আছে, যারা অনিদ্রা ব্যতিত অন্য কিছু (ছওয়াব) পায় না। (ইবনে মাজাহ্‌)

রোযার মাসে করণীয় কাজসমূহ

১। রমজান মাসে বেশী করে সাদকা করা উত্তম।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَجْوَدُ النَّاسِ وَاَجْوَدُ مَا يَكُوْنُ فِىْ رَمْضَانَ– رواه البخارى)

নবী করীম (সাঃ) ছিলেন সবচেয়ে বেশী দানশীল আর তিনি রমজানেই বেশী দান করতেন।

২। বেশী করে কোরআন পাঠ করা উত্তম।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হযরত জিবরাঈল (আঃ) রমজানে প্রতিদিন নবী করীম (সাঃ) এর সাথে সাক্ষাত করতেন –

اَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ–

এবং তাঁকে কোরআনের দারস দিতেন। আর তাঁর ইন্তেকালের বৎসর তিনি রমজানে দু'বার দারস দিয়েছেন। (বোখারী)

দারসের অর্থঃ জিবরাঈল (আঃ) কোরআনের কিছু আয়াত পড়তেন। অতঃপর নবী করীম (সাঃ) ঐ আয়াতগুলো জিবরাঈল (আঃ) এর সামনে আবার পড়তেন।

৩। রোযাদারকে ইফতার করানো।

হযরত যায়েদ বিন খালেদ জুহনী (রাঃ) বলেন, তিনি নবীজী থেকে বর্ণনা করে বলেছেন–

مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِهِ غَيْرَ اَنَّهُ لاَ يَنْقِصُ مِنْ اَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا– (رواه احمد واتمذى)

যে ব্যক্তি রোযাদারকে ইফতার করাল, রোযাদারের সমানই তার ছওয়াব হল। তবে রোযাদারের ছওয়াব থেকে কোন কম হবে না। (তিরমিযী, আহ্মাদ)

৪। রমজানে বেশী করে ইস্তেগফার করা উচিত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তায়ালা রমজানের প্রত্যেক রাতে এক আহ্বান কারী পাঠান। সে তিনবার আহবান করে–

هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَاُعْطِيْهِ سُئُوْلَهُ ؟ هَلْ مِنْ تَائِبٍ فَاَتُوْبُ عَلَيْهِ ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَاَغْفِرْلَهُ– (رواه ابن حبان والبيهقى)

কেউ কি কিছু চাইবে? আমি তাকে দিয়ে দেব। কোন ব্যক্তি কি তাওবা করবে? আমি তার তাওবা কবুল করব। কোন ক্ষমা প্রার্থণাকারী কি আছে? আমি তাকে ক্ষমা করে দেব।

৫। বেশী করে আল্লাহর যিকর ও দোয়া করা উত্তম।

নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, ইফতারের সময় রোযাদারের দোয়া ফিরত হয় না।

নবী করীম (সাঃ) আরও বলেছেন–

اَفْضَلُ الدُّعَاءِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ– (رواه ابن ماجة والنسائ)

উত্তম দোয়া হল, আল্লাহর প্রশংসা। (ইবনে মাজাহ্, নাসাঈ)

নফল রোযা

১। মুহাররাম মাসের দশ তারিখ (আশুরার) রোযা রাখা সুন্নাত।

হযরত মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (সাঃ) কে বলতে শুনেছি–

اِنَّ هٰذَا يَوْمُ عَشُوْرَةٍ وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ صَوْمُهُ وَاَنَا صَائِمٌ، فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ– (متفق عليه)

নিশ্চয়ই এটা আশুরার দিন। এ দিনের রোযা তোমাদের উপর ফরয করা হয়নি। আমি রোযা রেখেছি। যার ইচ্ছা সে রোযা রাখুক এবং যার ইচ্ছা ইফতার করুক। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

হযরত আবু কাতাদাহ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) কে আশুরার রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল, তিনি বললেন–

يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ– (رواه مسلم) বিগত এক বৎসরের পাপ মাফ করা হবে।

২। আরাফার দিন রোযা রাখা মুস্তাহাব।

হযরত আবু কাতাদাহ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) কে আরাফার দিনের রোযার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল, তিনি বললেন–

يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَ الْبَا قِيَةَ– (رواه مسلم)

গত বৎসর এবং আগামী বৎসরের পাপ মাফ করা হবে।

৩। শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযা রাখা মুস্তাহাব। একাধারে হোক বা মাঝে মাঝে হোক।

হযরত আবু আইয়ুব (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

مَنْ صَامَ رَمْضَانَ ثُمَّ اَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ–

যে ব্যক্তি রমজানের রোযা রাখল, অতঃপর শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযা রাখল তার সারা বৎসর রোযা রাখা হল। (মুসলিম)

স্মরণীয় যে, নেকী এক দশ হয়। তাই রমজানের ত্রিশ দিনে হল, ৩০×১০ = ৩০০দিন। আর শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযা রাখলে হবে ৬×১০ = ৬০দিন। মোট হবে ৩৬০ দিন-তথা পূর্ণ এক বৎসর।

৪। সোমবার ও বৃহস্পতিবারে রোযা রাখা মুস্তাহাব।

হযরত আবু কাতাদাহ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) কে সোমবারে রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বললেন–

ذَلِكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيْهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ اَوْ اُنْزِلَ عَلَىَّ فِيْهِ– (رواه مسلم)

ঐ দিনই আমি জন্ম গ্রহণ করেছি এবং ঐ দিনই আমি প্রেরিত হয়েছি অথবা বলেছেন, আমার প্রতি ওহী করা হয়েছে। (মুসলিম)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

تُعْرَضُ الاَعْمَالُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ فَاُحِبُّ اَنْ يُعْرَضَ عَمَلِىْ وَ اَنَا صَائِمٌ– (رواه الترمذى)

সোমবার ও বৃহস্পতিবারে সকল আমল (আল্লাহর নিকট) পেশ করা হয়। তাই আমি পছন্দ করি যে, রোযা অবস্থায় আমার আমল যেন পেশ করা হয়। (তিরমিযী)

৫। প্রত্যেক মাসে তিন দিন রোযা রাখা মুস্তাহাব।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

صَوْمُ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ (متفق عليه)

প্রত্যেক মাসে তিন দিন রোযা রাখা, সারা বৎসর রোযা রাখা হয়। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

স্বরণীয় যে, নেকী একে দশ হয়। তাই তিন দিনে রোযা হয়, (৩×১০=৩০) ত্রিশ দিন। এমনি প্রত্যেক মাসে তিন দিন রোযা রাখলে সারা বসরই রোযা রাখা হয়ে যায়।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেছেন–

اَوْ صَانِىْ خَلِيْلِىْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّم بِثَلاَثٍ، صِيَامُ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَ رَكْعَتَىِ الضُّحى وَاَنْ اُوْ تِرَ قَبْلَ اَنْ اَنَامَ–

আমার বন্ধু (সাঃ) আমাকে তিনটি ওসীয়ত করেছেন। প্রত্যক মাসে তিন দিন রোযা রাখতে, যোহার সময় দু'রাকায়াত নামায পড়তে এবং নিদ্রার পূর্বে বিতর নামায পড়তে। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

হযরত আবু যর (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

اِذَا صُمْتَ مَنَ الشَّهْرِ ثَلاَثًا فَصُمْ ثَلاَثَ عَشَرَةَ وَ اَرْبَعَ عَشَرَةَ وَخَمْسَ عَشَرَةَ– (رواه الترمذى وقال حديث حسن)

যদি প্রত্যেক মাসে তিন দিন রোযা রাখ তাহলে মাসের তের, চৌদ্দ ও পনর তারিখ রোযা রাখবে। (তিরমিযী)

হযরত কাতাদাহ্ বিন মিলহান (রাঃ) বলেন, নবীজী আমাদেরকে আদেশ করতেন, আইয়ামে বিজ তথা মাসের তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখ রোযা রাখতে। (আবু দাউদ)

৬। হযরত দাউদ (আঃ) এর মত রোযা রাখা মুস্তাহাব।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

اَحَبُّ الصِّيَامِ اِلَى اللّٰهِ صِيَامُ دَاوُدَ وَاَحَبُّ الصَّلَاةِ اِلَى اللّٰهِ صَلَاةُ دَاوُدَ، كَانَ يَنَامُ نِصْفَهُ وَيَقُوْمُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَكَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا–

আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় রোযা হল হযরত দাউদ (আঃ) এর ন্যায় রোযা এবং আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় নামায হল দাউদ (আঃ) এর ন্যায় নামাজ। তিনি অর্ধেক রাত ঘুমাতেন এবং এক তৃতীয়াংশ রাত নামায পড়তেন। অতঃপর এক ষষ্টাংশ রাত ঘুমাতেন। তিনি এক দিন রোযা রাখতেন এবং এক দিন ইফতার করতেন। (আহ্মাদ)

৭। মুহাররাম মাসে রোযা রাখা মুস্তাহাব। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

اَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمْضَانَ شَهْرُ الْمُحَرَّمِ وَاَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ– (رواه مسلم)

রমজানের পর সব চেয়ে উত্তম রোযা হল, মুহাররাম মাসের রোযা এবং ফরয এবং ফরয নামাযের পর সব চেয়ে উত্তম নামায হল রাতের নামায। (মুসলিম)

৮। শা'বান মাসের প্রথম পনের দিনে রোযা রাখা মুস্তাহাব। আর শা'বান মাসের শেষ পনের দিন রোযা রাখতে নিষেধ করা হয়েছে।

হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) শা'বান মাস থেকে বেশী রোযা অন্য কোন মাসে রাখতেন না। তিনি শা'বান মাস পুরোটাই রোযা রাখতেন।

নফল রোযা ভঙ্গ করা জায়েয

হযরত উম্মে হানী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) মক্কা বিজয়ের দিন তাঁর গৃহে প্রবেশ করলেন। শরবত দেওয়া হল। নবী করীম (সাঃ) পান করে উম্মে হানীকে দিলেন। তিনি বললেন, আমি রোযাদার। নবী করীম (সাঃ)বললেন–

اِنَّ الْمُتَطَوِّعَ اَمِيْرٌ عَلَى نَفْسِه، فَاِنْ شِئْتِ فَصُوْمِىْ وَاِنْ شِئْتِ فَافْطِرِىْ–

নফলকারী স্বীয় প্রবৃত্তির নেতা। তুমি চাইলে রোযা রাখতে পার এবং চাইলে ইফতার করতেও পার। (আহ্মাদ, দারে কুতনী)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (সাঃ) এর জন্য খানা তৈরী করলাম। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে সাথে নিয়ে এলেন। খানা পেশ করা হলে একজন বললো, অমি রোযাদার। নবী করীম (সাঃ) বললেন, তোমাদের এ ভাই তোমাদেরকে দাওয়াত করছেন এবং তোমাদের জন্য কষ্ট করে খানা তৈরী করেছেন–

اَفْطِرْ وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ اِنْ شِئْتِ- (رواه البيهقى)

ইফতার করে নাও এবং চাইলে এর পরিবর্তে অন্য এক দিন রোযা রেখ। (বায়হাকী)

হযরত আবু হুজাইফা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) হযরত সালমান ফার্সী এবং হযরত আবু দারদা (রাঃ) এর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন গড়ে দেন। হযরত সালমান (রাঃ) আবু দারদা (রাঃ) কে দেখতে গেলেন। দেখলেন উম্মে দারদা জীর্ণাবস্থায় আছেন। তিনি জানতে চাইলেন, তোমার এ অবস্থা কেনো? তিনি বললেন, তোমার ভাই আবু দারদার তো দুনিয়ার কোন প্রয়োজন নেই। এমন সময় আবু দারদা এলেন। খানা পেশ করা হল, আবু দারদা বললেন, খাও, আমি রোযাদার। সালমান (রাঃ) বললেন–

مَا اَنَا بِاٰكِلٍ حَتّٰى تَاْكُلَ فَاَكَلَ- তুমি না খেলে আমি খাব না। তখন তিনি খেলেন।

রাত হল, আবু দারদা নামাযে দাঁড়াতে চাইলেন, হযরত সালমান (রাঃ) বললেন, যাও ঘুমাও। তিনি গিয়ে ঘুমালেন। তিনি আবার নামায পড়তে চাইলেন। সালমান (রাঃ) বললেন, যাও আরো ঘুমাও। যখন শেষ রাত হল, তখন সালামান (রাঃ) বললেন, এখন উঠে নামায পড়। তখন দুইজন নামায পড়লেন। অতঃপর তিনি বললেন–

اِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِاَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَاَعْطِ كُلَّ ذِىْ حَقٍّ حَقَّهُ-

নিশ্চয়ই তোমার উপর রয়েছে তোমার প্রভুর হক, তোমার নিজের হক এবং তোমার পরিবারের হক। সুতরাং প্রত্যেক হকদারের হক আদায় কর। অতঃপর আবু দারদা (রাঃ) এ কথা নবী করীম (সাঃ) এর নিকট বর্ণনা করলেন। নবী করীম (সাঃ) বললেন–

صَدَقَ سَلْمَانُ- সালমান সত্যই বলেছে। (বোখারী, তিরমিযী)

আল-এ'তেকাফ

এ'তেকাফ ও এর প্রচলন

এ'তেকাফ শব্দের অর্থ থামা এবং বন্দী হয়ে থাকা।

আর শরীয়তের ভাষায় এ'তেকাফ হল, নিয়তসহ মসজিদে থেমে থাকা।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–

وَلاَ تُبَاشِرُوْ هُنَّ وَاَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ فِى الْمَسَاجِدِ-

তোমরা মসজিদে এ'তেকাফ করা অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে মিলা-মে ' করো না। (সূরা বাকারা)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন-

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يَعْتَكِفُ فِيْ كُلِّ رَمْضَانَ عَشَرَةَ اَيَّامٍ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ قُبِضَ فِيْهِ اِعْتَكَفَ عِشْرِيْنَ يَوْمًا-

নবী করীম (সাঃ) প্রত্যেক রমজানে দশ দিন এ'তেকাফ করতেন। আর ইন্তেকালের বৎসর তিনি বিশ দিন এ'তেকাফ করেছেন। (বোখারী, আবু দাউদ)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন-

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الاَوَاخِرَ مِنْ رَمْضَانَ حَتَّى قَبَضَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ-

নবী করীম (সাঃ) রমজানের শেষে দশ দিন এ'তেকাফ করতেন, আল্লাহ তালা তাকে ওফাত দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। (আহ্‌মাদ, তিরমিযী)

এ'তেকাফের জন্য রোযা রাখা জরুরী নয়। তবে রোযা রাখা ভাল। ইযরত ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেনে-

لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ اِلاَّ اَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ- (البيهقى، حاكم)

এ'তেকাফকারীর উপর কোন রোযা নেই। তবে যদি সে রাখে, (তো ভাল)।

এ'তেকাফের ফজিলত

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন-

اِنَّ لِلْمَسَاجِدِ اَوْتَدًا، اَلْمَلاَئِكَةُ جُلَسَاءُ هُمْ، وَاِنْ غَابُوْا يَفْتَقِدُوْهُمْ، وَاِنْ مَرِضُوْا عَادُوْهُمْ وَاِنْ كَانُوْا فِيْ حَاجَةٍ اَعَانُوْ هُمْ-(رواه احمد والحكم)

নিশ্চয়ই মসজিদের বহু কীলক রয়েছেন, ফিরিশতাগণ তাদের সাথে বসেন। তারা অনুপস্থিত হলে ফেরেশতাগণ তাদেরকে তালাশ করেন। তারা অসুস্থ হলে ফিরিশতাগণ তাদেরকে সেবা যত্ন করেন এবং তাদের প্রয়োজন হলে ফিরিশতাগণ তাদেরকে সাহায্য করেন।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেছেন, আমি নবী করীম (সাঃ) কে বলতে শুনেছি-

اَلْمَسْجِدُ بَيْتُ كُلِّ تَقِيِّ وَتَكَفَّلَ اللّٰهُ لِمَنْ كَانَ الْمَسْجِدُ بَيْتَهُ بِالرَّوْحِ وَالرَّحْمَةِ

وَالْجَوَازِ عَلَى الصِّرَاطِ اِلى رِضْوَانِ اللّٰهِ اِلى الْجَنَّةِ– (اخرجه الطبران فى الكبير والاوسط والبراز وقال رجاله صحيح)

মসজিদ হল প্রত্যেক পরহেজগারের ঘর। যে ব্যক্তি মসজিদকে তার ঘর হিসাবে গ্রহণ করল, আল্লাহ তা'য়ালা তার তত্ত্বাবধায়ক হয়ে যান এবং রহমত ও সন্তুষ্টির মাধ্যমে পুলসিরাত পার করে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। (তিবরাণী)

এ'তেকাফের হুকুম

ইমাম আহমদ ও ইমাম শাফী (রাহঃ) এর মতানুসারে রমজান মাসে এ'তেকাফ করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। আর রমজানের শেষ দশ দিন এ'তেকাফ করার তাকীদ আরো বেশী।

ইমাম আবু হানীফা (রাহঃ) এর মতানুসারে রমজান মাসের শেষ দশ দিন এ'তেকাফ করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা কেফায়া। অর্থাৎ কিছু লোক এ'তেকাফ করলে সমস্ত মহল্লার পক্ষ থেকে সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। আর কেউ এ'তেকাফ না করলে সকলেরই পাপ হবে।

আর ইমাম মালিক (রাহঃ) এর মতানুসারে রমজান মাসে এ'তেকাফ করা মুস্তাহাব।

আর রমজান ব্যতিত অন্য যে কোন দিন এ'তেফাক করা মুস্তাহাব।

নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

مَنْ كَانَ اِعْتَكَفَ مَعَى فَلْيَعْتَكِفُ اَلْعَشْرَ الاَوَاخِرَ– (البخارى)

যে ব্যক্তি আমার সাথে এ'তেকাফ করতে চায়, সে যেন রমজানের শেষ দশ দিন এ'তেকাফ করে। (বোখারী)

এ'তেকাফ তিন প্রকার

১। এ'তেকাফের মান্নাত করলে, তা আদায় করা ওয়াজিব।

২। রমজান মাসে এ'তেকাফ করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা।

৩। রমজান ছাড়া অন্য যে কোন দিন এ'তেকাফ করা মুস্তাহাব।

এ'তেকাফের শর্ত সমুহ

১। ইসলাম, তাই অমুসলিমের এ'তেকাফ সহীহ নয়।

২। বুদ্ধি হওয়া, তাই পাগল ও বিবেচনা বিহীন শিশুর এ'তেকাফ সহীহ নয়।

৩। এমন সমজিদ হবে, যেখানে ইমাম নির্দিষ্ট আছেন। তাই যে সমজিদে কোন ইমাম নির্দিষ্ট নেই, সেই মসজিদে এ'তেকাফ সহীহ নয়।

৪। হায়েজ, নেফাস এবং জানাবাত থেকে পাক হওয়া।

হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

وَجِّهُوْا هٰذِهِ الْبُيُوْتَ عَنِ الْمَسْجِدِ فَاِنِّىْ لَاُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا لِجُنُبٍ- رواه ابوداؤد والبخارى وابن خزيمة)

এ সব গৃহকে মসজিদের দিক থেকে ফিরিয়ে দাও। কারন, হায়জা ও জানাবাত ওয়ালা ব্যক্তির জন্য আমি মসজিদকে হালাল করিনি।

৫। মহিলার জন্য স্বামীর অনুমতি থাকা। তাই বিনা অনুমতিতে স্ত্রীর এ'তেফাকে সহীহ নয়।

৬। ইমাম আবু হানাফী (রাহঃ) এর মতানুসারে নিয়ত করা শর্ত।

এ'তেকাফের রুকুন

এ'তেকাফের রুকুন দুটিঃ

১। নিয়ত করা। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন-

اِنَّمَا الاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ- (رواه البخارى) নিয়ত দ্বারাই আমলসমূহ সহীহ হয়।

২। জামাতে নামাজ হয়, এমন মসজিদে এ'তেকাফ করা। অর্থাৎ যে মসজিদে নির্দিষ্ট ইমাম আছেন এবং নিয়মিত জামাত কায়েম হয়, সেই মসজিদেই এ'তেকাফ করতে হবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-

وَلَا تُبَاشِرُوْ هُنَّ وَاَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ فِى الْمَسَاجِدِ-

মসজিদে এ'তেকাফ করা অবস্থায় স্ত্রীর সাথে মেলা-মেশা করো না। (সূরা বাকারা)

এ'তেকাফের সময় কাল

এ'তেকাফের সর্বনিম্ন সময় হল, এক মুহূর্ত। আর বেশী সময়ের কোন সীমা নির্ধারিত নেই। যত দিন ইচ্ছা করা যাবে।

ইমাম মালেক (রাহঃ) এর মতানুসারে কম সময় হল, এক দিন ও এক রাত। আর বেশী সময়ের কোন সীমা নেই।

যে সব কাজে এ'তেকাফ ফাসেদ হয়

১। স্ত্রী-সহবাস করলে এ'তেকাফ ফাসেদ হয়। স্ত্রীকে চুমু দিলে কিংবা স্ত্রীর সাথে মিশলে এ'তেকাফ ফাসেদ হবে না। তবে মনি বের হলে এ'তেকাফ ফাসেদ হয়ে যাবে।

২। মসজিদ থেকে বের হলে এ'তেকাফ ফাসেদ হয়।

মসজিদ থেকে বের হওয়ার দুটি অবস্থা

(এক) এ'তেকাফ যদি ওয়াজিব হয়, তবে বিনা ওযরে মসজিদ থেকে বের হলে এ'তেকাফ বাতিল হয়ে যাবে।

আর ওযর হল তিন প্রকার। (ক) প্রশাব-পায়খানা এবং জনাবাতের গোসলের জন্য বের হওয়া। এটা জায়েয। (খ) জুম্মার নামাজের জন্য বের হওয়া। এটাও জায়েয। (গ) যদি মসজিদে অবস্থান করা ভয়ের কারন হয়, তবে বের হওয়া জায়েয।

(দুই) এ'তেকাফ যদি সুন্নাত বা নফল হয় তবে বিনা ওযরে বের হওয়া জায়েয। কারন, এ'তেকাফের সর্বনিম্ন সময় হল, এক মূহুর্ত যখন সে বের হল, তখন তার এ'তেকাফ শেষ হয়ে গেল। যখন ফিরে আসবে, তখন থেকে নতুন এ'তেকাফ আরম্ভ হবে। তবে এ'তেকাফকারীর জন্য সুন্নাত হল, বিনা ওযরে মসজিদ থেকে বের না হওয়া।

৩। পাগল হলে কিংবা হায়জ বা নেফাস হলে এ'তেকাফ বাতিল হয়ে যায়।

৪। এ'তেকাফকারী মূর্তাদ হলে এ'তেকাফ বাতিল হয়ে যাবে।

যে সব কাজে এ'তেকাফ মাকরূহ হয়

১। এতেকাফ অবস্থায় সর্বক্ষণ নীরব থাকা বরং তাসবীহ, তাহলীল ও তাকবীর বলা এবং কোরআন তিলায়াত করা মুস্তাহাব।

২। এ'তেকাফ আবস্থায় মসজিদের বারান্দায় গিয়ে পানাহার করা মাকরূহ।

৩। এ'তেকাফ অবস্থায় শিংগা লাগানো মাকরূহ।

৪। এ'তেকাফ অবস্থায় বেশী বেশী লেখা পড়ায় মগ্ন হওয়া মাকরূহ।

৫। এতেকাফ অবস্থায় অনর্থক কাজ ও কথায় ব্যস্ত হওয়া মাকরূহ।

এ'তেকাফের কাজা

কেউ যদি এ'তেকাফের নিয়ত করে এবং কোন কারনে এ'তেকাফ করতে না পারে, তা হলে ক্বাজা আদায় করা মুস্তাহাব।

হযরত আবু আইয়ুব (রাঃ) বলেন-

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَسَافَرَ سَنَةً فَلَمْ يَعْتَكِفُ، فَلَمَّا كَانَ فِى الْعَامِ الْمُقْبِلِ اِعْتَكَفَ عِشْرِيْنَ يَوْمًا- (ابوداؤد وابن ماجة)

নবী করীম (সাঃ) রমজানের শেষ দশ দিন এ'তেকাফ করতেন। এক বৎসর তিনি সফরে ছিলেন, তাই এ'তেকাফ করতে পারেননি। পরবর্তী বৎসর তিনি বিশ দিন এ'তেকাফ করেছেন। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ্)

হজ্জ্ব অধ্যায়

হজ্জ্ব কি?

হজ্জ্ব আরবী শব্দ এবং এর অর্থ হলো ইরাদা করা।

ইসলামী শরীয়াতের ভাষায় হজ্জ্ব হলো, নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পবিত্র স্থানসমূহ জিয়ারত করার উদ্দেশ্যে মক্কা যাবার ইরাদা করা। অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশ পালন করার লক্ষ্যে কা'বাঘর তাওয়াফ, সাফা ও মারওয়ায় সা'ঈ এবং আরাফার ময়দানে অবস্থান ইত্যাদি কাজ সমূহ নির্দিষ্ট সময়ে আদায়ের উদ্দেশ্যে মক্কা যাবার ইরাদা করা।

হজ্জ্বের আদেশ

সামর্থ্যবান যারা তাদের ওপর হজ্জ্ব আদায় করা ফরজ। জীবনে একবার হজ্জ্ব আদায় করা ওয়াজিব। আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন−

وَ لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً−

আর এ ঘরের হজ্জ্ব করা হল মানুষের উপর আল্লাহর প্রাপ্য, যার সামর্থ্য আছে এ পর্যন্ত পৌছার। (সূরা ইমরাণ)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) এক খুতবায় বলেছেন−

يَا اَيُّهَا النَّاسُ، اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحَجُّوْا فَقَالَ رَجُلٌ أَ كُلَّ عَامٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، فَسَكَتَ حَتّٰى قَالَهَا ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ لَوْقُلْتُ نَعَمْ لَوَ جَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ− (متفق عليه)

হে মানব-মণ্ডলী। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর হজ্জ্ব ফরয করেছেন, তোমরা হজ্জ্ব কর। এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসুল (সাঃ)! প্রত্যেক বৎসর কি হজ করতে হবে? নবী করীম (সাঃ) নীরব রইলেন। সে এ কথা তিনবার জিজ্ঞাসা করল। অতঃপর নবী করীম (সাঃ) বললেন, আমি যদি হ্যাঁ বলতাম, তাহলে ওয়াজিব হয়ে যেত, আর তোমরা তা আদায় করতে পারতে না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সঃ) এক খুতবায় বলেছেন−

يَا اَيُّهَا النَّاسُ، اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحَجُّوْا فَقَالَ الاقْرَعُ بْنِ حَابِسٍ أَ فِىْ كُلِّ عَامٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، فَقَالَ لَوْقُلْتُهَا لَوَجَبَتْ وَ لَوْ وَجَبَتْ لَمْ تَعْمَلُوْا وَ لَمْ تَسْتَطِيْعُوْا، اَلْحَجُّ مَرَّةٌ فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوَّعُ−

হে মানব মণ্ডলী! আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর হজ্জ্ব ফরয করেছেন, সুতরাং তোমরা হজ্জ্ব

কর। হযরত আক্‌রা বিন হাবিছ (রাঃ) বল্লেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)। প্রত্যেক বৎসর কি হজ্ব করা ফরয? নবী করীম (সাঃ) বললেন, আমি যদি হ্যাঁ বলতাম তাহলে ওয়াজিব হয়ে যেত। আর তোমরা তা আদায় করতে পারতে না। হজ্ব একবারই করা ফরয আর যে ব্যক্তি বেশী করবে, তা হবে নফল। (আবু দাউদ, আহ্‌মাদ, নাসাঈ, হাকেম)

হজ্ব আদায়ে দেরী করা

ইমাম শাফী, ছাওরী এবং ইমাম আওযায়ী (রাহঃ) এর মতানুসারে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত জীবনের যে কোন মূহুর্তে হজ্ব আদায় করা জায়েজ। কারন, হজ্ব ফরয হয়েছে ষষ্ঠ হিজরীতে। আর নবী করীম (সাঃ) হজ্ব আদায় করেছেন দশম হিজরীতে। হজ্ব ওয়াজিব হওয়া মাত্র যদি আদায় করা জরুরী হত, তাহলে নবী করীম (সাঃ) হজ্ব আদায়ে দেরী করতেন না।

আর ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক এবং ইমাম আহমাদ (রাহঃ) এর মতানুসারে হজ্ব ফরয হওয়া মাত্র তাড়াতাড়ি হজ্ব আদায় করা ওয়াজিব।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

مَنْ اَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَعْجَلْ فَاِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيْضَ وَتَضِلُّ الرَّاحِلَةُ وَتَكُوْنُ الْحَاجَةُ– (رواه احمد والبيهقى وابن ماجة والطحاوى)

যে ব্যক্তি হজ্বের ইচ্ছা করল, তার উচিত তাড়াতাড়ি আদায় করা। কারন, হয়তঃ সে অসুস্থ হয়ে যাবে, তার যানবাহন হারিয়ে যাবে এবং অন্য প্রয়োজনে মগ্ন হয়ে যাবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

تَعَجَّلُوْا الْحَجَّ (يعنى الفريضة) فَاِنَّ اَحَدَكُمْ لاَيَدْرِىْ مَايُعْرَضُ لَهُ مِنْ مَرَضٍ اَوْ حَاجَةٍ–

ফরয হজ্ব তাড়াতাড়ি আদায় কর। কারন, তোমাদের মধ্যে কেউ জানে না যে, তার কি অসুবিধা সৃষ্টি হবে, রোগ অথবা অন্য কোন প্রয়োজন। (আহ্‌মাদ, বায়হাকী)

ইসলামে হজ্বের গুরুত্ব

হজ্ব হল ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটি রুকুন। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

بُنِىَ الاِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةِ اَنْ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدً وَرَسُوْلُهُ وَاِقَامُ الصَّلٰوةِ وَ اِيْتَاءُ الزَّكَاةِ وَصِيَامِ رَمْضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ اِنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً–

ইসলামের ভিত্তি হল পাঁচটি স্তম্ভের উপর। সাক্ষ্যদান করা যে, আল্লাহ্ ব্যতিত অন্য কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর রাসুল। নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, রমজান মাসে রোযা রাখা এবং সামর্থ থাকলে হজ্ব করা। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ اِلَى بَيْتِ اللّٰهِ وَلَمْ يَحُجَّ فَلاَ عَلَيْهِ اَنْ يَمُوْتَ يَهُوْدِيًا اَوْ نَصرَانِيًا وَ ذَلِكَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى، وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً– (رواه الترمذى)

যে ব্যক্তি পথ-চলার পাথেয় এবং যানবাহনের মালিক হয়, যা দ্বারা সে আল্লাহর গৃহ পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষমে, আর সে হজ্ব করল না, সে ইহুদী বা খৃষ্টান হয়ে মৃত্যুবরন করুক। কারণ, আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'এ ঘরের হজ্ব করা হল আল্লাহর হক, যার সামর্থ্য আছে এ পর্যন্ত পৌছার।' (তিরমিযী)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

اَلْحَاجُّ وَالْعُمَّارُ وَفْدُ اللّٰهِ اِنْ دَعَوْهُ اَجَابَهُمْ وَاِنِ سْتَغْفَرُوْهُ غَفَرَ لَهُمْ–

হাজীগণ এবং উমরা আদায়কারীরা হলেন আল্লাহর মেহমান। তারা যখন দোয়া করেন, আল্লাহ তা কবুল করেন এবং তারা যখন ক্ষমা প্রার্থনা করেন, আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। (ইবনে মাজাহ্)

হযরত উমার (রাঃ) বলেছেন, আমি ইচ্ছা করেছি, সমগ্র মুসলিম জগতে দূত পাঠাব যে–

اَنَّ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ جِدَّةٌ وَلَمْ يَحُجَّ اَنْ يَضْرِبَ عَلَيْهِمْ ضَرِبَةٌ مَاهُمْ بِمُسْلِمِيْنَ، مَاهُمْ بِمُسْلِمِيْنَ–

ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি হজ্ব করল না, তার উপর জিজিয়া ধার্য করা হোক। এরা মুসলমান নয়, এরা মুসলমান নয়।

হজ্ব হলো বিশ্ব মুসলিম সম্মেলন, হজ্বের সময় সমগ্র পৃথিবী থেকে মুসলমানগণ এসে আরাফার মাঠে সমবেত হন। মহানবীর বিদায়ী ভাষনের অনুসরণ করে আরাফার দিন যে ভাষন দেওয়া হয়, তা মানুষের আকীদা ও চরিত্র গঠনে বিরাট ভূমিকা পালন করে থাকে। অধিকন্তু বিভিন্ন দেশের মুসলমানগণ পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান করতে সক্ষম হন।

হজ্ব হল ত্যাগ ও কুরবানীর ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। হযরত ইবরাহীম (আঃ) ইসমাইল (আঃ) এবং হযরত হাজেরার অনুগত্য ও কুরবানীর নিদর্শন সমুহ হজ্বের মাধ্যমে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়।

হজ্বের ফজিলত

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসুল (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হল, কোন আমলটি সব চেয়ে ভাল? নবী করীম (সাঃ) বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ঈমান আনা। আবার জিজ্ঞাসা করা হল, অতঃপর কোন আমল? নবী করীম (সাঃ) বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা। এরপর আবার জিজ্ঞাসা করা হল, অতঃপর কোন আমল? নবী করীম (সাঃ) বললেন, হজ্জে মাবরুর (পছন্দনীয় ও কবুল হজ্ব)। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

মাবরুর হজ্ব অর্থাৎ মাকবুল হজ্ব। যে হজ্বের সাথে কোন পাপ কাজের মিশ্রণ হয় না, তা-ই মাকবুল হজ্ব।

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (সাঃ) কে বলতে শুনেছি–

مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ– (متفق عليه)

যে ব্যক্তি হজ্ব করল এবং সে সময় স্ত্রী সহবাস অথবা অন্য কোন পাপ কর্ম করল না, সে এমন ভাবে (নিষ্পাপ) হয়ে প্রত্যাবর্তন করল যেন, তার মা তাকে জন্ম দিয়েছেন।

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, দুই উমরার মধ্যবর্তী পাপ সমুহ ক্ষমা করা হয়–

وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءَ اِلاَّ الْجَنَّةَ– (متفق عليه)

আর মাকবুল হজ্বের প্রতিদান হল এক মাত্র জান্নাত। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (সাঃ) কে বললাম, উত্তম আমল হল জিহাদ করা। আমরা কি জিহাদ করব না? নবী করীম (সাঃ) বললেন–

وَلَكِنْ اَفْضَلُ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ– (رواه البخارى)

কিন্তু উত্তম জেহাদ হল মাক্‌বুল হজ্ব। (বোখারী)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

جِهَادُ الْكَبِيْرِ وَالضَّعِيْفِ وَالْمَرْأَةِ اَلْحَجُّ– (النسائ بسند حسن)

বৃদ্ধ, দূর্বল এবং নারীর জেহাদ হল হজ্ব। (নাসাঈ)

হযরত আমর বিন আস (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (সাঃ) এর নিকট এসে বললাম হে নবী! আপনার হাত দিন, আমি বায়াত করব। তিনি হাত দিলেন, তখন আমি হাত গুটিয়ে নিলাম। নবী করীম (সাঃ) বললেন, হে আমর কি হল?

আমি বললাম, আমি শর্ত করতে চাই। তিনি বললেন, যা ইচ্ছা শর্ত কর। আমি বললাম, আল্লাহ যেন আমাকে ক্ষমা করে দেন। নবী করীম (সাঃ) বললেন–

اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ الاِسْلاَمَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَاَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَاكَانَ قَبْلَهُ وَاَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَاكَانَ قَبلهُ- (رواه مسلم)

তুমি কি জান না যে, ইসলাম পূর্বের সকল পাপ মিটিয়ে দেয়, হিজরত পূর্বের সকল পাপ মিটিয়ে দেয় এবং হজ্বও পূর্বের সকল পাপ মিটিয়ে দেয়। (মুসলিম)

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্নিত। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

تَابِعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَاِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوْبَ كَمَا يُنْفِى الْكِيْرُ خَبْثَ الْحَدِيْدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجِّ الْمَبْرُوْرِ ثَوَابٌ اِلاَّ الْجَنَّةَ-

হজ্ব ও উমরার মধ্যে বারি করে নাও। (অর্থাৎ এক বৎসর হজ্ব ও পরের বৎসর উমরা কর)। কারন হজ্ব ও উমরা দারিদ্রতা দূর করে এবং পাপ সমুহ মুছে দেয়, যেমন কর্মকার লোহা, সোনা ও রূপার ময়লা দূর করে থাকে। আর মাক্‌বুল হজ্বের এক মাত্র সাত্তয়াব হল জান্নাত। (তিরমিযী, নাসাঈ)

হযরত বুরাইদা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

اَلنَّفْقَةُ فِى الْحَجِّ كَالنَّفْقَةِ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالدِّرْهَمُ بِسَبْعِمَائَةِ ضِعْفٍ-

হজ্বের ব্যয়, আল্লাহর পথে জিহাদের ব্যয় এর সমতুল্য। এক দিরহামে সাত শত গুণ বেশী সাত্তয়াব হয়। (আহ্‌মাদ, তিবরাণী, বায়হাকী, ইবনে আবী শুয়াইবা)

হজ্বের বিভিন্ন কাজের সাওয়াব

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) বলেছেন, আমি নবী করীম (সাঃ) এর নিকট মিনার মসজিদে বসে ছিলাম। এমন সময় এক আন্‌সারী এবং ছকীফ গোত্রের এক ব্যক্তি আসলেন। তারা সালাম করে বললেন, হে রাসুল! আমরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে এসেছি। নবী করীম (সাঃ) বললেন, তোমরা চাইলে আমি বলে দেব, তোমরা কি জিজ্ঞাসা করতে এসেছো। আর না চাইলে তোমরাই জিজ্ঞাসা করো। তখন আনছারী বললেন, হে রাসুল! আপনি বলুন, আমরা জিজ্ঞাসা করতে এসেছি। নবী করীম (সাঃ) বললেন, তোমরা জিজ্ঞাসা করতে এসেছো যে, হজ্বের উদ্দেশ্যে কা'বাগৃহের দিকে যাত্রা করলে, তাতে কি সাওয়াব রয়েছে? কাবা গৃহ তাওয়াফ করে দুই রাকআত নামায পড়লে কি সাওয়াব রয়েছে? সাফা ও মারওয়া মধ্যবর্তী স্থানে সাঈ করলে কি সাওয়াব রয়েছে? আরাফাতে অবস্থান করলে কি সাওয়াব রয়েছে? পাথর নিক্ষেপে কি সাওয়াব? কুরবানী করলে কি সাওয়াব এবং মাথা মুণ্ডন করলে কি সাওয়াব? তাওয়াফে এফাজায় কি সাওয়াব রয়েছে?

তখন আনসারী বললেন, সেই সত্ত্বার শপথ! যিনি আপনাকে সত্য (হক) দিয়ে পাঠিয়েছেন। নিশ্চয়ই আমরা এসব কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছি। নবী করীম (সাঃ) বললেন, তুমি যখন

ক্বাবা গৃহের দিকে রওয়ানা হয়েছো, তখন তোমার উটনি যত কদম চলেছে, প্রত্যেকটি কদমের বিনিময়ে একটি নেকী লিখা হয়েছে এবং একটি পাপ মুছে দেয়া হয়েছে। আর তাওয়াফ করে দুই রাকাআত নামায পড়া, একটি কৃতদাস আযাদ করার সমান। আর সাফা ও মারওয়াতে সাঈ করা সত্তরটি কৃতদাস আযাদ করার সমান। আর আরাফাতে অবস্থান কালে আল্লাহ্ তায়ালা নিকটস্থ আসমানে অবতরণ করেন এবং ফেরেশতাদের নিকট তোমাদেরকে নিয়ে গৌরব করেন এবং বলেন, 'আমার বান্দাগন! আমার নিকট এসেছে আমার জান্নাতের উদ্দেশ্যে। তোমাদের পাপ যদি বালুকনার সমান হয়, অথবা বৃষ্টি ফোটার সমান হয় কিংবা সমুদ্রের ফেনার সমান হয়, আমি তা ক্ষমা করে দিলাম।

اَفِيْضُوْا عِبَادِىْ مَغْفُوْرًا لَكُمْ وَلِمَنْ شَفَعْتُمْ لَهُ-

'হে আমার বান্দাগণ! যাও, তোমরা নিষ্পাপ এবং তোমরা যার জন্য সুপারিশ করবে, তাদেরকে ক্ষমা করা হবে।' আর প্রত্যেকটি পাথর নিক্ষেপের বদলা একটি ধ্বংসাত্মক কবীরা গোনাহ্ মাফ করা হয়। আর কুরবানী তোমাদের প্রভূর নিকট জমা থাকবে। আর চুল মুণ্ডানোতে রয়েছে, প্রত্যেকটি চুলের বদলা একটি নেকী লিখা হয় এবং একটি পাপ মুছে দেয়া হয়। এরপর যখন তাওয়াফে এফাজা করবে, তখন তোমাদের কোন পাপ থাকবে না। একজন ফেরেশতা এসে তোমার কাঁধে হাত রেখে বলবে-

اِعْمَلْ فِيْمَا يَسْتَقْبِلُ فَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا مَضَى- (رواه البزار والطبرانى فى الكبير وابن حبان فى صحيحه، انظر "الترغيب والترهيب)

তুমি ভবিষ্যতের জন্য কাজ কর। অতীতের সব গোনাহ্ মাফ করা হয়েছে।

হজ্ব ওয়াজিব হওয়ার শর্ত সমুহ

১। ইসলাম, তাই অমুসলিমের উপর হজ্ব ওয়াজিব নয়।

২। বালেগ হওয়া। অতঃএব নাবালেগের উপর হজ্ব ওয়াজিব নয়।

৩। বুদ্ধি হওয়া। অতঃএব জ্ঞানহীন ব্যক্তির উপর হজ্ব ওয়াজিব নয়।

হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন-

دُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ عَنْ الصَّبِىِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يُفِيْقَ- (احمد، و لاربع الا الترمذى)

তিন ব্যক্তির উপর থেকে কলম উঠানো হয়েছে। শিশু বালেগ হওয়া পর্যন্ত, ঘুমন্ত ব্যক্তি জাগ্রত হওয়া পর্যন্ত এবং পাগল ব্যক্তি জ্ঞান ফিরে আসা পর্যন্ত।

৪। আযাদ হওয়া। অতএব দাসের উপর হজ্ব ফরয নয়।

৫। ক্ষমতা থাকা। আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন-

وَ لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً–

মানুষের উপর এ গৃহের হজ্ব করা আল্লাহর হক, যার এ পর্যন্ত পৌছার ক্ষমতা আছে। (সূরা ইমরাণ)

'ক্ষমতা' এর অর্থঃ

(ক) শারীরিক ভাবে সুস্থ থাকা।

(খ) রাস্তা নিরাপদ থাকা।

(গ) নিজ পরিবারের ভরন-পোষনের অতিরিক্ত অতটুকু সম্পদ থাকা, যা দ্বারা হজ্ব করে বাড়ীতে ফিরা পর্যন্ত তার ব্যয় সংকুলান হবে।

(ঘ) যানবাহন সহজ লভ্য হওয়া।

হযরত আনাছ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হল, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)!

مَا السَّبِيْلُ؟ قَالَ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ– (رواه الدار قطنى وصححه)

সাবীল কি? নবী করীম (সাঃ) বললেন, পরিবারের প্রয়োজনীয় ব্যয় এবং যানবাহন।

৬। হজ্বে যাওয়ার পরিপন্থী কিছু না থাকা।

যেমন, এমন কোন সরকার যদি হয়, যে হজ্বে যাওয়া নিষিদ্ধ করে দেয়। এমতাবস্থায় হজ্ব আদায় করা ওয়াজিব হবে না।

শিশুর হজ্ব

শিশুর উপর হজ্ব ওয়াজিব নয়। তবে শিশু হজ্ব করলে তার হজ্ব সহীহ হবে। কিন্তু এ হজ্ব দ্বারা তার ইসলামের ফরয হজ্ব আদায় হবে না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

اَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ ثُمَّ بَلَغَ الْحِنْثَ فَعَلَيْهِ اَنْ يَحُجَّ حِجَّةً اُخْرٰى–

যে শিশু হজ্ব করল, অতঃপর বালেগ হল, তার উপর আবার হজ্ব করা ফরয। (তিবরাণী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এক মহিলা একটি শিশু উঠিয়ে বলল, হে নবী! এ শিশুর কি হজ্ব হবে? নবী করীম (সাঃ) বললেন–

نَعَمْ وَلَكِ اَجْرُهٗ– (رواه مسلم)

হ্যাঁ! আর এর সওয়াব হবে তোমার। (মুসলিম)

হযরত যাবের (রাঃ) বলেন, আমরা নবী করীম (সাঃ) এর সাথে হজ্ব করেছি। আমাদের সাথে ছিলো নারী ও শিশু।

فَلَبَّيْنَا عَنِ الصِّبْيَانِ وَرَمَيْنَا عَنْهُمْ- (رواه احمد وابن ماجة)

আমরা শিশুর পক্ষ থেকে লাব্বাইক বলেছি এবং তাদের পক্ষ থেকে পাথর নিক্ষেপ করেছি। আর শিশু যদি আরাফাতে অবস্থানের পূর্বে বালেগ হয়ে যায়, তাহলে তার ইসলামের ফরয হজ্ব আদায় হয়ে যাবে।

নারীর হজ্ব

পুরুষের মত নারীর উপরও হজ্ব ফরয, যদি হজ্বের শর্তসমূহ বর্তমান থাকে। কিন্তু নারীর হজ্ব আদায়ের জন্য শর্ত হল তার স্বামী অথবা কোন মুহররাম ব্যক্তি সাথে থাকবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (সাঃ)কে বলতে শুনেছি–

لاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ الاَّ مَعَ ذِىْ مُحَرَّمٍ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ امْرَأَتِىْ خَرَجَتْ حَاجَّةً وَاِنِّى اكْتُتَبْتُ فِىْ غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ- (متفق عليه)

মুহাররাম ব্যতিত কোন মহিলা একা সফর করবে না। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, হে রাসুল! আমার স্ত্রী হজ্বের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছে। আর আমি তো অমুক অমুক যুদ্ধের জন্য নাম লিখিয়েছি। নবী করীম (সাঃ) বললেন, তুমি চলে যাও এবং তোমার স্ত্রীর সাথে হজ্ব কর।

হযরত ইয়াহ্‌ইয়া বিন আব্বাদ (রাঃ) বলেন, আহলেরাই এর এক মহিলা ইবরাহীম নখফীর নিকট চিঠি লিখলেন যে, আমার সম্পদ আছে। কিন্তু আমার কোন মুহাররাম ব্যক্তি নেই। এ জন্য হজ্ব করিনি। তিনি মহিলাকে লিখলেন–

اِنَّكِ مِمَّنْ لَمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ سَبِيْلاً-

তুমি সেই ব্যক্তির অন্তুর্ভূক্ত, যাকে আল্লাহ হজ্ব আদায়ের ক্ষমতা দান করেননি।

আর 'সাবিলুস্ সালাম' নামক কিতাবে বলা হয়েছে ইমামগণের এক বড় দল বলেছেন যে, বৃদ্ধা মহিলার জন্য মুহাররাম ব্যক্তি ছাড়াই সফর করা জায়েয।

আরেক দল উলামাদের মতানুসারে যদি কোন নির্ভর যোগ্য মহিলা সাথী হন, এবং রাস্তা নিরাপদ হয়, তবে স্বামী অথবা কোন মুহাররাম ব্যক্তি ছাড়াই মহিলার জন্য সফর করা জায়েয।

হযরত আদী বিন হাতিম তাঈ (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি এসে নবী করীম (সাঃ) এর নিকট ক্ষুধার অভিযোগ করল। অতঃপর অন্য এক ব্যক্তি এসে সফরের অভিযোগ করল। নবী করীম (সাঃ) বললেন, হে আদী! তুমি হিরা নামক স্থান দেখেছ? আদী বললেন, আমি দেখিনি, তবে শুনেছি। নবী করীম (সাঃ) বললেন–

فَانْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِيْنَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيْرَةِ حَتَّى تَطُوْفَ بِاكَعْبَةِ لاَتَخَافُ اِلاَّ بِاللّٰهِ- (رواه البخارى)

যদি তোমার জীবন দীর্ঘ হয়, তবে অবশ্যই দেখতে পাবে যে, উটের পিটে বসে মহিলা হিরা থেকে সফর করে আসবে এবং ক্বাবাগৃহ তাওয়াফ করবে। সে আল্লাহ্ ব্যতিত অন্য কাউকে ভয় করবে না। (বোখারী)

উক্ত হাদীস দ্বারা ইমাম ইবনে তাইমিয়া 'সাবিলুস্ সালাম' গ্রন্থে বলেছেন, মুহাররাম ব্যতিত মহিলার জন্য হজ্ব করা জায়েয। আর যার ক্ষমতা নেই, সে যদি হজ্ব করে তবে তার হজ্ব সহীহ হবে।

স্বামীর অনুমতি ব্যতিত স্ত্রীর হজ্ব

নারীর উপর যদি হজ্ব ফরয হয়, তবে হজ্ব আদয়ের জন্য স্বামীর অনুমতি নেওয়া মুস্তাহাব মাত্র। স্ত্রীর হজ্ব আদায়ে স্বামীর বাধা দেওয়ার কোন হক নেই। স্বামী ফরয হজ্ব আদায়ে বাধা দিলে, তার বাধা মানতে নেই। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন-

لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَّةِ الْخَالِقِ-

আল্লাহর নাফরমানীতে কোন সৃষ্ট ব্যক্তির আনুগত্য নেই।

কিন্তু নফল হজ্ব করার জন্য স্বামীর অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন।

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) বলেন, তিনি নবী করীম (সাঃ) থেকে বর্ণনা করে বলেছেন, এক মহিলার সম্পদ আছে, কিন্তু তার স্বামী তাকে হজ্ব করতে অনুমতি দেয় না। নবী করীম (সাঃ) বললেন-

لَيْسَ لَهَا اَنْ تَنْطَلِقَ اِلاَّ بِاِذْنِ زَوْجِهَا- (رواه الدار قطنى)

স্বামীর অনুমতি ব্যতিত নারীর হজ্ব করার অধিকার নেই। (দারেকুতনী)

হজ্ব আদায় না করে মৃত্যুবরন করা

কেউ যদি ফরয হজ্ব আদায় না করে মৃত্যুবরণ করে কিংবা মান্নাত হজ্ব আদায় না করে মৃত্যুবরন করে, তবে তার ওলীর উপর ওয়াজিব হবে তার সম্পদ দ্বারা তার হজ্ব আদায় করানো।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, জাহিনা গোত্রের একজন মহিলা নবী করীম (সাঃ) এর নিকট এসে বলল, আমার মা হজের মান্নাত করে তা আদায় করতে পারেননি। তিনি মৃত্যুবরন করেছেন। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্ব আদায় করতে পারব? নবী করীম (সাঃ) বললেন-

نَعَمْ، حُجِّىْ عَنْهَا، أَرَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى اُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَّتِهِ اُقْضُوْا اللّٰهَ فَاللّٰهُ اَحَقُّ بِالْوَفَاءِ- (رواه البخارى)

হ্যাঁ! তার পক্ষ থেকে হজ্ব আদায় কর। যদি তোমার মায়ের উপর ঋণ থাকত, তাহলে কি তুমি আদায় করতে না? সুতরাং আল্লাহর ঋণ আদায় কর। আল্লাহই ঋণ আদায়ের বেশী হকদার।

উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমান হচ্ছে যে, মূর্দা ওসীয়ত করুক বা না-ই করুক, তার পক্ষ থেকে তার ফরজ হজ্ব আদায় করা ওয়াজিব। কারন হজ্ব হল আল্লাহর ঋণ আর মূর্দার রেখে যাওয়া সকল ঋণই আদায় করা ওয়াজিব।

বদলা হজ্ব

যদি কোন ব্যক্তির উপর হজ্ব ফরয হয়, আর অসুস্থতার দরুন কিংবা বয়সজনিত কারনে হজ্ব করতে অক্ষম হয় এবং সক্ষম হওয়ার আশা না থাকে, তবে অন্য কাউকে পাঠিয়ে তার বদলা হজ্ব করানো উচিত। কারন, এমতাবস্থায় তার হুকুম হবে মূর্দার হুকুমের সমান। আর মূর্দার পক্ষ থেকে হজ্ব করানো তো জায়েয।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, হযরত ফজল বিন আব্বাস নবী করীম (সাঃ) এর পিছনে বসে ছিলেন। খাশয়াম গোত্রের এক মহিলা এসে বলল, হে আল্লাহর রাসুল (সাঃ)! বান্দার উপর হজ্ব করা ফরয। আমার বাবা বৃদ্ধ তিনি যানবাহনে আরোহন করতে পারবেন না। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্ব করতে পারব? নবী করীম (সাঃ) বললেন–

نَعَمْ وَذَلِكَ فِىْ حِجَّةِ الْوِدَاعِ– (رواه الجماعة)

হ্যাঁ! আর এটা হয়েছে বিদায় হজ্বের সময়। (আল জামায়াহ্)

বদলা হজ্বের শর্ত

নিজের হজ্ব করুক বা না করুক সন্তান, তার মাতা-পিতার বদলা হজ্ব করতে পারবে।

হযরত লকীত বিন আমীর (রাঃ) বলেন, তিনি নবী করীম (সাঃ) এর নিকট এসে বললেন, আমার পিতা বৃদ্ধ মানুষ। তার হজ্ব করার ক্ষমতা নেই এবং যানবাহনে ও আরোহন করতে পারবেন না। নবী করীম (সাঃ) বললেন–

حُجَّ عَنْ اَبِيْكَ وَاعْتَمِرْ– (رواه ابوداؤد والتمذى)

তোমার পিতার হজ্ব ও উমরা আদায় কর। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

হযরত বুরায়দা (রাঃ) বলেন, একজন মহিলা এসে নবী করীম (সাঃ) কে বলল, আমার মা হজ্ব না করে মৃত্যুবরন করেছেন। আমি কি তার বদলা হজ্ব আদায় করতে পারব? নবী করীম (সাঃ) বললেন, হ্যাঁ। সে আবার বললো, আমার মা এক মাস ফরয রোযা রাখতে পারেননি। আমি কি তার রোযা রাখতে পারব? নবী করীম (সাঃ) বললেন, হ্যাঁ।

উক্ত হাদীসদ্বয় প্রমান করছে যে, সন্তান নিজের মাতাপিতার হজ্ব আদায় করতে পারবে, সে নিজের হজ্ব করুক বা না করুক।

আর অধিকাংশ চিন্তাবিদদের মতানুসারে, সন্তান ব্যতিত কেউ অন্যের বদলা হজ্ব করতে হলে প্রথমে নিজের হজ্ব করা শর্ত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) শুনলেন, এক ব্যক্তি বলছে–

–لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ 'শিবরমার পক্ষ থেকে হাজির হয়েছে।'

নবী করীম (সাঃ) বললেন, শিবরমা কে? সে বললো, আমার ভাই। নবী করীম (সাঃ) বললেন, তুমি কি তোমার হজ্ব করেছো? সে বললো, না। নবী করীম (সাঃ) বললেন–

حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ عَنْ شُبْرُمَةَ– (رواه احمد وابوداؤد)

প্রথমে তোমার নিজের হজ্ব কর। তার পর শিবরামার হজ্ব কর। (আবু দাউদ, আহ্‌মাদ)

আর বদলা হজ্ব করানোর পর যদি অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ হয়ে যায় এবং অক্ষম ব্যক্তি সক্ষম হয়ে যায়, তবে তাকে আর হজ্ব করতে হবে না। কারন, হজ্ব হল আল্লাহর ঋণ। আর সে যখন ঋণ আদায় করেছে, তাই তাকে আর হজ্ব (ঋণ) আদায় করতে হবে না, বলেছেন ইবনে হজম (রাহঃ)।

হজ্বের মান্নাত করা

কেউ যদি হজ্বের মান্নাত করে এবং তার উপর হজ্ব করা ফরয হয়, তবে হযরত ইবনে উমার (রাঃ) এবং আতা (রাহঃ) এর মতানুসারে সে প্রথমে ফরয হজ্ব আদায় করবে। অতঃপর তার মান্নাত করা হজ্ব আদায় করবে।

আর হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং ইকরামা (রাহঃ) এর মতানুসারে, একই হজ্ব দ্বারা তার ফরয হজ্ব এবং মান্নাত করা হজ্ব দুটিই আদায় হয়ে যাবে।

হজ্ব না করে বসে থাকা ইসলামের নীতি নয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

لاَ صَرُوْرَةَ فِى الاِسْلاَمِ– (رواه احمد وابوداؤد)

হজ্ব না করে বসে থাকা ইসলামের নীতি নয়।

খাত্তাবী বলেছেন 'ছারুরাহ্' শব্দের অর্থ, (ক) সেই ব্যক্তি, যে হজ্ব করেনি। (খ) সেই ব্যক্তি, যে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়নি।

উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমানিত হচ্ছে, যে ব্যক্তি নিজের হজ্ব করেনি, সে যদি অন্যের বদলা হজ্ব করে, তবে তার নিজের হজ্বই আদায় হবে। এ মাজহাব হল, ইমাম শাফী ইমাম আহ্‌মাদ, আওযায়ী এবং ইসহাক (রাহঃ) এর।

আর ইমাম মালিক ও আবু হানীফা (রাহঃ) এর মতানুসারে সে যার নিয়ত করবে, তারই হজ্ব আদায় হবে।

হজ্বের জন্য ঋণ করা

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আবু আওফা (রাঃ) বলেন–

سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ لَمْ يَحُجَّ أَوَيَسْتَقْرِضُ

لِلْحَجِّ؟ قَالَ لاَ- (رواه البيهقى)

আমি আল্লাহর রাসূলকে জিজ্ঞাস করলাম সেই ব্যক্তি সম্পর্কে যে হজ্ব করেনি সে কি হজ্বের জন্য ঋণ করতে পারবে? নবী করীম (সাঃ) বললেন, না। (বায়হাকী)

হারাম সম্পদ দ্বারা হজ্ব করা

হজ্ব কবুল হওয়ার জন্য সম্পদ হালাল হওয়া জরুরী। নবী করীম (সাঃ) বলেছে–

اِنَّ اللّهَ طَيِّبٌ لاَيَقْبَلُ اِلاَّ طَيِّبًا- (رواه مسلم)

আল্লাহ তা'য়ালা পাক-পবিত্র। তিনি পাক ব্যতিত কিছু কবুল করেন না। (মুসলিম)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, হাজ্বী যখন হালাল সম্পদ দ্বারা হজ্বের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে এবং যানবাহনে আরোহন করে, আর উচ্চারন করে–

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ..... তখন আসমান থেকে এক আহবান কারী আহবান করে–

لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ زَادُكَ حَلاَلٌ وَرَاحِلَتُكَ حَلاَلٌ وَحَجُّكَ مَبْرُوْرٌ غَيْرُ مَأْزُوْرٍ-

তোমার উপস্থিতি এবং তোমার পুন্য গ্রহণ করা হল। তোমার টাকা হালাল এবং তোমার যানবাহনও হালাল। তোমার হজ্ব মাকবুল তোমার কোন পাপ রইল না।

আর ব্যক্তি যখন হারাম সম্পদ দ্বারা হজ্বের উদ্দেশ্যে বের হয় এবং উচ্চারন করে–

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ..... তখন আসমান থেকে বলা হয়–

لاَ لَبَّيْكَ وَلاَ سَعْدَيْكَ، زَادُكَ حَرَامٌ وَنَفْقَتُكَ حَرَامٌ وَحَجُّكَ مَأْزُوْرٌ غَيْرُ مَاجُوْرٍ- (رواه الطبرانى والاصفهانى)

তোমার উপস্তিতি গ্রহণ যোগ্য নয়, এবং তোমার কোন পুন্য নেই। তোমার টাকা এবং ব্যয় সবই হারাম। তোমার হজ্ব প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, এর কোন প্রতিদান নেই। (তিবরাণী)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) এক ব্যক্তির কথা বর্ণনা করলেন–

يُطِيْلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ وَأَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ اِلَى السَّمَاءِ يَقُوْلُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُزِىَ بِالْحَرَامِ فَاَنّٰى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ- (رواه مسلم)

সে লম্বা সফর করেছে, তার চুল অবিন্যস্ত এবং শরীর ধূলি মলিন। সে আসমানের দিকে হাত তুলে বলছে, হে প্রভূ, হে প্রভূ! অথচ তার খাদ্য, পানিয় এবং পোশাক হারাম। হারাম বস্তু তাকে খাওয়ানো হচ্ছে। তার দোয়া কেমন করে কবুল হবে?

বিশ্ব-নবীর হজ্ব পালন

বিশ্ব-নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) জীবনে একবারই হজ্ব করেছেন। আর তা করেছেন দশম হিজরীতে। এটাই ইসলামে নবী করীম (সাঃ) এর প্রথম ও শেষে হজ্ব। কাজেই ইতিহাসের পাতায় এটাই বিদায় হজ্ব নামে খ্যাত।

নবী করীম (সাঃ) যখন ঐতিহাসিক হজ্বের ঘোষনা দিলেন, তখন দলে দলে মানুষ মদিনায় আসতে লাগলেন। নবী করীম (সাঃ) যিলকাদ মাসের ২৬ তারিখ রোজ শনিবার মদিনার পথে যাত্রা করলেন। সাথে ছিল কুরবানীর পশু। তিনি যুল-হুলাইফা নামক স্থানে এসে অবস্থান করলেন। এ সময় আস্‌মা বিনতে উমাইস মুহাম্মাদ বিন আবুবকরকে জন্ম দিলেন। তিনি নবী করীম (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি এখন কি করব? নবী করীম (সাঃ) বললেন–

اِغْتَسِلِيْ وَاسْتَقِرِّى بِثَوْبٍ وَاحْرِمِيْ–

তুমি গোসল করে লজ্জাস্থানে কাপড় বেঁধে নাও এবং ইহরাম বাঁধো।

পরদিন নবী করীম (সাঃ) জুহরের পূর্বে গোসল করলেন এবং জুহরের দুই রাকআত নামায পড়ে মুসল্লাতে বসেই হজ্ব ও উমরার একত্রে (কেরান হজ্বের) নিয়ত করলেন এবং দুই বার লাব্বায়েক বললেন। তারপর তাঁবু থেকে বের হয়ে আসলেন এবং কাছওয়া নামক উটনির উপর আরোহন করলেন। সাথে ছিলেন অসংখ্য মানুষ। নবী করীম (সাঃ) উচ্চঃস্বরে বলতে লাগলেন–

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لاَشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَشَرِيْكَ لَكَ– (رواه مالك)

মানুষ উচ্চঃস্বরে এ তালবিয়া পাঠ করতে লাগলেন। নবী করীম (সাঃ) এক সপ্তাহ্ সফরের পর যিল হজ্ব মাসের চার তারিখ মক্কায় পৌছলেন। মাসজিদে হারামে পৌছেই প্রথমে তিনি অযূ করে ক্বাবাগৃহ তাওয়াফ করলেন। তিনি প্রথম তিন তাওয়াফে রমল করলেন (কিছুটা দৌড়ের মত চললেন)। তাওয়াফের সময় তিনি রুক্‌নে ইয়ামনী স্পর্শ করেন এবং কালো পাথরকে চুমু দেন। তাওয়াফ শেষে তিনি মাকামে ইবরাহীমে এসে পড়লেন–

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى–

তিনি এখানে দুই রাকআত নামাজ পড়লেন প্রথম রাকআতে 'সূরা কাফিরুন' এবং দ্বিতীয় রাকআতে, 'সূরা ইখলাস' পড়লেন। তার পর যমযম কূপের নিকট এসে পানি পান করলেন এবং বললেন–

اِنَّهَا مُبَارَكَةٌ، اِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ وَشِفَاءُ سَقَمٍ– (متفق عليه)

এটা বরকতময়। এটা দ্বারা খাদ্যের কাজ হয় এবং রোগের শিফা হয়। (মুত্তাফিকুন আলাইহি)

অতঃপর নবী করীম (সাঃ) সাফা পর্বতে আরাহন করলেন এবং পাঠ করলেন–

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِاعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ

عَلَيْهِ اَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا، وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ *

তার পর তিনি সাফা ও মারওয়া পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে সাঈ করেন এবং তাওহীদ বানী উচ্চারণ করতে থাকেন।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ اَنْجَزَوَعْدَهُ وَ نَصَرَعَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ–

তিনি সাফা ও মারওয়াতে সাতবার সাঈ করলেন। তারপর নবী করীম (সাঃ) বললেন–

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُحِلَّ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً–

তোমাদের মধ্যে যার কাছে কোরবানীর পশু নেই সে যেনো হালাল হয়ে যায় এবং ইহরামকে উমরায় পরিবর্তন করে দেয়।' তিনি আরো বললেন, আমার সাথে যদি কোরবানীর পশু না থাকতো, তাহলে আমিও ইহরামকে উমরায় পরিবর্তন করে দিতাম। এরপর যাদের সাথে কোরবানীর পশু ছিলো না, তারা মাথার চুল কেটে হালাল হয়ে গেলেন।

এরপর যিলহজ্জের আট তারিখে নবী করীম (সাঃ) মিনায় গেলেন। সেখানে তিনি রাত যাপন করলেন এবং জুহর, আছর, মাগরিব, এশা এবং ফজরের নামায পড়লেন। নয় তারিখ সকালে তিনি আরাফায় গমন করলেন। এবং নমিরায় অবস্থান করলেন। আগেই সেখানে তাঁবু লাগানো হয়েছিল। সূর্য ঢলে পড়ার পর তিনি কাছওয়ার উপর আরোহন করে আরাফার মাঝখানে আসলেন। এ সময় নবী করীম (সাঃ) এর সাথে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার সাহাবী বিদ্যমান ছিলো। তিনি সমবেত জন-সমুদ্রের উদ্দেশ্যে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দান করেন।

'হে মানব-মণ্ডলী! আমার কথা শুন! আমি জানি না যে, এবারের পর তোমাদের সাথে এ জায়গায় আর মিলিত হতে পারব কি না। তোমাদের রক্ত এবং তোমাদের সম্পদ পরস্পরের মধ্যে আজকের দিন, বর্তমান মাস এবং এ শহরের মতই হারাম।

শোন! জাহেলিয়াতের সব কিছু আমার পদতলে পিষ্ট করা হয়েছে। প্রথম যে রক্ত আমি শেষ করলাম, তা হল রাবিয়া ইবনে হারিছের রক্ত। আর প্রথম যে সুদ শেষ করলাম, তা হল আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের সুদ।

আর নারীদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। কারন, তোমারা তাদেরকে আল্লাহর আমানতের সাথে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর কালামের মাধ্যমে হালাল করেছ। তাদের উপর তোমাদের অধিকার যে, তারা তোমাদের বিছানায় এমন কাউকে বসতে দেবে না, যাকে তোমরা পছন্দ করো না। যদি তারা এরূপ করে, তবে তোমরা তাদেরকে প্রহার করতে পার। কিন্তু বেশী কঠোরভাবে প্রহার করবে না। আর তোমাদের উপর তাদের অধিকার হল, তোমরা তাদেরকে যথা সম্ভব উত্তম ভাবে পানাহার এবং পোশাক দেবে।

وَ اِنِّىْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ اَمْرَيْنِ مَا اِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوْا كِتَابُ اللّٰهِ وَسُنَّةُ رَسُوْلِهِ– (رواه احمد)

আমি তোমাদের নিকট এমন দুটি জিনিষ রেখে গেলাম, যতক্ষণ তোমরা তা দৃঢ়ভাবে ধারন করবে, ততক্ষণ তোমরা পথ ভ্রষ্ট হবে না। তা হল, আল্লাহর কিতাব ও নবীর সুন্নাত।

হে মানব-মণ্ডলী! মনে রেখো যে, আমার পরে আর কোন নবী নেই এবং তোমাদের পর আর কোন উম্মাত নেই। কাজেই তোমরা স্বীয় প্রভূর ইবাদত করবে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায কায়েম করবে, রমাজান মাসে রোযা রাখবে, যাকাত দেবে এবং হজ্ব আদায় করবে।

আমার সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে। তখন তোমরা কি বলবে? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আমরা সাক্ষ্য দিব যে আপনি আল্লাহর দ্বীনের প্রচার ও প্রসার ঘটিয়েছেন এবং পয়গাম পৌছিয়ে দিয়েছেন। তখন নবী করীম (সাঃ) আকাশের দিকে আঙ্গুল তুলে বললেন–

اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ– হে আল্লাহ সাক্ষী থাকুন, হে আল্লাহ সাক্ষী থাকুন।

নবী করীম (সাঃ) এর বানীসমূহ হযরত রবিয়া ইবনে উমাইয়া ইবনে খলফ (রাঃ) উচ্চ কণ্ঠে মানুষের কাছে পৌছাচ্ছিলেন। নবী করীম (সাঃ) এর ভাষনের পর হযরত বিলাল (রাঃ) আযান ও ইকামত দিলেন। নবী করীম (সাঃ) জুহর ও আছরের নামায জমা করে কছর পড়লেন। তারপর অবস্থান স্থলে আসলেন এবং আল্লাহর যিকর ও দোয়া করতে রইলেন। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

خَيْرُ الدُّعَاءُ عَرَفَةَ وَاَفْضَلُ مَا يَقُوْلُ اَنَا وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ قَبْلِى، لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَئٍ قَدِيْرٌ

আরাফাতের ময়দানে দোয়া করার জন্যে সর্বত্তোম দোয়া এটি, যা আমি এবং আমার পূর্বের সকল নবীগণ করেছেন। আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক এবং তাঁর কোনো শরিক নেই, সমগ্র সাম্রাজ্যই তাঁর এবং সকল প্রশংসাও কেবলমাত্র তাঁরই। তিনিই সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

কিছুক্ষণ পর সূর্যাস্ত হল। তখন তিনি মুযদালিফার দিকে যাত্রা করলেন। সেখানে এসে তিনি মাগরিব ও এশার নামায জমা করে কছর পড়লেন এবং সেখানে রাত্রি যাপন করলেন। ফজরের নামাযের পর তিনি মাশআরুল হারামে আসলেন এবং দীর্ঘক্ষণ দোয়া করলেন। অতঃপর সূর্য উদয়ের পূর্বেই তিনি মিনার দিকে যাত্রা করলেন। মিনাতে এসে তিনি জমরায়ে কুবরাতে সাতটি পাথর নিক্ষেপ করলেন। প্রত্যেকটি নিক্ষেপ করার সময় বললেন, 'আল্লাহু আকবার।' তার পর তিনি মধ্যভূমিতে গমন করলেন এবং নিজ হাতে ৬৩ টি উট কুরবানী করলেন। তারপর হযরত আলী (রাঃ) ৩৭ টি উট যবাই করেন। মোট এক শত উট যবাই করা হল। তারপর তিনি তাঁবুতে এসে নাপিতকে বললেন–

خُذْ وَاَثَارَ اِلَى جَانِبِ الاَيْمَنِ ثُمَّ الاَيْسَرِ ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيْهِ لِلنَّاسِ–

মাথার চুল কাটো। তিনি ডান দিকে ইংগিত করলেন। তারপর বাম দিকে ইংগিত করলেন এবং চুল মানুষকে দিতে থাকলেন। (মুসলিম)

নবী করীম (সাঃ) এর নির্দেশে প্রত্যেক পশু থেকে এক এক টুকরা মাংস নেয়া হল এবং তা রান্না করা হল। নবী করীম (সাঃ) তা থেকে কিছুটা খেলেন।

অতঃপর তিনি মক্কায় গমন করলেন এবং তাওয়াফে এফাজা আদায় করলেন। এখানে এসে তিনি মানুষকে হজ্বের আহকাম শিক্ষা দিলেন এবং ইবরাহীম (আঃ) এর সুন্নাত কায়েম করলেন। তিনি বললেন–

خُذُوْا عَنِّىْ مَنَا سِكَكُمْ- (رواه البخارى)

আমার নিকট থেকে তোমরা হজ্বের আমল সমুহ গ্রহণ কর। (বোখারী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি এসে বললো, হে নবী! আমি পাথর নিক্ষেপ করার পূর্বে তাওয়াফ করেছি। নবী করীম (সাঃ) বললেন, লা হারাজা- অর্থাৎ 'অসুবিধা নেই'। অন্য এক ব্যক্তি এসে বলল, আমি পাথর নিক্ষেপের পূর্বে যবাই করেছি। তিনি বললেন, কোনো অসুবিধা নেই। আরেক ব্যক্তি এসে বললো, আমি যবাই করার পূর্বে মাথা মুণ্ডিয়েছি। তিনি বললেন, অসুবিধা নেই। অপর একজন বললো, আমি বিকাল বেলায় পাথর নিক্ষেপ করেছি। নবী করীম (সাঃ) বললেন, অসুবিধা নেই। (বোখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ্‌)

নবী করীম (সাঃ) আইয়ামে তাশরীক অর্থাৎ ১১, ১২ ও ১৩ ই যিলহজ্ব তারিখে মিনায় অবস্থান করলেন। ১৩ তাং দুপুরের পর তিনি মিনা ত্যাগ করলেন এবং মুহাচ্ছাব নামক স্থানে এসে অবস্থান করলেন। হযরত আনাছ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) এখনে জুহর, আছর, মাগরিব ও এশার নামায পড়লেন। তার পর ঘুমিয়ে গেলেন। পরদিন তিনি ক্বা'বাগৃহে এসে শেষ তাওয়াফ আদায় করলেন। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

হজ্বের সফরে ব্যবসা

হজ্ব ও উমরায় সময় ব্যবসা করা জায়েয। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, ইসলামের প্রথম দিকে মানুষ আরাফা ও মিনায় ক্রয়-বিক্রয় করতেন। পরে তারা হজ্বের সময় এহরাম অবস্থায় ব্যবসা করা ভয় করতে লাগলেন। তখন হজ্বের সময় নাযিল হল–

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ-

তোমাদের উপর তোমাদের প্রভুর অনুগ্রহ অন্বেষণ করতে কোন পাপ নেই। (সূরা বাকারা)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) উক্ত আয়াত সম্পর্কে বলেছেন, মানুষ মিনাতে ব্যবসা করতো না। তাদেরকে আদেশ করা হল যেন, তারা আরাফা থেকে আসার পর ব্যবসা করে। (আবু দাউদ)

হজ্বের জন্য নিজের সম্পদ ব্যয় করা শর্ত নয়

হজ্বের জন্য নিজের সম্পদ ব্যয় করা শর্ত নয় তাই কেউ যদি অন্য কোন ব্যক্তির খাদেম হিসাবে হজ্বে যায় এবং মালিক তার খাদেমের ব্যয়ভার বহন করে, তবে খাদেমর ফরয হজ্ব আদায় হয়ে যাবে। কারো হজ্বের জন্য নিজের সম্পদ ব্যয় করা কোন শর্ত নয়।

হযরত আবু উমামা আত-তামিমী (রাঃ) বলেন, তিনি হযরত ইবনে উমার (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করলেন, আমাকে যানবাহন চালানোর জন্য ভাড়া করা হয়েছে। এখন মানুষ বলছে যে, আমার হজ্ব না কি আদায় হবে না? তিনি বললেন–

اَلَيْسَ تَحْرِمُ وَتُلَبِّى وَتَطُوْفُ بِالْبَيْتِ وَتَفِيْضُ مِنْ عَرَفَاتٍ وَتَرْمِى الْجِمَارَ–

তুমি কি এহরাম বেঁধেছো, তালবিয়া বলেছো, ক্বা'বা গৃহ তাওয়াফ করেছো, আরাফা থেকে ফিরে এসেছো এবং পাথর নিক্ষেপ করেছো?

সে বললো, হ্যাঁ। তখন হযরত ইবনে উমার (রাঃ) বললেন, তোমার হজ্ব তো আদায় হয়ে গেল। তুমি আমাকে যে প্রশ্ন করেছ, সেই প্রশ্নই এক ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ) কে করেছিল। নবী করীম (সাঃ) নীরব ছিলেন। তখন নাযিল হল–

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ–

তখন নবী করীম (সাঃ) তাকে ডেকে পাঠালেন এবং এ আয়াত পাঠ করে বললেন, তামার হজ্ব আদায় হয়েছে। (আবু দাউদ)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞাসা করল, আমুক গোত্রের লোক আমাকে ভাড়া করে নিয়ে এসেছে। আমি হজ্বের সব কাজ করেছি। আমার কি হজ্বের ছাওয়াব হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

اُوْلٰئِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّمَّاكَسَبُوْا، وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ–

এদের জন্য নিজের উপার্জনের অংশ রয়েছে, আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (বায়হাকী, দারে কুতনী)

নিজের দেশ থেকে হজ্বে যাওয়া শর্ত নয়

নিজের দেশ থেকে হজ্বে যাওয়া হজ্বের কোন শর্ত নয়। তাই কেউ যদি সৌদি আরবে চাকুরী করে, লেখা-পড়া করে অথবা ব্যবসার উদ্দেশ্যে যায় এবং হজ্বের সময় হজ্ব করে, তাহলে তার ফরয হজ্ব আদায় হয়ে যাবে।

হযরত আনাছ বিন মালেক (রাঃ) বলেন, তিনি বিদায় হজ্বের সময় হযরত আলী (রাঃ) ইয়েমেন থেকে হজ্বে আসলেন। নবী করীম (সাঃ) বললেন, তুমি কি ভাবে এহরাম করেছ? তিনি জবাব দিলেন, যে ভাবে আল্লাহর রাসুল এহরাম করেছেন, অর্থাৎ কেরান হজ্বের এহরাম। নবী করীম (সাঃ) বললেন–

لَوْ لاَ اَنَّ مَعِىَ الْهَدْىُ لاَحْلَلْتُ–

আমার সাথে যদি কুরবানীর পশু না থাকতো তাহলে আমি হালাল হয়ে যেতাম। (বোখারী)

হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) আমাকে ইয়ামনের এক গোত্রের নিকট পাঠিয়ে ছিলেন। বিদায় হজ্বের সময় আমি রাতহা নামক স্থানে নবী করীম (সাঃ) এর

সাথে মিলিত হলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, হে আব্দুল্লাহ! তুমি কি হজ্ব করেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, কি ভাবে এহ্‌রাম বেঁধেছ? আমি বললাম, যেভাবে আল্লাহর রাসুল এহ্‌রাম বেঁধেছেন। তখন নবী করীম (সঃ) বললেন, ভালই করেছ। (বোখারী)

মীকাত সমুহ

মীকাত দুই প্রকার। যামানী ও মুকানী।

মীকাত যামানী

মীকাত যামানী হল সেই সব মাস, যা ব্যতিত হজ্বের এহ্‌রাম বাঁধা সহীহ নয়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন-

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتٌ– হজ্বের জন্য কয়েকটি মাস নির্দিষ্ট রয়েছে। (সূরা বাকারা)

হযরত ইবনে উমার, ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসউদ (রাঃ), আহনাফ, ইমাম শাফী ও আহমাদ (রাহঃ) এর মতানুসারে হজ্বের মাস হল, শাওয়াল, যিলকা'দা এবং যিল হজ্বের প্রথম দশ দিন।

ইমাম বুখারী বলেছেন–

وقال ابن عمر اشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذى الحجة–

হযরত ইবনে উমার বলেছেন, হজ্বের মাস হল শাওয়াল, যুল কা'দা এবং যিল হজ্ব মাসের দশ দিন।

ইমাম মালেক (রাহঃ) এর মতানুসারে হজ্বের মাস হল তিনটি। শাওয়াল, যিল কা'দা এবং যিল হজ্ব। ইবনে হজম এ রায়কেই সমর্থন করে বলেছেন 'আশ্‌হার' শব্দ বহুবচন। আর বহুবচন তিন মাসের উপরই ব্যবহৃত হয়, আড়াই মাসের উপর নয়।

অধিকন্তু পাথর নিক্ষেপ করা হজ্বের কাজ। আর এটা যিল হজ্বের তের তারিখ পর্যন্ত আদায় করা হয়। তাওয়াফে এফাজা ও যিল হজ্ব মাসের শেষ পর্যন্ত আদায় করা জায়েয। তাই হজ্বের মাস হল তিনি মাস।

শাওয়াল মাসের পূর্বে এহ্‌রাম বাঁধা

হযরত ইবনে আব্বাস, ইবনে উমার এবং যাবের (রাঃ) এর মতানুসারে শাওয়াল মাসের পূর্বে এহ্‌রাম বাঁধা সহীহ নয়। এটা হল ইমাম শাফী (রাহঃ) এর মাজহাব। ইবনে যরীর বর্ণনা করেছেন–

لَا يَصِحُّ اَنْ يَحْرِمَ اَحَدٌ بِالْحَجِّ اِلاَّ فِىْ اَشْهُرِ الْحَرَمِ–

হজ্বের মাস সমুহ ছাড়া কারো পক্ষে হজ্বের এহ্‌রাম বাঁধা সহীহ নয়।

আর আহনাফ, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমাদ (রাহঃ) এর মতানুসারে শাওয়াল মাসের পূর্বে হজ্বের এহ্‌রাম বাঁধা সহীহ। তবে মাকরূহ হবে। ইমাম বুখারী বলেছেন–

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنَ السُّنَّةِ اَنْ لاَ يَحْرُمَ بِالْحَجِّ الاَّ فِىْ اَشْهُرِ الْحَرَمِ-

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, সুন্নাত হল যেন হজ্বের মাসসমূহ ব্যতিত হজ্বের এহ্‌রাম বাঁধা না হয়।

মীকাতে মুকানী

মীকাতে মুকানী হল সেই সব স্থান, যেখান থেকে হজ্ব ও উমরার এহরাম বাধা হয়। হজ্ব ও উমরার উদ্দেশ্যে যারা মক্কা আসবে, তাদের পক্ষে এহরাম ছাড়া এসব স্থান অতিক্রম করা যায়েজ নয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) মীকাত ধার্য করে দিয়েছেন। মদিনা বাসীর জন্য যুল হালীফা, শাম বাসীর জন্য জুহফা, নজদ বাসীর জন্য ক্বরনে মানাজিল এবং ইয়ামন বাসীর জন্য ইয়ালম লম। অতঃপর বলেছেন-

فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ اَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ اَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُوْنَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ اَهْلِهِ، وَاَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّوْنَ مِنْهَا-(رواه البخارى)

এ হল মীকাত, এসব স্থানের বাসিন্দাদের জন্য এবং যারা এর বাইরে থেকে হজ্ব ও উমরার উদ্দেশ্যে আসবে। আর মীকাতের ভিতরের বাসিন্দাগণ এহ্‌রাম বাঁধবে তাদের গৃহ থেকে। আর মক্কাবাসীরা এহ্‌রাম বাঁধবে তদের বাস স্থানে থেকে। (বোখারী)

আর উমরার জন্য মাক্কার বাসিন্দাদের মীকাত হল 'হিল'। আর নিকটতম 'হিল' হল তান্‌য়ীম।

হযরত যাবের (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) আব্দুর রহমান বিন আবুবকর (রাঃ) কে নির্দেশ দিলেন, উমরার এহ্‌রাম বাঁধার জন্য। হযরত আয়িশা (রাঃ) হজ্বের পর তানয়ীমে গিয়ে উমবার এহ্‌রাম বাঁধলেন। (বোখারী)

মীকাতে পৌছবার পূর্বে এহ্‌রাম বাঁধা

ইবনে মুন্‌যির বলেছেন, উলামাদের ইজমা হল যে ব্যক্তি মীকাতে পৌছার পূর্বে এহ্‌রাম বাঁধবে, তার হজ্ব ও উমরা সহীহ হবে। কিন্তু মাক্‌রূহ হবে কি না তাতে ভিন্নমত রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন মাকরূহ হবে। কারন, নবী করীম (সাঃ) মীকাত ধার্য্য করে দিয়েছেন। তাই মীকাত থেকেই এহ্‌রাম বাঁধা উত্তম।

হজ্বের রুকুন সমুহ

১। এহ্‌রাম বাঁধা।

২। আরাফার মাঠে অবস্থান করা।

৩। তাওয়াফে এফাযা করা।

৪। সাফা ও মারওয়ার মধ্য বর্তী স্থানে সাঈ করা। ইমাম আবু হানীফা (রাহঃ) এর মতে সাঈ করা ওয়াজিব।

হজ্বের ১ম রুকুন এহরাম বাঁধা

এহরাম হল হজ্ব ও উমরা অথবা যে কোন একটির নিয়ত করা।

এহরাম বাঁধা হজ্ব ও উমরার রুকুন। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–

وَمَا أُمِرُوْا اِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ–

তাদেরকে এ ছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্টভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে। (সূরা)

নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

اِنَّمَا الاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَانَوى– (رواه البخارى)

নিশ্চয়ই আমল সমুহ সহীহ হয় নিয়ত দ্বারা। প্রত্যেক ব্যক্তি যে নিয়ত করবে, সে তা ই পাবে।

নিয়তের স্থান হল অন্তর। মূখে উচ্চারন করা যাবে না। কিন্তু হজ্ব বা উমরার নিয়ত মূখে উচ্চারন করা হাদীস দ্বারা প্রমানিত আছে।

হযরত আনাছ (রাঃ) বলেন, আমরা বিদায় হজ্বের সময় মদিনায় নবী করীম (সাঃ) এর সাথে জুহরের নামায চার রাকআত পড়েছি। আর যুল হালীফায় আছরের নামায পড়েছি দুই রাকআত। নবী করীম (সাঃ) এখানে রাত্রি যাপন করলেন। ফজরের নামাযের পর নবী করীম (সাঃ) তাছবীহ, তাহমীদ ও তাকবীর করলেন।

ثُمَّ اَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَاَهَلَّ النَّاسُ وَسَمِعْتُهُمْ يَصْرَخُوْنَ بِهِمَا جَمِيْعًا–

অতঃপর নবী করীম (সাঃ) হজ্ব ও উমরার নিয়ত করলেন। মানুষও নিয়ত করলেন। আমি শুনেছি তারা সকলেই উচ্চস্বরে চিৎকার করে নিয়ত উচ্চারণ করছেন। (বোখারী)

হযরত আনাছ (রাঃ) বলেন, আমি শুনেছি নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا– আমি হজ্ব ও উমরা সহ তোমার ডাকে সাড়া দিলাম।

আর মুসলিম শরীফের বর্ণনায় এসেছে। –اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا

অন্য এক বর্ণনাকারী বলেছেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

نَوَيْتُ الْعُمْرَةَ وَنَوَيْتُ الْحَجَّ– তবে এ বর্ণনা সহীহ কোন কিতাবে নেই

এহরামের আদাব তথা এহরামের জন্য করনীয় কাজ

১। পরিষ্কার পরিছন্নতা

এহরামের পূর্বে গোঁফ, নখ, নাভির নীচের লোম এবং বগলের লোম পরিষ্কার করবে এবং গোসল করে পাক-সাফ হবে। হযরত আবু মালেক আশয়ায়ী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الاِيْمَانِ- (رواه مسلم) পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক। (মুসলিম)

হযরত আনাছ (রাঃ) বলেন–

وَقَّتَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّم فِىْ قَصِّ الشَّارِبِ وَقَلْمِ الاَظَافِرِ وَ نَتْفِ الابْطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ وَ اَنْ لاَنَتْرُكَ ذَلِكَ اَكْثَرَ مِنْ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةٍ-

আমাদের জন্য নবী করীম (সাঃ) সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, গোঁফ ছোট করার, নখ কাটার, বগল পরিষ্কার করার এবং এটা চল্লিশ দিনের বেশী ছেড়ে না রাখা। (মুসলিম)

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) বলেছেন, সুন্নাত হল, যখন কেউ এহরামের ইচ্ছা করবে অথবা মক্কায় প্রবেশের ইচ্ছা করবে, তখন যেন গোসল করে। (বায্যার, দারেকুতনী, হাকেম)

২। এহরামের দুই কাপড় যেন সাদা হয়। কারন, সাদা কাপড় আল্লাহর পছন্দনীয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, নবী করীম (সাঃ) চুল আঁচড়ানো, তৈল ব্যবহার এবং সিলাই ছাড়া লুঙ্গি ও চাদর পরিধান করার পর সাহাবীদেরকে নিয়ে যাত্রা করলেন। (বোখারী)

৩। খুশবু লাগানো

হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন–

كَاَنِّىْ اَنْظُرُ وَبِيْضَ الطِّيْبِ فِىْ مَفْرَقِ رَسُوْلِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهُوَ مُحْرِمٌ- (متفق عليه)

এহরাম অবস্থায় আমি যেন নবী করীম (সাঃ) এর চুলের ফাঁকে খুশবুর চমক দেখছি।

হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেছেন–

كُنْتُ اَطَيِّبُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لاِحْرَامِهِ قَبْلَ اَنْ يَحْرِمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ اَنْ يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ- (متفق عليه)

এহরাম বাঁধার পূর্বে আমি নবী করীম (সাঃ) কে এহরামের জন্য খুশবু লাগায়েছি। আর তাওয়াফে এফাযার পূর্বে আমি নবী করীম (সাঃ)র হালাল হওয়ার জন্য খুশবু লাগায়েছি।

৪। দু রাকআত নামায পড়া।

এহরামের দুই রাকআত নামাযের প্রথম রাকআতে পড়বে সূরা কাফিরুন এবং দ্বিতীয় রাকআতে পড়বে সূরা ইখলাস।

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) বলেছেন, নবী করীম (সাঃ) যুল হালীফায় এহরামের পর দুই রাকআত নামায পড়েছেন। (মুসলিম)

আর নামাযের সময় হলে ফরয নামাযই হবে এহরামের জন্য যথেষ্ট।

তালবিয়া

তালবিয়া শব্দের অর্থ ডাকে সাড়া দেয়া এবং আনুগত্য করা। অতএব লাব্বাইকা শব্দের অর্থ হবে, আমি তোমার ডাকে সাড়া দিলাম এবং তোমার অনুগত্যের জন্য প্রস্তুত হলাম।

হযরত নাফে' (রাঃ) ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী করীম (সাঃ) তালবিয়া পাঠ করেছেন–

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَاشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَاشَرِيْكَ لَكَ– (رواه مالك)

হে আল্লাহ! আমি তোমার ডাকে সাড়া দিলাম এবং তোমার অনুগত্যের জন্য প্রস্তুত। তোমার কোন অংশীদার নেই। নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা, সকল নিয়ামত এবং সকল ক্ষমতা তোমারই। তোমার কোনো শরীক নেই।

তালবিয়ার হুকুম

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (সাঃ)কে বলতে শুনেছি–

يَا اٰلَ مُحَمَّدٍ مَنْ حَجَّ مِنْكُمْ فَلْيُهِلَّ مِنْ حَجِّهِ اَوْحَجَّتِهِ– (رواه احمد)

হে মুহাম্মাদের পরিবার! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি হজ্ব করবে, সে যেন উচ্চঃস্বরে তালবিয়া বলে। (আহ্‌মাদ, ইবনে হাব্বান)

ইমাম শাফী ও আহমাদ (রাহঃ) এর মতানুসারে তালবিয়া সুন্নাত। আর এহরামের সাথে মিলিয়ে পাঠ করা মুস্তাহাব।

আর আহনাফ (রাহঃ) এর মতানুসারে তালবিয়া পড়া এহরামের শর্ত। তাই তালবিয়া পাঠ না করলে এহরাম সহীহ হবে না। আর তালবিয়ার পরিবর্তে যদি কেউ তাসবীহ ও তাহলীল করে, তবে তার এহরাম সহীহ হবে। কিন্তু তার উপর কোরবানী দেয়া ওয়াজিব হবে।

আর ইমাম মালেক (রাহঃ) এর মতানুসারে তালবিয়া পাঠ করা ওয়াজিব। তালবিয়া পাঠ না করলে কোরবানী দেয়া ওয়াজিব হবে।

তালবিয়া পাঠের ফজিলত

হযরত যাবের (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

مَامِنْ مُحْرِمٍ يُضَحِّى يَوْمَهُ يُلَبِّىْ حَتّٰى تَغِيْبَ الشَّمْسُ اِلاَّ غَابَتْ ذُنُوْبُهُ فَعَادَ كَمَا وَلَدَتْهُ اُمُّهُ– رواه ابن ماجة)

যে মুহরিম ব্যক্তি সূর্যাস্ত পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করে অতিবাহিত করল, তার সকল পাপ মা'ফ হয়ে গেল। সে নিষ্পাপ হয়ে প্রত্যাবর্তন করবে, যেন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছেন।

হযরত যায়েদ বিন খালেক (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

جَاءَنِىْ جِبْرِيْلُ وَقَالَ مُرْ اَصْحَابَكَ فَلْيَرْ فَعُوْا اَصْوَا تَهُمْ بِالتَّلْبِيَّةِ فَانَّهَا مِنْ شَعَائِرِ الْحَجِّ– (رواه ابن ماجة واحمد وابن خزيمة والحاكم)

আমার নিকট জিবরাঈল এসে বললেন, আপনার সাথীদেরকে উচ্চঃস্বরে তালবিয়া পাঠ করতে নির্দেশ দিন। কারন এটা হজ্বের আলামত বা চিহ্ন।

হযরত আবুবকর (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হল–

اَىُّ الْحَجِّ اَفْضَلُ؟ فَقَالَ اَلْعَجُّ وَالْثَجُّ– (رواه الترمذى وابن ماجة)

কোন ধরনের হজ্ব ভাল? নবী করীম (সাঃ) বললেন, যে হজ্বে উচ্চঃস্বরে তালবিয়া পাঠ করা হয় এবং কুরবানী করা হয়। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্)

পুরুষের জন্য উচ্চঃস্বরে তালবিয়া পাঠ করা মুস্তাহাব। আর মহিলাদের জন্য মুস্তাহাব হল, তালবিয়া তারা নিজে শুনবে অন্য কাউকে শুনাবে না।

যে সব স্থান ও সময়ে তালবিয়া পাঠ মুস্তাহাব

যানবাহনে উঠার সময়, যানবাহন থেকে নীচে অবতরনের সময়, অন্যান্য যাত্রীদের সাথে সাক্ষাতের সময়, প্রত্যেক নামাযের পর এবং প্রভাত কালে তালবিয়া পাঠ করা মুস্তাহাব।

এহরামের সময় থেকে ঈদের দিন জামরাতুল আকাবায় পৌছা পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করতে হয়।

فَاِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَمْ يَزَلْ يُلَبِّىْ حَتَّى بَلَغَ الْجَمْرَةِ–

কারন, নবী করীম (সাঃ) জামারায় পৌছা পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করছিলেন। (আল জামায়াহ্)

এটা হল ইমাম ছাওরী, আহনাফ, শাফী (রাহঃ) এবং অধিকাংশের মতামত।

আর ইমাম আহমাদ ও ইসহাক (রাহঃ) এর মতামত হল, সকল পাথর নিক্ষেপ পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করতে হয়।

আর ইমাম মালেক (রাহঃ) এর মতামত হলো, আরাফার দিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করতে হয়।

আর উমরা আদায়কারী কালো পাথরকে চুমু দেয়া পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন–

اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يُمْسِكُ عَنِ التَّلْبِيَّةِ فِى الْعُمْرَةِ اِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ– (رواه الترمذى وقال هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند اكثر اهل العلم)

নবী করীম (সাঃ) যখন কালো পাথরকে চুমা দিতেন তখন তালবিয়া থেকে বিরত থাকতেন।

১৩। মশা, ছারপোকা এবং কষ্টদায়ক পিপিলিকা মারা সিদ্ধ।

আতা বলেন, এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞাসা করল, এহরাম অবস্থায় ছারপোকা ও পিপিলিকা মারা সম্পর্কে। তিনি বললেন–

اَلْقِ عَنْكَ مَا لَيْسَ مِنْكَ– যা কিছু তোমার জন্য উপকারী নয়, তা তোমার শরীর থেকে নিক্ষেপ করা।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এহরাম অবস্থায় ছারপোকা মারলে কোন দোষ নেই।

ইবনু তাইমিয়া বলেছেন, যা কিছু সাধারনত মানুষ কে কষ্ট দেয়, তা হত্যা করা বৈধ। যেমন সর্প ও বিচ্ছু ইত্যাদি।

তেমনি হিংস্র জন্তু যদি আক্রমন করে তবে এহরাম অবস্থায় তাকে হত্যা করা বৈধ।

১৪। পাঁচটি ফাসিক প্রাণি হত্যা করা বৈধ।

ফাসিক শব্দের অর্থ বের হওয়া। এই পাঁচটি প্রাণি কষ্টদাতা হিসাবে অন্যান্য প্রাণীর অভ্যাস থেকে বের হয়ে গেছে। তাই এদেরকে ফাসিক বলা হয়।

হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِى الْحَرَمِ اَلْغُرَابُ وَالْحَدَ أَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرِ–

পাঁচটি প্রাণিই ফাসিক। এদেরকে হারাম শরীফের ভিতরে হত্যা করা বৈধ। এরা হল কাক, রক্তচুষক (কাখলাশ) বিচ্ছু, ইদুঁর এবং হিংস্র কুকুর। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

খুখারীর বর্ণনায় একটি বৃদ্ধি করা হয়েছে তাহল, 'সাপ'।

১৫। এহরাম অবস্থায় মাথার চুল বাঁধা এবং আঁচড়ানো বৈধ।

নবী করীম (সাঃ) হযরত আয়িশা (রাঃ) কে বলেছেন–

اِنْقَضِىْ رَأْسَكَ وَامْتَشِطِىْ– (رواه مسلم)

তুমি চুল আঁচড়ায়ে তোমার মাথা পরিপাটি করে নাও। (মুসলিম)

১৬। নারীর জন্য মোজা পরা সিদ্ধ।

হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) মহিলাদের জন্য মোজা পরার অনুমতি দান করেছেন। (আবু দাউদ, শাফী)

এহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বিষয় সমুহ

১। স্ত্রী সহবাস করা অথবা সহবাসে উৎসাহিত কারী বিষয় সমূহ নিষিদ্ধ। যেমন, চুমু দেয়া ও খাহেসের সাথে সম্পর্ক করা ইত্যাদি।

২। আল্লাহর আনুগত্যের পরিপন্থী পাপ-কার্য করা।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন–

اَلْمُحْرِمُ يَشُمُّ الرَّيْحَانَ وَ يَنْظُرُ فى المراءة وَ يَتَدَاوى بِأَكْلِ الزَّيْتِ وَالسَّمَنِ–

মুহরিম ব্যক্তি ঘ্রাণ নিতে পারবে, আয়নায় দেখতে পারবে এবং ঔষধের জন্য তেল ও ঘি খেতে পারবে। (বোখারী)

৯। বেল্ট কোমরে বাঁধা এবং আংটি পরিধান করা।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন–

لاَ بَأْسَ بِالْهِيَانِ وَالْخَاتَمِ لِلْمُحْرِمِ–

কমরে বেল্ট বাঁধা এবং আংটি পরা মুহরিম ব্যক্তির জন্য দোষনীয় নয়।

১০। সুরমা লাগানো।

উলামাগণের সর্ব সম্মত মত হল, ঔষধ হিসাবে সুরমা লাগানো জায়েয, সৌন্দর্যের জন্য জায়েয নয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন–

يَكْتَحِلُ الْمُحْرِمُ بِاىِّ كُحْلٍ اِذَا رَمِدَ مَالَمْ يَكْتَحِلُ بِطِيْبٍ وَمِنْ غَيْرِ رَمَدٍ–

চোখ ফোটা রোগ হলে মুহরিম ব্যক্তি যে কোন প্রকার সুরমা লাগাতে পারবে। কিন্তু খুশবুদার হলে কিংবা চোখ ফোটা রোগ না হলে সুরমা লাগানো যাবে না।

১১। ছাতার ছায়া এবং তাঁবু ও ঘরের ছায়ায় আশ্রয় নেয়া জায়েয।

হযরত উম্মাল হোসাইন (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (সাঃ) এর সাথে বিদায় হজ্বে হজ্ব করেছি। আমি উসামা বিন যায়দ এবং বিলালকে দেখেছি, তাদের একজন নবী করীম (সাঃ) এর উটনি ধরে আছেন এবং অন্য জন কাপড় উঠিয়ে সূর্যের তাপ থেকে নবী করীম (সাঃ) কে ছায়া দিচ্ছেন জমরাতুল আকাবার পাথর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত। (আহ্মাদ, মুসলিম)

১২। শিক্ষা দেয়ার জন্য খাদেমকে প্রহার করা বৈধ।

হযরত আসমা বিনতে আবুবকর (রাঃ) বলেন, আমরা নবী করীম (সাঃ) এর সাথে হজ্বের উদ্দেশ্যে যাত্রা করছি, 'আরযা' নামক স্থানে নবী করীম (সাঃ) অবস্থান করলেন এবং আমরাও অবস্থান করলাম। হযরত আয়িশা (রাঃ) নবী করীম (সাঃ) এর পাশে বসলেন এবং আমি বসলাম আবুবকরের পাশে। নবী করীম (সাঃ) এর জিনিসপত্র এবং আবুবকরের জিনিসপত্র ছিল আবুবকরের গোলামের সাথে : আবুবকর গোলামের আপেক্ষা করছিলেন। গোলাম আসল বটে, তবে তার সাথে উট কোথায়? সে জবাব দিল, উটটি গতকাল হারিয়ে গেছে। আবুবকর (রাঃ) বললেন, একটি মাত্র উট, তুমি হারিয়ে ফেললে! এই বলে তিনি তাকে প্রহার করতে লাগলেন। নবী করীম (সাঃ) মৃদু হেসে বললেন–

اُنْظُرُوْا لِهَذَا الْمُحْرِمُ مَا يَصْنَعُ– এ মুহরিমের প্রতি দেখ, সে কি করছে।

নবী করীম (সাঃ) এর চেয়ে বেশী কিছু বললেন না। (আহ্মাদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ্)

ইমাম বুখারী (রাহঃ) হযরত আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন–

انَّهَا كَانَتْ لاَ تَرى بِالتُّبَانِ بَـأْسًا لِلْمُحْرِمِ–

হযরত আয়িশা (রাঃ) এর মতানুসারে মুহরিমের জন্য ছোট সেলওয়ার পরতে কোন দোষ নেই।

৩। মূখ মণ্ডল ঢাকা

ইমাম শাফী ও সাইদ বিন মানসুর কাসেম থেকে বর্ণনা করে বলেছেন, হযরত উছমান, যায়দ বিন ছাবিত এবং মারওয়ান বিন হেকম এহরাম অবস্থায় মূখ ঢেকে রাখতেন।

তাউছ বলেন, এহরাম অবস্থায় ধুলা বালু থেকে মূখ ঢেকে রাখা সিদ্ধ।

মুজাহিদ বলেছেন, হাওয়া বেশী হলে এহরাম অবস্থায় ছলফগণ মূখ ঢেকে রাখতেন।

৪। নারীর জন্য মোজা পরিধান করা।

হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন–

اَنَّ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم قَدْ كَانَ رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ فِي الْخُفَيَّتِىْ–

নবী করীম (সাঃ) নারীর জন্য মুজা ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন। (আবু দাউদ, শাফী)

৫। ভূলবশতঃ মাথা ঢাকা।

ইমাম শাফী বলেছেন, ভূলে মাথা ঢাকা অথবা ভুলে কামিছ পরিধান করলে তাতে কোন দোষ নেই।

আহনাফের নিকট ভুলে মাথা ঢাকলে বা কামিছ পরলে ফিদিয়া দিতে হবে।

আর আতা বলেছেন, কেবল ইস্তেগফার করতে হবে।

৬। শিংগা লাগানো এবং দাঁত তুলে ফেলা।

হাদীস দ্বারা প্রমানিত যে–

اَنَّ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم اِحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَسَطَ رَأْسِهِ–

মুহরিম অবস্থায় নবী করীম (সাঃ) নিজ মাথার মাঝখানে শিংগা লাগিয়েছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, মুহরিম ব্যক্তি তার দাঁত তুলে ফেলতে পরবে।

৭। মাথায় এবং শরীরে খাজুওয়ানী।

হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন, তাকে এহরাম অবস্থায় সরীরে খাজুওয়ানী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল? তিনি বললেন–

نَعَمْ، فَلْيُحَكِّكْهُ وَلْيُشَدِّدْ– (رواه البخارى ومسلم ومالك)

হ্যাঁ! সে খাজুওয়াতে পারবে এবং সে জোরে খাজুওয়াতে পারবে। (বোখারী, মুসলিম, মালিক)

৮। আয়নায় দৃষ্টি দেয়া এবং ফুলের ঘ্রাণ নেয়া

তালবিয়া পাঠের পর দোয়া করা

হযরত কাসেম, মুহাম্মাদ বিন আবুবকর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করে বলেছেন, তালবিয়া পাঠের পর নবীর প্রতি দূরূদ পাঠ করা মুস্তাহাব।

নবী করীম (সাঃ) যখন তালবিয়া পাঠ করা থেকে বিরত থাকতেন–

سَأَلَ اللّٰهَ مَغْفِرَتَهٗ وَرِضْوَانَهٗ وَاسْتَعَاذَهٗ مِنَ النَّاسِ– (رواه الطبرانى)

তখন আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইতেন, আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করতেন এবং মানুষ থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাইতেন। (তিবরাণী)

এহরাম অবস্থায় যা করা বৈধ

১। এহরাম অবস্থায় গোসল করা এবং এহরামের কাপড় ধৌত করা সিদ্ধ।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, তিনি মুহরিম অবস্থায় জুহফা নামক স্থানে গোসল খানায় প্রবেশ করলেন। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, তুমি কি এহরাম অবস্থায় গোসল খানায় প্রবেশ করেছ?

فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ مَا يَعْبَاءُ بِاَوْ سَاخِفَا شَيْئًا–

তিনি বললেন, আল্লাহ তায়ালার আমাদের ময়লার কোন প্রয়োজন নেই।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন হানীন বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বললেন, এহরাম অবস্থায় মাথা ধৌত করা জায়েয। আর ইবনুল মুছাওয়ীর বললেন, এহরাম অবস্থায় মাথা ধৌত করা সিদ্ধ নয়। আব্দুল্লাহ বিন হানীন বলেন, ইবনে আব্বাস আমাকে পাঠালেন আবু আইয়ূবের নিকট। আমি দেখলাম, তিনি কূপের নিকট গোসল করছেন। আমি তাকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, সে কে? আমি বললাম, আমি আব্দুল্লাহ বিন হানীন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) আমাকে পাঠিয়েছেন আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করার জন্য যে, নবী করীম (সাঃ) এহরাম অবস্থায় কিভাবে গোসল করতেন? আবু আইয়ূব আনসারী (রাঃ) হাত দিয়ে মাথার কাপড় সরালেন এবং বললেন, মানুষ তার মাথায় পানি দিতে পারবে। তিনি নিজের মাথায় পানি দিয়ে হাত দ্বারা নাড়াচাড়া করলেন। তিনি মাথায় আগে ও পিছে হাত নিয়ে গেলেন এবং বললেন–

هٰكَذَا رَأَيْتُهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَفْعَلُ– (رواه الجماعة الا الترمذى)

আমি নবী করীম (সাঃ) কে এ ভাবে করতে দেখেছি।

১। গোসলে সুগন্ধি সাবান ব্যবহার জায়েয তেমনি চুল আঁচড়ানোও জায়েয। নবী করীম (সাঃ) হযরত আয়িশা (রাঃ) কে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, তোমার মাথা পরিপাটি কর এবং চুল আঁচড়াও। (মুসলিম)

২। ছোট সেল্‌ওয়ার পরিধান করা।

৩। ঝগড়া-ফাসাদ করা।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–

فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَفُسُوْقَ وَلاَجِدَالَ فِى الْحَجِّ–

এ সব মাসে যে ব্যক্তি হজ্বের নিয়ত করবে, সে স্ত্রী সহবাস করবে না, পাপ-কার্য করবে না এবং ঝগড়া-বিবাদও করবে না। (সূরা বাকারা)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

مَنْ حَجَّ وَلَمْ يرفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ–(متفق عليه)

যে ব্যক্তি হজ্ব করল এবং স্ত্রী সহবাস ও পাপ-কার্য থেকে বিরত থাকল, সে নিষ্পাপ হয়ে বাড়ীতে ফিরল, যেমন তার মা তাকে নবজাত শিশুরূপে প্রসব করেছেন।

কিন্তু সত্য প্রতিষ্ঠা করা এবং বাতিলকে দমন করার জন্য তর্ক যুদ্ধ করা বৈধ। আল্লাহ বলেছেন–

وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ– তাদেরকে উত্তম পন্থায় যুক্তি-তর্ক দ্বারা বুঝান।

৪। পুরুষের জন্য সিলাই যুক্ত কাপড় পরা নিষিদ্ধ। যেমন, সার্ট, কামীছ, জুববা ও সেলওয়ার ইত্যাদি।

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

لاَ يَلْبِسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيْصَ وَالْعِمَامَةَ وَلاَالْبُرْنُس وَلاَ السَّرَاوِيْلَ وَلاَ ثَوْبًا بِهِ وَرْسٌ وَلاَ زَعْفرَانَ وَلاَلْخُفَّيْنِ الاَّ انْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُوْنَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ–

মুহরিম ব্যক্তি কামীছ, পাগড়ী, তকি এবং পা-জামা পরবে না। তেমনি খুশবুদার ও জাফরান যুক্ত কাপড় এবং চামড়ার মুজা পরবে না । কিন্তু যদি জুতা না পাওয়া যায় তবে পায়ের গিরার উপরাংশ বরাবর মুজা কেটে নেবে। তাহলে মুজা গিরার নীচে থাকবে। (নাসাঈ)

কিন্তু উক্ত হাদীসে বর্ণিত মুজা কাটার হুকুম রহিত হয়ে গেছে। কারন, উক্ত হাদীস নবী করীম (সাঃ) মদিনায় থাকতে বলেছেন আর হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) আরফার মাঠে খুৎবায় বলেছেন–

مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبِسِ الْخُفَّيْنِ وَلَمْ يَجِدْ الاِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيْلَ–

যে ব্যক্তি জুতা পাবে না, সে মুজা পরবে। আর যে ব্যক্তি লুঙ্গি পাবে না, সে পা-জাম পরবে। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

আর এহরাম অবস্থায় মহিলাদের জন্য সিলাই যুক্ত কাপড় পরা বৈধ। কিন্তু মুখাবরণ দ্বারা মুখ ঢাকা এবং হাত মুজা পরা হারাম। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

لاَ تُنَقِّبُ الْمَرْأَةُ وَلاَ تَلْبِسُ الْقُفَّازَيْنِ– নারী মুখাবরন পরবে না এবং হাত মুজাও পরবে না। (বোখারী, আহ্‌মাদ)

কিন্তু যদি নারীরা পুরুষদের মুখোমুখী হয়, তবে মাথায় উড়না দ্বারা মুখ ঢাকা বৈধ। হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন, বিদায় হজ্বে আমরা নবী করীম (সাঃ) এর সাথে ছিলাম, যখন আমাদের পাশ দিয়ে কাফেলা যাত্রা করত, তখন আমরা মাথার উড়না মুখমণ্ডলের উপর ঝুলিয়ে দিতাম।

فَاِذَا جَاوَزُوْنَا كَشَفْنَاهُ– (ابوداؤد وابن ماجة، الدارقطنى) যখন তারা চলে যেত, তখন আমরা মুখ-মণ্ডল খুলে দিতাম।

৫। এহরাম অবস্থায় বিবাহ করা এবং বিবাহ দেয়া নিষিদ্ধ।

হযরত উছমান বিন আফ্‌ফান (রাঃ) বলেন, রাসূল (সঃ) বলেছেন–

لاَيَنْكَحُ الْمُحْرِمُ وَلاَيُنْكَحُ وَلاَيَخْطُبُ– (رواه مسلم وغيره)

মুহরিম ব্যক্তি বিবাহ করবে, কাউকে বিবাহ দেবে না এবং বিবাহের প্রস্তাবও দেবে না।

কিন্তু অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, নবী করীম (সাঃ) হযরত মায়মুনাকে মক্কা যাওয়ার পথে বিবাহ করেছেন।

মুসলিম শরীফের বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে–

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلاَلٌ– (مسلم)

নবী করীম (সাঃ) তাঁকে হালাল অবস্থায় বিয়ে করেছেন। (মুসলিম)

এ দুই বর্ণনার মধ্যে মূলতঃ কোনো বিরোধ নেই, রাসূল (সাঃ) ইহরাম অবস্থায় আক্‌দ করেছেন এবং হালাল হয়ে মিলিত হয়েছেন।

৬। কাপড় কিংবা শরীবে খুশবু লাগানো এহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ।

নবী করীম (সাঃ) সেই ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছেন, যে এহরাম অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিল।

لاَ تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ وَلاَ تَمُسُّوْهُ طِيْبًا، فَاِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا–

তাঁর মাথা ঢাকবে না এবং তাকে খুশবু লাগাবে না। কারন, সে পরকালে লাব্বায়েক বলা অবস্থায় উঠবে। (বোখারী, মুসলিম, তিরমিযী)

নবী করীম (সাঃ) এক ব্যক্তির প্রশ্নের জবাবে বলেছেন–

اَمَّا الطِّيْبُ الَّذِىْ بِكَ فَاغْسِلْهُ– ثَلاَثَ مَرَّاتٍ– (رواه البخارى)

তোমার সাথে যে খুশবু আছে, তা ধৌত কর। তিন বার বলেছেন। (বোখারী)

৭। নখ কাটা, চুল কাটা এবং চুল মুণ্ডানো কিংবা চুল উঠানো নিষিদ্ধ।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন–

وَ لاَ تَحْلِقُوْا رُؤُوْسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ–

আর তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত মাথা মুণ্ডাবে না, যতক্ষণ না কুরবাণীর পশু যথাস্থানে পৌঁছে যায়। (সূরা বাকারা)

আল্লাহ্ তায়ালা আরো বলেছেন–

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْبِهِ اَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ اَوْصَدَقَةٍ اَوْنُسُكٍ–

তোমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ হয়ে পড়বে, কিংবা তার মাথায় যদি কোন কষ্ট হয়, তবে পরিবর্তে সে রোযা রাখবে কিংবা সাদাকা করবে অথবা কুরবানী করবে। (সূরা বাকারা)

আর উলামাদের সর্ব সম্মত রায় হল, বিনা ওযরে এহ্রাম অবস্থায় নখ কাটা সিদ্ধ নয়।

৮। মুহ্‌রিম ও গায়র মুহ্‌রিম সকলের জন্য হেরেমের সীমানায় স্থল-জন্তু হত্যা করা জন্তু তাড়ানো এবং তাজা খাস কাটা নিষিদ্ধ। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

اِنَّ هذَا الْبَلَدَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللّهِ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَيُعْضَرُ شَجَرُهَا وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا وَلاَ يَحِلُّ سَاقِطُهَا اِلاَّ لِمُنْشِرٍ–

এই শহর আল্লাহ্ কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়ায় পরকাল পর্যন্ত এর গাছ কাটা, শিকার যোগ্য জন্তু বিতাড়িত করা, তাজা খাস কাটা এবং পড়ে থাকা দ্রব্য উঠানো হারাম। অবশ্য যার বস্তু হারিয়েছে এবং সে প্রচার করছে, সে উঠাতে পারবে। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন–

وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَادُمْتُمْ حُرُمًا–

আর এহ্রাম অবস্থায় তোমাদের উপর স্থল জন্তুর শিকার হারাম করা হয়েছে। (সূরা)

কিন্তু যদি তুমি নিজে শিকার না কর এবং তোমার জন্য শিকার না করা হয়, তবে তুমি খেতে পারবে।

হযরত যাবের (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلاَلٌ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ مَالَمْ تُصَيِّدُوْهُ اَوْ يُصَدُّ لَكُمْ–

এহ্রাম অবস্থায় স্থল-জন্তুর মাংস খাওয়া হালাল, যদি তুমি নিজে শিকার না কর কিংবা তোমার জন্য শিকার না করা হয়। (আহ্‌মাদ, তিরমিযী)

হযরত আব্দুর রহমান বিন ওসমান তামিমী (রাঃ) বলেন, আমরা তালহা বিন উবাইদুল্লাহর সাথে সফরে ছিলাম। একটি পাখী হাদিয়া দেয়া হল। আমরা মুহরিম ছিলাম। তালহা ঘুমিয়ে ছিলেন। আমাদের অনেকে খেলাম। আর কেউ কেউ খেলেন না। তালহা যখন জাগ্রত হলেন তখন বললেন–

اَكَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ–

আমরা নবী করীম (সাঃ) এর সাথে এটা খেয়েছি। (আহ্‌মাদ, মুসলিম)

এহ্‌রাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ করার হুকুম

যদি কারো ওযর হয় এবং নিষিদ্ধ কাজ করতে বাধ্য হয়, তবে এহ্‌রাম অবস্থায় সে স্ত্রী-সহবাস ব্যতিত অন্য যে কোন নিষিদ্ধ কাজ করতে পারবে। এতে হজ্ব বা উমরা বাতিল হবে না। কিন্তু তার উপর ফিদিয়া দেয়া ওয়াজিব হবে। যেমন, কেউ কোন ওযরে মাথা মুণ্ডাল, অথবা সিলাই যুক্ত কাপড় পরিধান করল, তবে তার উপর ওয়াজিব হবে একটা বকরি জবাই করা কিংবা ছয়জন মিসকীনকে খাদ্য দেয়া অথবা তিনটি রোযা রাখা।

হযরত কা'য়াব বিন আযজা (রাঃ) বলেন, হুদায়বিয়ার সময় নবী করীম (সাঃ) তার পাশ দিয়ে গেলেন। তার মাথায় চুলে ছিল বেশী উকুন। নবী করীম (সাঃ) বললেন–

اَحْلِقْ ثُمَّ اذْبَحْ شَاةً نُسُكًا اَوْ صُمْ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ اَوْ اَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِيْنَ–

মাথা মুণ্ডায়ে নাও। তারপর একটি বকরি জবাই কর কিংবা তিন দিন রোযা রাখ অথবা ছয় জন মিসকীনকে খাদ্য দাও। (বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ)

আর যদি কেউ বিনা ওযরে নিষিদ্ধ কাজ করে, ইমাম আবু হানীফা (রাহঃ) এর মতানুসারে তার উপর কোরবানী দেয়া ওয়াজিব হবে।

আর ইমাম শাফী (রাহঃ) এর মতানুসারে, সে ফিদিয়া দেবে। আর যে ব্যক্তি না জেনে অথবা ভূলবশত নিষিদ্ধ কাজ করে, তার উপর কিছু নেই।

হযরত ইয়া'লা বিন উমাইয়া (রাঃ) বলেন, জা'রানা নামক স্থানে এক ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ) এর সাথে দেখা করল। তার পরনে ছিল জুববা এবং তার মাথায় ও দাড়িতে ছিল হলুদ রং লাগানো। সে বললো, হে রাসুলুল্লাহ! আমি এ অবস্থায় এহ্‌রাম বেঁধেছি। নবী করীম (সাঃ) বললেন–

اغْسِلْ عَنْكَ الصُّفْرَةَ وَانْزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ وَمَا كُنْتَ صَانِعًا فِىْ حَجِّكَ فَاصْنَعْ فِىْ عُمْرَتِكَ–

তুমি হলুদ রং ধৌত করে নাও এবং জুব্বা খুলে ফেল। আর হজ্বের জন্য যা করবে, উমরার জন্য তাই করবে। (আল জামায়াহ্‌, ইবনে মাজাহ্‌)

হযরত আতা (রাহঃ) বলেছেন–

إِذَا تَطَيَّبَ أَوْ لَبِسَ جَاهِلاً أَوْ نَاسِيًا فَلاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ–

কেউ যদি না জেনে অথবা ভূলবশতঃ খুশবু লাগায় কিংবা সিলাই করা কাপড় পরে তাবে তার উপর কোন কাফ্‌ফারা নেই। (বোখারী)

এহ্‌রাম তথা হজ্বের প্রকার

এহ্‌রাম তথা হজ্ব তিন প্রকার। ক্বেরান, তামাত্তু এবং ইফরাদ। উলামাদের ঐকমত্য হল যে, এ তিন প্রকার হজ্বই জায়েয।

হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন, বিদায় হজ্বের সময় আমরা নবী করীম (সাঃ)র সাথে ছিলাম। আমাদের কেউ উমরার এহ্‌রাম বেঁধেছেন। কেউ হজ্ব ও উমরার এহ্‌রাম বেধেঁছেন। নবী করীম (সাঃ) কেবল হজ্বের এহ্‌রাম বেঁধেছেন। যারা উমরার এহ্‌রাম বেঁধেছেন, তারা তাওয়াফে কুদুমের পর হালাল হয়ে গেছেন। আর যারা হজ্বের ইহ্‌রাম বা হজ্ব ও উমরার এহ্‌রাম বেঁধেছেন, তারা ঈদের দিন পাথর নিক্ষেপ ও মাথা মুণ্ডানোর পর হালাল হয়েছেন। (আহ্‌মাদ, বোখারী, মুসলিম)

(ক) ক্বেরান হজ্ব

হজ্বের মাসসমূহে মীকাত থেকে একত্রে হজ্ব ও উমরার এহ্‌রাম বাঁধবে এবং বলবে–

لَبَّيْكَ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ– আমি হজ্ব ও উমরাসহ তোমার ডাকে সাড়া দিলাম।

তারা মক্কায় পৌছে উমরা আদায় করে এহ্‌রাম অবস্থায়ই থাকবে। হজ্ব আদায় করার পর ঈদের দিন পাথর নিক্ষেপ ও মাথা মুণ্ডানোর পর হালাল হবে।

(খ) তামাত্তু হজ্ব

তামাত্তু শব্দের অর্থ সুবিধা ভোগ করা। কারন, তামাত্তুকারী উমরা আদায়ের পর হালাল হওয়ার সুবিধা ভোগ করে থাকেন। তামাত্তুকারী হজ্বের মাসসমূহে মীকাত থেকে উমরার এহ্‌রাম বাঁধবে এবং বলবে–

لَبَّيْكَ عُمْرَةً– তারা মক্কাতে পৌছে উমরা আদায় করে হালাল হয়ে যাবে। অতঃপর ৮ই যিলহজ্ব তারিখ মক্কার অবস্থান স্থল থেকে হজ্বের এহ্‌রাম বাঁধবে এবং হজ্ব আদায় করবে।

(গ) ইফ্‌রাদ হজ্ব

ইফ্‌রাদ হজ্ব আদায়কারী হজ্বের মাসসমূহে মীকাত থেকে এবং যারা মীকাতের ভিতরে থাকেন, তারা তাদের গৃহ থেকে কেবল হজ্বের এহ্‌রাম বাঁধবে এবং বলবে–

لَبَّيْكَ بِحَجٍّ–। তারা হজ্ব আদায় করে ঈদের দিন হালাল হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি মক্কার বাইরে থেকে আসবে এবং তার সাথে কুরবানীর পশু থাকবে না, তার ইফরাদের এহ্‌রামকে উমরায় পরিবর্তন করা জায়েয। এমতাবস্থায় তাকে কুরবানী করতে হবে।

আর যে ব্যক্তি ক্বেরান হজ্বের নিয়ত করে আসবে এবং তার সাথে কুরবানীর পশু থাকবে না, তার ক্বেরান হজ্বের এহ্‌রামকে উমরায় পরিবর্তন করা সিদ্ধ। বরং এটা উত্তম।

উত্তম হজ্ব

ইমাম আবু হানীফা (রাহঃ) এর মতানুসারে ক্বেরান হজ্ব করা উত্তম। আর তামাত্তু হজ্ব, ইফ্‌রাদ হজ্বের চেয়ে উত্তম। আর ইমাম মালিক ও শাফী (রাহঃ) এর মতানুসারে ইফ্‌রাদ হজ্ব করা উত্তম।

আর ইমাম আহমাদ (রাহঃ) এর মতানুসারে তামাত্তু হজ্ব করা উত্তম। উক্ত মাজহাবই মানুষের জন্য সহজ এবং এটাই হাদীসের অনুরূপ।

হযরত আনাছ (রাঃ) বলেন, বিদায় হজ্বের সময় হযরত আলী (রাঃ) আসলেন ইয়েমেন থেকে নবী করীম (সাঃ) বললেন, তুমি কিভাবে এহ্‌রাম বেঁধেছ? আলী বললেন, যে ভাবে আল্লাহর রাসূল এহ্‌রাম বেঁধেছেন। নবী করীম (সাঃ) বল্‌লেন–

لَوْلاَ اَنَّ مَعَيِ الْهَدْىَ لاَحَلَلْتُ–

আমার সাথে যদি কুরবানীর পশু না থাকত, তা হলে আমি হালাল হয়ে যেতাম। (বোখারী)

হযরত যাবের (রাঃ) বিদায় হজ্বের বর্ণনা দিয়ে বলেছেন। নবী করীম (সাঃ) উমরা আদায় করে সাঈ শেষে বলেছেন–

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْىٌ فَلْيَحِلَّ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً–

যার সাথে কুরবানীর পশু নেই, সে যেন হালাল হয়ে যায় এবং একে উমরায় পরিবর্তন করে দেয়।

তখন সুরাকা বিন মালিক (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! এটা কি এই বৎসরের জন্য, না চিরদিনের জন্য? নবী করীম (সাঃ) বললেন–

بَلْ لاَبَدٍ اَبَدْ– বরং এটা চির দিনের জন্যে। (মুসলিম)

হযরত হাফসা (সঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) তার স্ত্রীগণকে হালাল হওয়ার নির্দেশ দিলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! মানুষ উমরা আদায় করে হালাল হয়ে গেছে। আপনি হালাল হননি কেন? তিনি জবাব দিলেন–

اِنِّىْ لَبَّدْتُ رَأْسِ وَقَلَّدْتُ هَدْىِ فَلاَ اُحِلُّ حَتَّى اَنْحَرَ هَدْىِ–

আমি হজ্ব ও উমরার নিয়ত করেছি এবং কুরবানীর পশুর গলায় কেলাদা (কোরবানীর চিহ্ন) বেঁধেছি। সুতরাং জবাই করার পরই হালাল হব। (মুসলিম)

মসজিদে হারামের পাশে বসবাসকারীদের হজ্জ

মসজিদে হারামের পাশে বসবাসকারীরা ইফরাদ হজ্ব করবে এবং তাদের জন্যে একই সাঈ যথেষ্ট হবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, তাকে হজ্বে তামাত্তু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি বললেন, বিদায় হজ্বে মুহাজির ও আনসারগণ এবং নবী করীম (সাঃ) এর স্ত্রীগণ এহরাম বাঁধলেন। আমরাও এহরাম বাঁধলাম। যখন মক্কায় এলাম, তখন নবী করীম (সাঃ) বললেন–

اِجْعَلُوْا اِهْلاَ لَكُمْ بِالْحَجِّ عُمْرَةً اِلاَّ مَنْ قَلَّدَ الْهَدْىَ–

তোমাদের হজ্বের এহরামকে উমরায় পরিবর্তিত করে দাও। কিন্তু যে ব্যক্তি কুরবানীর পশু পাঠিয়েছে। তখন আমরা ক্বাবা গৃহ তাওয়াফ করলাম, সাফা ও মারওয়াতে সাঈ করলাম, তারপর সিলাইকৃত কাপড় পরলাম এবং স্ত্রীর সাথে মিলিত হলাম। নবী করীম (সাঃ) বললেন, যে পশু পাঠিয়েছে, তার পশু নির্ধারিত স্থানে না পৌছা পর্যন্ত সে হালাল হতে পারবে না।

অতঃপর আট তারিখ আমরা হজ্বের এহরাম বাঁধলাম। আরাফা থেকে এসে আমরা তাওয়াফে এফাজা করলাম এবং সাফা ও মারওয়াতে সাঈ করলাম। আমাদের হজ্ব পূর্ণ হল এবং আমাদের উপর কুরবানী করা ওয়াজিব হল। আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন–

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ–

যে ব্যক্তি হজ্ব ও উমরা একত্রে পালন করতে চায়, তবে যা কিছু সহজলভ্য, তা দিয়ে কুরবানী করাই তার উপর কর্তব্য। আর যে পশু পাবে না, সে হজ্বের দিন গুলোতে রোযা রাখবে তিনটি এবং সাতটি রাখবে গৃহে ফিরে আসার পর। (সূরা বাকারা)

কুরবানীর জন্য একটি বকরিই যথেষ্ট হবে। কারন, তারা তো একই বৎসরে হজ্ব ও উমরা দুটিই পালন করতে পারছে। আল্লাহর কিতাব ও নবীর সুন্নাতে তা বর্ণিত হয়েছে। আহলে হারাম ব্যতিত আল্লাহ্ তায়ালা মানুষের জন্য তা জায়েয করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেছেন–

ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ–

এ নির্দেশটি তাদের জন্য, যারা মসজিদে হারামের আশে-পাশে বসবাস করে না। (সূরা বাকারা)

আর হজ্বের মাস হল সাওয়াল, জ্বিল কায়দা ও জ্বিল হজ্ব। এ সব মাসে যারা তামাত্তু করবে, তাদের উপর কুরবানী অথবা রোযা ওয়াজিব হবে। (বোখারী)

উক্ত হাদীস দ্বারা কয়েকটি মাসআলা প্রমানিত হয়।

(এক) হারাম শরীফের বাসিন্দাগণ ইফরাদ হজ্বই করবেন। তাদের জন্য তামাত্তু বা কেরান হজ্ব করা জায়েয নয়। আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন–

ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ–

এ নির্দেশটি তাদের জন্য, যারা মসজিদে হারামের আশে-পাশে বসবাস করে না। (সূরা বাকারা)

মসজিদে হারামের বাসিন্দা কারা?

(ক) আহনাফ (রাহঃ) এর মতানুসারে মীকাতের ভিতরে যারা বসবাস করেন, তারা হলেন হারামের বাসিন্দা।

(খ) ইমাম মালেক (রাহঃ) এর মতানুসারে মক্কার বাসিন্দাগণ হলেন হারামের বাসিন্দা।

(গ) ইমাম শাফী (রাহঃ) এর মতানুসারে কছর নামাযের দূরত্ব পর্যন্ত যারা বসবাস করে, তারা হারামের বাসিন্দা।

(দুই) তামাত্তু হজ্ব পালনকারী প্রথমে তাওয়াফ কুদুম করবে এবং সাফ ও মারওয়াতে সাঈ করবে। অতঃপর আরাফা থেকে এসে তাওয়াফে এফাজা করবে এবং সাফা ও মাওয়াতে আবার সাঈ করবে।

আর কেরান ও ইফরাদ হজ্ব পালনকারী একই তাওয়াফ এবং একই সাঈ করবে। অর্থাৎ আগে সাঈ করলে আরাফা থেকে এসে আর সাঈ করতে হবে না। তারা কেবল তাওয়াফে এফাজা করবে। হযরত যাবের (রাঃ) বলেন–

قَرَنَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اَلْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَطَوَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا– (رواه الترمذى و قال حديث حسن)

নবী করীম (সাঃ) হজ্বে ক্বেরান করেছেন এবং হজ্ব ও উমরার জন্যে একই তাওয়াফ করেছেন।

নবী করীম (সাঃ) হযরত আয়িশা (রাঃ) কে বলেছেন–

اَنَّ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ لِعَائِشَةَ طَوَافُكَ بِلْبَيْتِ وَبَيْنَ صَفَا وَالْمَرْوَةِ يَكْفِيْكَ لِحَجْكَ وَعُمْرَتِكَ– (رواه مسلم)

তোমার ক্বাবা গৃহের তাওয়াফ এবং সফা ও মারওয়াতে সাঈ, তোমার হজ্ব ও উমরার জন্য যথেষ্ট হবে।

ইমাম আবু হানীফা (রাহঃ) এর মতানুসারে দুই তাওয়াফ ও দুই সাঈ জরুরী। অর্থাৎ আগে উমরার জন্য সাঈ করলে ও আরাফা থেকে এসে তাওয়াফে এফাজা ও সাঈ করতে হবে।

(তিন) কেরান ও তামাত্তু হজ্ব পালনকারীর উপর কুরবানী করা ওয়াজিব। কোরবানীর পশু না পেলে হজ্বের দিন গুলোতে রোযা রাখবে তিনটি এবং গৃহে ফিরে এসে রোযা রাখবে সাতটি। এ ভাবে দশটি রোযা পূর্ণ করবে।

আর যারা হজ্বের সময় রোযা রাখতে পারবে না, তারা অবশ্যই পরে কাজা আদায় করবে।

নবী করীম (সাঃ) ক্বেরান হজ্ব করেছিলেন

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) যখন মক্কায় পৌছলেন, তখন প্রথমে তিনি কালো পাথরে চুমু দিলেন তারপর তিনি সাতবার ক্বাবাগৃহ তাওয়াফ করলেন এবং মাকামে ইবরাহীমে এসে দুই রাকআত নামায পড়লেন। অতঃপর সাফা পর্বতে আরোহন করলেন এবং

সাফা ও মারওয়া পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে সাত বার সাঈ করলেন। সাঈ কবার পর তিনি বললেন–

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْىٌ فَلْيَحِلَّ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً–

তোমাদের মধ্যে যার সাথে কুরবানীর পশু নেই, সে হালাল হয়ে যাবে এবং এহরামকে উমরায় পরিবর্তন করে দেবে।

কিন্তু নবী করীম (সাঃ) হালাল হলেন না। কারন, তার সাথে কুরবানীর পশু ছিল। তিনি হজ্ব শেষে ঈদের দিন হালাল হলেন। অতঃপর তিনি মক্কায় এসে তাওয়াফে এফাযা আদায় করলেন।

ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حُرِمَ مِنْهُ– তারপর তিনি সব কিছু থেকে হালাল হলেন।

মানুষের মধ্যে যাদের সাথে কুরবানীর পশু ছিল, তারাও নবী করীম (সাঃ) এর মত হজ্ব আদায় করলেন। (মুসলিম)

ইমাম বুখারী ও মুসলিম, হযরত ইবনে আব্বাস, আলী, আবু মুসা এবং হযরত আয়িশা (রাঃ) থেকে যে সব রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন, তা দ্বারা মহানবীর ক্বেরান হজ্ব করাই প্রমানিত হয়।

আর যে সব বর্ণনায় এসেছে যে, নবী করীম (সাঃ) একই তাওয়াফ এবং একই সাঈ করেছেন, এর অর্থ হল তাওয়াফে এফাযা। কারন তিনি কুদুম ও উমরার জন্য একই তাওয়াফ করেছিলেন। উমরার জন্য পৃথক কোন তাওয়াফ করেননি। ঈদের দিন তিনি তাওয়াফে এফাযা করেছেন মাত্র।

হজ্ব বাতিল হওয়া

এহরাম অবস্থায় স্ত্রীর সাথে মিলিত হলে হজ্ব বাতিল হয়ে যায়।

হযরত আলী, উমার এবং আবু হুরাইরা (রাঃ) এর ফতোওয়া হল, কেউ এহরাম অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করলে, তারা দুইজন তাদের হজ্ব পূর্ণ করবে এবং পরের বৎসর এর ক্বাজা আদায় করবে এবং কুরবানীও করবে।

আবুল আব্বাস তাবেঈ বলেছেন, কোন মুহরিম ব্যক্তি যদি প্রথম তাহাল্লুলের পূর্বে স্ত্রী সহবাস করে তবে সে তার ফাসেদ হজ্ব পূর্ণ করবে। তার উপর এর ক্বাজা আদায় করা এবং একটা উট কুরবানী করা ওয়াজিব হবে।

আর ইমাম আবু হানীফা (রাহঃ) এর মতানুসারে যদি আরাফার মাঠে অবস্থানের পূর্বে স্ত্রী সহবাস করে, তবে তার হজ্ব ফাসেদ হয়ে যাবে। পরের বৎসর এর ক্বাজা আদায় করা এবং একটা বকরি কুরবানী করা তার উপর ওয়াজিব হবে। আর আরাফায় অবস্থানের পর সহবাস করলে হজ্ব ফাসেদ হবে না এবং ক্বাজাও ওয়াজিব হবে না। তবে তার উপর একটা উট কুরবানী করা ওয়াজিব হবে।

যদি কোন মুহরিম ব্যক্তির স্বপ্নদোষ হয় কিংবা সে তার স্ত্রীকে স্পর্শ করে অথবা চুমু দেয়, তার উপর একটা বকরি জবাই করা ওয়াজিব হবে, বীর্য নির্গত হোক বা না হোক।

মুজাহিদ বলেছেন, এক ব্যক্তি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর নিকট এসে বললো, আমি এহরাম বেঁধেছি। অমুক মহিলা সাজসজ্জা করে আমার নিকট আসে। তখন আমি প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ

করতে পারি না । তিনি বললেন–

اِنَّكَ لَتَبَقُ لاَ بَأْسَ عَلَيْكَ اَهْرِقْ دَمًا وَقَدْتَمَّ حَجُّكَ– (رواه سيد بن منصور)

নিশ্চয়ই এটা তোমার বিয়ের ইচ্ছা, কোন অসুবিধা নেই। তুমি কোরবানী দাও তোমার হজ্ব পূর্ণ হয়ে গেছে।

মক্কী হারাম শরীফের সীমানা

উত্তর দিকে 'তান্‌য়ীম' নামক স্থান। এর দুরত্ব মক্কা থেকে ছয় কিলোমিটার। দক্ষিণ দিকে আজাহ্ নামক স্থান। এর দূরত্ব মক্কা থেকে বার কিলোমিটার। পূর্ব দিকে 'জা'রানা' নামক স্থান। এর দূরত্ব মক্কা থেকে চৌদ্দ কিলোমিটার। পশ্চিম দিকে 'শামিছী নামক স্থানে। এর দূরত্ব মক্কা থেকে পনর কিলোমিটার।

মুহিব উদ্দিন তাবেরী বলেছেন, আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল্লাহ বিন উত্‌বা থেকে ইমাম জুহ্‌রী বর্ণনা করে বলেছেন, জিবরাঈল (আঃ) এর প্রদর্শন অনুযায়ী সীমানা ধার্য করেছেন। আর কুছাই এটা নবায়ন করেন।

তারপর মক্কা বিজয়ের বৎসর নবী করীম (সাঃ) উছাইদ খুজায়ীকে পাঠিয়ে এটা নবায়ন করলেন। অতঃপর হযরত উমার (রাঃ) এটা নবায়ন করলেন। অতঃপর আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান এটা নবায়নের নির্দেশ দেন।

মদিনার হারামের সীমানা

হযরত যাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَاِنِّىْ حَرَّمْتُ الْمَدِيْنَةَ، مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا لاَ يُقْطَعُ عَضَاهُهَا وَلاَ يُصَادُ صَيْدُهَا–(رواه مسلم)

ইবরাহীম (আঃ) মক্কাকে হারাম করেছেন এবং আমি মদিনাকে হারাম করেছি। এর গাছ কাটা যাবে না এবং এর শিকার বধ করা যাবে না। (মুসলিম)

হযরত আলী (রাঃ) নবী করীম (সাঃ) থেকে বর্ণনা করে মদিনা সম্পর্কে বলেছেন, এর ঘাস কাটা যাবে না, শিকার তাড়ানো যাবে না, পড়ে থাকা কিছু উঠানো যাবে না। অবশ্য যে এর প্রচার করছে সে উঠাতে পারবে। কেউ অস্ত্র উঠাতে পারবে না এবং এর গাছ কাটতে পারবে না। কিন্তু উটের খাদ্যের জন্য কাটতে পারবে। (আহ্‌মাদ, আবু দাউদ)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন–

حَرَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ لاَبَتَىِ الْمَدِيْنَةَ– وَجَعَلَ اثْنَىْ عَشَرَ خَيْلاً–

নবী করীম (সাঃ) মদিনার আশে-পার্শে পূর্ব পশ্চিম দিকে বার মাইল পর্যন্ত হারাম ধার্য করেছেন।

لابتان শব্দের এক বচন হল لابة। এর অর্থ হল পাথরী মাঠ। মদিনার পূর্বে ও পশ্চিম দিকে দুটি পাথরী মাঠ রয়েছে। এগুলো لابتان নামে পরিচিত। মদিনার হারামের সীমানা হল, ইর নামক পর্বত হতে ছওর নামক পর্বত পর্যন্ত।

মক্কার হারাম ও মদিনার হারামের মধ্যে পার্থক্য

মক্কার হারামের ভিতরে শিকার বধ করলে বিনিময় ওয়াজিব হয়, তা জেনে শুনে হোক বা ভুল করে হোক। আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন−

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ، وَمَنْ قَتَلَه مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِه ذَوَاعَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بلِغَ الْكَعْبَةِ اَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسكِيْنَ اَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوْقَ وَبَالَ اَمْرِه−

হে মুমিনগণ, তোমরা এহরাম অবস্থায় শিকার বধ করো না। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি জেনে শুনে শিকার বধ করবে, তার উপর বিনিময় ওয়াজিব হবে, যা সমান হবে ঐ জন্তুর যাকে সে বধ করেছে। দুজন নির্ভর যোগ্য ব্যক্তি এর ফায়সালা করবে। বিনিময়ের জন্তুটি উৎসর্গ হিসাবে কা'বায় পৌছাতে হবে। অথবা তার উপর কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে। কয়েক জন মিসকীনকে খানা দেয়া কিংবা এর সমপরিমান রোযা রাখা, যাতে সে তার কৃতকর্মের প্রতিফন আস্বাদন করে। (সূরা মায়িদা-৯৫)

বিনিময়ের সারাংশ হল, যে জন্তু বধ করা হবে, তার সমপরিমান মূল্যের একটা জন্তু হারামের ভিতরে নিয়ে এসে জবেহ্ করে মিসকীনদের মধ্যে বন্টন করে দেবে। অথবা ঐ জন্তুর সমপরিমান মূল্যের খাদ্য শস্য প্রত্যেক মিসকীনকে অর্ধেক ছা হিসাবে দেবে, অথবা অর্ধেক ছা' হিসেবে যতজনকে দেয়া যেত, ততটা রোযা রাখবে। খানা দেয়া এবং রোযা রাখা হারামের ভিতরে হওয়া শর্ত নয়।

ইমাম জুহরী বলেছেন, হেরেমের মধ্যে জেনে শুনে শিকার করলে পাপ হবে এবং বিনিময়ও ওয়াজিব হবে। আর ভূলবশতঃ শিকার বধ করলে কেবল বিনিময় ওয়াজিব হবে, সে পাপী হবে না।

পক্ষান্তরে মদিনার হারামের মধ্যে জেনে শুনে শিকার বধ করলে সে পাপী হবে, কিন্তু তার উপর কোন বিনিময় ওয়াজিব হবে না।

কয়েক জন মিলে যদি একত্রে শিকার বধ করে, তবে সকলের উপর একই বিনিময় ওয়াজিব হবে।

একদল লোক এহরাম অবস্থায় হারামে শিকার বধ করা সম্পর্কে হযরত ইবনে উমার (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করলেন। ইবনে উমার বললেন−

اِذْ بَحُوْا كَبْشًا، فَقَالُوْا عَنْ كُلِّ اِنْسَانٍ مِنَّا فَقَالَ بَلْ كَبْشًا وَاحِدًا عَنْ جَمْعِيْكُمْ-

তোমরা একটা বকরি জবাই কর। তারা বললেন, আমরা প্রত্যেকেই কি একটা বকরি জবাই করব? তিনি বললেন, বরং সকলের পক্ষ থেকে একটা বকরি জবাই কর।

কাউকে হারামের মধ্যে শিকার বধ করতে দেখলে, তাকে বাধা দেবে। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

مَنْ رَأَيْتُمُوْهُ يَبِيْدُ فِيْهِ شَيْئًا فَلَكُمَ سَلْبُهُ- (رواه ابوداؤد والحاكم وصححه)

যাকে তোমরা শিকার বধ করতে দেখবে তাকে অবশ্য ই বিরত রাখবে। (আবু দাউদ, হাকেম)

মদিনার উপর মক্কার ফজিলত

আব্দুল্লাহ বিন আদী আল হামরা (রাঃ) বলেন, তিনি নবী করীম (সাঃ) কে বলতে শুনেছেন–

وَ اللّٰهِ اِنَّكَ لَخَيْرُ اَرْضِ اللّٰهِ وَاَحَبُّ اَرْضِ اللّٰهِ اِلَى اللّٰهِ، وَلَوْلاَ اِنِّىْ اُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ- رواه احمد وابن ماجة والترمذى وصححه)

আল্লাহর শপথ! তুমিই হলে আল্লাহর উত্তম ও প্রিয়তম ভুমি। যদি আমাকে বের করে না দেয়া হত, তবে আমি তোমা থেকে বের হতাম না। (আহ্মাদ, ইবনে মাজাহ্, তিরমিযী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) মক্কাকে বলেছেন–

مَا اَطِيَبُ مِنْ بَلَدٍ وَاَحَبُّ اِلَىَّ، وَلَوْلاَ اِنَّ قَوْمِىْ اَخْرَجُوْنِىْ مِنْكِ مَاسَكَنْتُ غَيْرَكِ- (رواه الترمذى وصححه)

তোমার মাটি কত পবিত্র। তুমি আমার প্রিয়। যদি আমার সম্প্রদায় আমাকে বের করে না দিত, তবে আমি তোমাকে ছেড়ে অন্য যমীনে বসবাস করতাম না। (তিরমিযী)

হারামের ভিতরে স্থল-জন্তু শিকারের বিনিময়

যে জন্তু বধ করা হবে, তার সমপরিমান মূল্যের একটা জন্তু হারামের সীমানার ভিতরে নিয়ে এসে জবাই করে মিছকীনদের মধ্যে বন্টন করে দেবে। প্রতি মিসকীনকে অর্ধেক ছা' হিসাবে দেবে। অথবা অর্ধেক ছা' হিসাবে যত জনকে দেয়া যেত, ততটা রোযা রাখবে।

আর খানা দেয়া এবং রোযা রাখা হারামের ভিতরে হওয়া শর্ত নয়।

এহ্রাম ব্যতীত মক্কায় প্রবেশ

মুসলিম শরীফের বর্ণনায় এসেছে–

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ اِحْرَامٍ– (رواه مسلم)

নবী করীম (সাঃ) মক্কায় প্রবেশ করেছেন বিনা এহরামে। আর তাঁর মাথায় ছিল কালো রং এর পাগড়ী। (মুসলিম)

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত–

اَنَّهُ دَخَلَ مَكَّةَ غَيْرَ مُحْرِمٍ– তিনি মক্কায় প্রবেশ করেছেন বিনা এহরামে।

ইবনে হজম বলেছেন, হজ্ব ও উমরা ব্যতিত বিনা এহরামে মক্কায় প্রবেশ করা যায়েজ। কারণ, নবী করীম (সাঃ) মীকাত ধার্য করেছেন। হজ্ব ও উমরার জন্য।

মক্কায় প্রবেশের মুস্তাহাব কাজসমুহ

১। গোসল করা। হযরত ইবনে উমার (রাঃ) মক্কাতে প্রবেশের পূর্বে গোসল করতেন। (বোখারী, মুসলিম)

২। বাবুস সালাম দিয়ে প্রবেশ করা এবং বিনয় ভাবে বলা–

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَافْتَحْلِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ–

৩। প্রবেশ করার পর প্রথমে কালো পাথরকে চুমা দেয়া। যদি চুমা দেয়া সম্ভব না হয়, তবে হাত দ্বারা সপর্শ করা। আর স্পর্শ করা সম্ভব না হলে হাত দ্বারা ইশারা করা।

৪। অতঃপর তাওয়াফ আরম্ভ করা। কারণ, আল্লাহর গৃহের তাহইয়া হল তাওয়াফ করা। আবশ্য ফরয নামাযের সময় হলে ইমামের সাথে ফরয নামায পড়বে।

হজ্বের দ্বিতীয় রুকুন

আরাফার মাঠে অবস্থান করা

উলামাগণ একমত যে, আরাফার মাঠে অবস্থান করা হজ্বের বৃহত্তম রুকুন। হযরত আব্দুর রহমান বিন ইয়া'মুর (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) এক আহ্বান কারীকে আহবান করার আদেশ করলেন–

اَلْحَجُّ عَرَفَةٌ مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ فَقَدْ اَدْرَكَ–

হজ্ব হল আরাফাতে অবস্থান করা। যে ব্যক্তি মুজদালিফার রাত্রে ফজর উদয় হওয়ার পূর্বে আরাফাতে আসল, সে হজ্ব পেয়ে গেল। (আহ্‌মাদ, আস্‌ হাবুস্‌ সুনান)

তাই অধিকাংশ উলামার রায় হল, আরাফায় অবস্থানের সময় জ্বিল হজ্ব মাসের নয় তারিখ

দুপুরের পর থেকে দশ তারিখ ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত। রাত্রের বা দিনের যে কোন অংশে কেউ আরাফাতে আসলে যে দিনের বেলায় আরাফাতে অবস্থান করবে তার উপর ওয়াজিব হবে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান করা।

আরাফাতে অবস্থানের জন্য পাক থাকা শর্ত নয়। তাই হায়েজ ও নেফাস অবস্থায় আরাফাতে অবস্থান করা জায়েয।

আর পাগল বা অজ্ঞান অবস্থায় যদি কেউ আরাফাতে অবস্থান করে, তবে তার উকুফ আদায় হয়ে যাবে। এটা হল ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালিক সাহেবের মাজহাব। আর ইমাম শাফী, আহমাদ ও ইসহাক (রাহঃ) এর মতে তার উকুফ সহীহ হবে না। কারণ, এটা হল হজ্বের বৃহত্তম রুকুন।

আরাফার মাঠে অবস্থানের আদাব

১। বত্নে আরাফা-(আরাফার পশ্চিম দিকে একটি মাঠ) ব্যতিত আরাফার মাঠে যে কোন স্থানে অবস্থান করা জায়েয। তবে পাথর সমুহের নিকট আবস্থান করা মুস্তাহাব। কারন, নবী করীম (সাঃ) পাথর সমুহের নিকট অবস্থান করেছেন এবং বলেছেন–

وَقَفْتُ هَاهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ– (رواه احمدومسلم وابودؤاد عن جابر)

আমি এখানে অবস্থান করলাম। আর আরাফার সমস্ত মাঠই অবস্থান-স্থল। (আহ্মাদ, মুসলিম, আবু দাউদ, ইবনে জারীর)

আর জবলে রহমতে আরোহন করা সুন্নাত নয়।

২। আরাফাতে অবস্থানের জন্য গোসল করা মুস্তাহাব।

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) উকুফের পূর্বে রাত্রে গোসল করতেন। (মালিক)

আরাফার যিকর ও দোয়া

হযরত উসামা বিন যায়দ (রাঃ) বলেছেন, আমি আরাফার মাঠে নবী করীম (সাঃ) এর পিছনে বসে ছিলাম। তিনি হাত উঠিয়ে দোয়া করছিলেন। (নাসাঈ)

হযরত আমর বিন শুয়াইব (রাঃ) তার পিতা থেকে এবং তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করে বলেছেন–

خَيْرُ الدُّعَاءُ عَرَفَةَ وَاَفْضَلُ مَا يَقُوْلُ اَنَا وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ قَبْلِيْ–

নবী করীম (সাঃ) আরো বলেছেন, আরাফার দিনের দোয়া হল সব চেয়ে উত্তম দোয়া আমি ও আমার পূর্ববর্তী নবীগণ দোয়া করেছেন–

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ–

হোসাইন বিন হাসান আল মরুজী বলেন, আমি সুফিয়ান বিন উমাইয়াকে আরাফার দিনের উত্তম দোয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাস করলাম। তিনি বললেন–

لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ–

আমি বললাম, এটা তো প্রশংসা, দোয়া নয়। তিনি বললেন, মালিক বিন হারিসের হাদীস কি তোমার জানা নয়। আমি বললাম তুমি বর্ণনা কর। তখন তিনি বললেন, মালিক বনি হারিছ থেকে মানসুর বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন–

اِذَا شَغَلَ عَبْدِيْ ثَنَاؤُهُ عَلَيَّ عَنْ مَسْأَلَتِيْ اَعْطَيْتُهُ اَفْضَلَ مَا اُعْطِيَ السَّائِلِيْنَ–

যখন আমার প্রশংসা আমার বান্দাকে আমার কাছে চাওয়া থেকে বিরত রাখে তখন আমি তাকে যারা চায় তাদের চেয়ে বেশী দেই।

তা ছাড়া হাদীস ও কোরআনে বর্ণিত বিভিন্ন দোয়া করা ভাল। যেমন–

رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ–

رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ–

لَا اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ–

আর হাদীসে বর্ণিত দোয়া। যেমন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ فَاغْفِرْلِيْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ– (متفق عليه)

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ الْعَفْوَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالاٰخِرَةِ– (رواه الترمذى)

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ– (متفق عليه)

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَرِضَاءَ نَفْسِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ– (رواه مسلم)

তা ছাড়া নিজের ভাষায় যা ইচ্ছা, তা প্রার্থনা করা যাবে। তবে দোয়াতে কোন নবী, ওলী বা পীরের ওসীলা দেয়া যাবে না। দোয়া হবে সব রকম শিরক থেকে মুক্ত। মানুষের লিখা আরবী ভাষায় দোয়ার বই, যা বাজারে বিক্রি হয়, তা থেকে বিরত থাকা উচিত।

আরাফার দিনের ফজিলত

হযরত যাবের (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহর নিকট আরাফার দিনের চেয়ে আর উত্তম দিন নেই। আল্লাহ্ তা'য়ালা ঐ দিন দুনিয়ার আসমানে আসেন এবং ফেরেশতাদের নিকট মানুষকে নিয়ে গর্ব করেন আর বলেন–

اُنْظُرُوْا اِى عِبَاىْ جَاؤُوْنِىْ شَعْثًا غَبْرًا ضَاحِيْنَ جَاؤُوْنِىْ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ، يَرْجُوْنَ رَحْمَتِىْ وَلَمْ يَروُا عَذَابِىْ، لَمْ يُرَ اَكْثَرُ عَتِيْعًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ– (رواه البزار، ابن خزيمة، ابن حبان وابويلى)

আমার বান্দাদের প্রতি দেখ, তারা ধুলি ধুষরিত অবস্থায় দূর দূরান্ত থেকে সফর করে আমার নিকট এসেছেন। তারা আমার দয়া কামনা করে। অথচ আমার শাস্তি তারা দেখেনি। আরাফার দিনের চাইতে বেশী জাহান্নামীকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত হতে দেখা যায়নি।

হযরত আনাছ বিন মালিক (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) আরাফায় অবস্থান করলেন। সূর্যাস্ত নিকটবর্তী হল। নবী করীম (সাঃ) বললেন, হে বেলাল! মানুষকে আমার কথা শুনতে বল। হযর বেলাল সকলকে নবী করীম (সাঃ) এর কথা শুনতে বললেন। তখন নবী করীম (সাঃ) বললেন–

يَا مَعْشَرَ النَّاسِ اتَانِىْ جِبْرِئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَم انِفًا فَاَقْرَانِىْ مِنْ رَبِّىَ السَّلاَمَ وَقَالَ اِنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ غَفَرَ لاَهْلِ عَرفَاتٍ وَاَهْلِ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَضَمَنَ عَنْهُمُ التَّبِعَاتِ–

হে মানব মণ্ডলী! এখন আমার নিকট জিবরাইল আসলেন এবং আমার প্রভূর পক্ষ থেকে আমাকে সালাম দিলেন। আর বললেন, আল্লাহ তা'য়ালা আরাফায় অবস্থানকারী এবং মাশআরুল হারামে অবস্থানকারী সবাইকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আর যারা তাদের অনুসরণ করবে তাদেরকেও ক্ষমা করার জামিন হয়েছেন।

হযরত উমার (রাঃ) বললেন, এটা কি কেবল আমাদের জন্য? নবী করীম (সাঃ) বললেন–

هزَا لَكُمْ وَلِمَنْ اَتى مِنْ بَعْدِكُمْ اِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ– (رواه ابن المبارك)

এটা তোমাদের জন্য এবং তোমাদের পর কিয়ামত পর্যন্ত যারা আসবে, তাদের জন্যেও।

তখন হযরত উমার (রাঃ) বললেন, আল্লাহর দয়া কত বেশী। (ইবনে মুবারক)

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

مَارُوِىَ الشَّيْطَانُ يَوْمًا هُوَ فِيْهِ اَصْغَرُ وَلاَ اَدْخَرُ وَلاَ اَغْيَظُ مِنْهُ فِىْ يَوْمِ عَرَفَةَ–

আরাফার দিনেই শয়তানকে সব চেয়ে বেশী পর্যদুস্ত, লজ্জিত এবং রাগান্বিত দেখা গেছে।

আরাফার মাঠে নামায

মুসলিম শরীফের বর্ণনায় এসেছে, নবী করীম (সাঃ) আরাফায় আসলেন এবং দেখলেন নিমরাতে তার জন্য কুব্বা বানানো হয়েছে। তিনি সেখানে অবস্থান করলেন। দুপুরের পর তিনি কাসওয়া নামক উটে আরোহন করলেন এবং বত্নে ওয়াদীতে আসলেন। এখানে তিনি ঐতিহাসিক ভাষণ দান করেন। অতঃপর আযান ও ইকামত দেয়া হল। তিনি জুহরের নামায জামাতে আদায় করলেন। তিনি এ দুই নামাযের মাঝ খানে আর কোন নামায পড়েননি।

হযরত আছওয়াদ ও আলকামা (রাঃ) বলেন, হজ্বের পূর্ণতা হল, আরাফাতে ইমামের সাথে জুহর ও আছরের নামায একত্রে আদায় করা। ইবনুল মুনযির বলেছেন, উলামাদের ইজমা হল, ইমাম আরাফাতে জুহর ও আছরের নামায একত্রে আদায় করবেন।

আমর বিন দ্বীনার বলেন, যাবের বিন যায়েদ আমাকে বলেছেন, তিনি আরাফায় কসর নামায পড়েছেন।

আরাফার দিন রোযা

হাজ্বীদের জন্য আরাফার মাঠে রোযা রাখা নিষিদ্ধ। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

اِنَّ يَوْمَ عَرَفَةَ وَيَوْمَ النَّحْرِ وَاَيَّامَ التَّشْرِيْقِ عِيْدُنَا اَهْلَ الاِسْلَامِ وَهِىَ اَيَّامُ اَكْلٍ وَشُرْبٍ–

হে মুসলিমগণ! আরাফার দিন ও ঈদের দিন এবং আইয়ামে তাশরিকের তিন দিন হল আমাদের ঈদ। এটা হল পানাহারের দিন। অন্য বর্ণনায় এসেছে–

اِنَّهُ نَهى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرفَتٍ–

নবী করীম (সঃ) আরাফার দিন আরাফার মাঠে রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন।

আর যারা হজ্বে যাবে না, তাদের জন্য আরাফার দিন রোযা রাখা মুস্তাহাব। হযরত আবু কাতাদা বলেন, নবী করীম (সঃ) কে আরাফার দিনের রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি বললেন–

يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَّةَ وَالْبَاقِيَّةَ বিগত বৎসর এবং চলতি বৎসরের পাপ মাফ করা হয়।

আরাফার মাঠ থেকে প্রত্যাবর্তন

সূর্যাস্তের পর শান্তিপূর্ণ ভাবে আরাফা থেকে প্রত্যাবর্তণ করা সুন্নাত। নবী করীম (সঃ) সূর্যাস্তের পর শান্তিপূর্ণ ভাবে আরাফা থেকে মুজদালিফার দিকে যাত্রা করেন এবং বলেন–

اَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ فَاِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِا لاِيْضَاعِ اى الاسرع–

হে মানব মণ্ডলী! তোমাদের শান্তিতে চলা উচিত। কারণ, দ্রুত চলা সওয়াবের কাজ নয়। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

আরাফা থেকে মুজদালিফায় যাওয়ার পথে তালবিয়া পাঠ করা এবং যিকর করা মুস্তাহাব। নবী করীম (সঃ) জমরাতুল আকাবাতে পাথর নিক্ষেপের পূর্বে · ᷉ন্ত তালাবিয়া পাঠ করেছেন।

হজ্বের তৃতীয় রুকুন

তাওয়াফুল এফাজা

তাওয়াফ চার প্রকার। (১) তাওয়াফুল কুদুম। (২) তাওয়াফুল এফাজা এবং (৩) তাওয়াফুল ওদা' ব الطواف الوداع এবং (৪) নফল তাওয়াফ।

১। তাওয়াফুল কুদুম হল, মক্কাতে পৌঁছে প্রথমে যে তাওয়াফ করা হয়। এটা ওয়াজিব। ২। আর তাওয়াফুল এফাজা হল, আরাফা থেকে ফিরে আসার পর তাওয়াফ করা। এটা ফরয এবং হজ্বের রুকুন। ৩। তাওয়াফুল ওদা' হল, মক্কা ত্যাগ করার পূর্বে তাওয়াফ করা। এটা ওয়াজিব। ৪। নফল তাওয়াফ হল, মসজিদুল হারামে যখন প্রবেশ করবে, তখনই তাওয়াফ করা। এটা সুন্নাত। একে বলা হয় طواف التطوع নফল তাওয়াফে রমল করতে হয় না এবং ইয্‌তেবাও নেই।

তাওয়াফের শর্ত সমূহ

(এক) হদসে আছগার ও হদসে আকবার এবং নাপাকী থেকে পাক থাক।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

الطَّوَافُ صَلَاةٌ اِلاَّ اَنَّ اللّٰهَ تَعَاى اَحَلَّ فِيْهِ الْكَلَامَ فَمَنْ تَكَلَّمَ فَلاَ يَتَكَلَّمُ اِلاَّ بِخَيْرٍ– (رواه الترمذى والدارقطنى وصححه الحاكم وابن خزيمة)

তাওয়াফ হল নামায। কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালা এতে কথা বলা হালাল করে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি কথা বলবে, সে অবশ্যই ভাল কথা বলবে। (তিরমিযী, দারেকুতনী, হাকেম, ইবনে খুযাইমাহ্)

হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন, বিদায় হজ্বে নবী করীম (সাঃ) তার কাছে গেলেন, তখন তিনি কাঁদছেন। নবী করীম (সঃ) বললেন, তোমরা কি হায়েজ হয়েছে? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ! নবী করীম (সাঃ) বল্লেন–

اِنَّ هٰذَا شَئٌ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَى بَنَاتِ ادَمَ، فَاقْضِىْ مَا يَنْقَضِى الْحَاجُّ غَيْرَ اَنْ لاَتَطُوْفِى بِالْبَيْتِ حَتّٰى تَغْتَسِلِىْ– (رواه مسلم)

নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা নারীদের জন্য হায়েজকে জরুরী করে দিয়েছেন। কিন্তু গোসল না করা পর্যন্ত কাবা গৃহ তাওয়াফ করবে না। (মুসলিম)

হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) মক্কায় প্রবেশ করে প্রথমে অযু করেছেন। অতঃপর কা'বা গৃহ তাওয়াফ করেছেন। (শাইখান)

কিন্তু যদি কোন ওযর হয়, যেমন ইস্তেহাজা বা সিলসিলাতুল বাউল অর্থাৎ অনিয়ন্ত্রিত প্রশাব ইত্যাদি, তবে তাদের জন্য কা'বা গৃহ তাওয়াফ করা জায়েয।

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) এর নিকট এক মহিলা এসে জিজ্ঞাসা করল। সে বললো, আমি কা'বা গৃহ তাওয়াফ করতে চাই। যখন মসজিদের দরজায় আসলাম, তখন রক্ত এসে গেল। আমি চলে গেলাম। রক্ত বন্ধ হওয়ার পর আবার আসলাম। দরজায় আসার পর আবার রক্ত আসল। আমি চলে গেলাম। রক্ত বন্ধ হওয়ার পর আবার আসলাম। যখন মসজিদের দরজায় আসলাম, তখন রক্ত আসল। আমি চলে গেলাম। রক্ত বন্ধ হওয়ার পর আবার আসলাম। মসজিদের দরজায় আসার পর রক্ত এসে গেল। হযরত ইবনে উমার (রাঃ) বললেন, এটা শয়তানের আঘাত। তুমি গোসল করে কাপড় বেধেঁ নাও। অতঃপর তাওয়াফ কর। (মালিক)

ইমাম আবু হানীফা (রাহঃ) এর মতে তাহারাত শর্ত নয়, বরং ওয়াজিব তাই বিনা ওযরে তাহারাত ব্যতিত তাওয়াফ করলে তার উপর কোরবানী দেয়া ওয়াজিব হবে। যদি হদসে আছগার হয়, আর তাওয়াফ করে, তবে একটা বকরি জবাই করা ওয়াজিব হবে। আর হাদসে আকবার তথা হায়জ বা জানাবত অবস্থায় তাওয়াফ করলে একটা উট জবাই করতে হবে।

আর কাপড় বা শরীরে কোন নাজাছাত থাকলে তা থেকে পাক হয়া সুন্নাত।

মাসআলা

তাওয়াফে এফাজার পূর্বে যদি কোন মহিলার হায়েজ হয়, আর তার সাথীগণ পাক হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজী না হয়, এমতাবস্থায় ইবনে তাইমিয়ার রায় হল, সে গোসল করে তার লজ্জাস্থানে কাপড় বেঁধে নেবে। অতঃপর তাওয়াফে এফাজা আদায়। কারন, এটা মহিলার জন্য বড় ওযর।

(দুই) আওরাত ঢেকে রাখা। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেছেন, বিদায় হজ্বের পূর্বে নবী করীম (সাঃ) হযরত আবুবকর (রাঃ) কে আমীর করে হজ্বে পাঠিয়েছিলেন। সেই বৎসর আবুবকর (রাঃ) আমাকে ঈদের দিন মানুষের সামনে ঘোষনা দিতে পাঠালেন–

لَايَجْمَعُ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ–

এই বৎসরের পর আর কোন মুশরিক হজ্বে আসতে পারবে না এবং উলংগাবস্থায় কা'বা গৃহ তাওয়াফ করতে পারবে না। (শাইখান)

আহনাফের মতানুসারে, আওরাত ঢাকা ওয়াজিব, শর্ত নয়। সুতরাং কেউ যদি উলংগাবস্থায় তাওয়াফ করে, তবে তার উপর কোরবানী দেয়া ওয়াজিব হবে।

(তিন) পূর্ণ সাত তাওয়াফ করতে হবে।

কোন তাওয়াফে সামান্যতম কম হলে, তা গণ্য করা যাবে না। আর তাওয়াফের সংখ্যায় সন্দেহ হলে কম সংখ্যা গণ্য করা হবে, যেন কোন সন্দেহ না থাকে।

(চার) কালো পাথর থেকে তাওয়াফ আরম্ভ করা এবং সেখানেই তাওয়াফ শেষ করা।

(পাঁচ) কা'বা গৃহকে বাম দিকে রেখে তাওয়াফ করা।

হযরত যাবের (রাঃ) বলেন, যখন নবী করীম (সাঃ) মক্কায় প্রবেশ করলেন, তখন তিনি প্রথমে কালো পাথরের নিকট আসলেন এবং চুমু দিলেন। অতঃপর কা'বা গৃহের ডান দিকে হাঁটতে থাকেন। তিন চক্করে তিনি রমল করলেন এবং বাকী চার চক্করে স্বাভাবিক ভাবে হাঁটলেন। (মুসলিম)

(ছয়) কা'বা গৃহের বাইরে তাওয়াফ করা। সুতরাং কেউ যদি হিজরের ভিতর দিয়ে তাওয়াফ করে, তবে তার তাওয়াফ সহীহ হবে না। কারন, হিজর হল কা'বা গৃহের অংশ। আল্লাহ তা'লা বলেছেন–

وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ– আর তারা যেন সুসংরক্ষিত গৃহের তাওয়াফ করে।

আয়াতে কা'বা গৃহের তাওয়াফ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, গৃহের মধ্যে নয়।

(সাত) ধারাবাহিক ভাবে তাওয়াফ করা। বিভিন্ন চক্করের মাঝখানে বিনা ওযরে দেরী না করা। এটা হল, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমাদ (রাহঃ) এর মাজহাব।

আর ইমাম শাফী ও ইমাম আবু হানীফা (রাহঃ) এর মতে এটা সুন্নাত।

হোমেদ বিন যায়েদ বলেছেন, আমি আব্দুল্লাহ বিন উমারকে দেখেছি। তিনি কা'বা গৃহ তিন বা চার চক্কর দেয়ার পর বসে আরাম করেছেন। অতঃপর বাকী চক্কর গুলো আদায় করেছেন। (সাঈদ বিন মানুসর)

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) বলেন, তিনি তাওয়াফ করছেন। নামাযের জন্য ইকামত হল। তিনি জামাতে নামায পড়লেন। তারপর বাকী তাওয়াফ পূর্ণ করলেন।

আতা বলেছেন, তাওয়াফের মাঝখানে যদি জানাজা হাজির হয়, তবে জানাজার নামায পড়বে। অতঃপর বাকী তাওয়াফ আদায় করবে।

তাওয়াফের সুন্নাত সমুহ

(এক) কালো পাথরকে চুম্বন দেয়া তাকবীর ও তাহলীল সহ নামাযের ন্যায় হাত উঠিয়ে কালো পাথরকে স্পর্শ করা ও চুম্বন দেয়া এবং সম্ভব হলে পাথরের উপর গাল রাখা সুন্নাত। আর সম্ভব না হলে তাকবীর দিয়ে এর দিকে ইশারা করা।

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) কালো পাথরের দিকে আসলেন এবং পাথরকে চুম্বন দিলেন। তিনি পাথরে ঠোঁট লাগায়ে অনেক কাঁদলেন। এ সময় হযরত উমার (রাঃ)ও বেশী কাঁদলেন। নবী করীম (সাঃ) বললেন–

هُنَا تُسْكَبُ الْعَبَرَاتُ– হে উমার! এটা চোখের পানি ফেলার স্থান। (হাকেম)

হযরত নাফে, (রাঃ) বলেছেন, আমি ইবনে উমার (রাঃ) কে দেখেছি তিনি হাত দ্বারা কালো পাথরকে স্পর্শে করেছেন এবং নিজ হাতে চুম্বন দিয়েছেন, আর বলেছেন, আমি যখন থেকে দেখেছি যে, নবী করীম (সাঃ) কালো পাথরকে চুম্বন দিয়েছেন, তখন থেকে আমি এটা ত্যাগ করিনি। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) ক্বা'বা গৃহে আসতেন এবং কালো পাথরকে চুম্বন দিয়ে বলতেন- بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ- (رواه احمد)

হযরত আবু তুফাইল (রাঃ) বলেন, আমি আল্লাহর রাসুলকে দেখেছি তিনি তাওয়াফ করছেন এবং ছড়ি দ্বারা কালো পাথরকে স্পর্শ করছেন। তারপর ছড়িকে চুম্বন দিচ্ছেন। (মুসলিম)

হযরত উমার (রাঃ) বলেন, তিনি কালো পাথরকে চুম্বন দিয়ে বলেছেন-

اِنِّىْ لاَعْلَمْ اَنَّكَ حَجَرٌ، لاَتَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ، وَلَوْلاَ اِنِّىْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ- (رواه البخارى مسلم وابوداؤد)

নিশ্চয়ই আমি জানি, তুমি একটি পাথর। ভাল-মন্দ করার তোমার কোন ক্ষমতা নেই। যদি আমি না দেখতাম, নবী করীম (সাঃ) তোমাকে চুম্বন দিয়েছেন, তাহলে তোমাকে চুম্বন দিতাম না। (বোখারী, মুসলি, আবু দাউদ)

পাথরের নিকট ভিড় করা

পাথরের নিকট ভিড় করা কোন দোষনীয় নয়, যদি কাউকে কষ্ট দেয়া না হয়।

নবী করীম (সাঃ) হযরত উমার (রাঃ) কে বলেছেন-

اِنَّكَ رَجُلٌ قَوِىٌّ فَلاَ تُزَاحِمُ عَلَى الرُّكْنِ فَاِنَّكَ تُؤْذِى الضَّعِيْفَ، وَلٰكِنْ اِذَا وَجَدْتَ خَلْوَةً فَاسْتَلِمْ وَاِلاَّ فَكَبِّرْ وَامْضِىِ- (رواه الشافعى فى سننة)

তুমি শক্তিশালী ব্যক্তি। পাথরের নিকট ভিড় করবে না। কারন, দুর্বলের কষ্ট হবে। যদি জায়গা খালি থাকে তবে স্পর্শ করবে। নতুবা তাকবীর দিয়ে চলে যাবে। (শাফী)

(দুই) ইসতেবা করা সুন্নাত। ইযতেবা হল, এহরাম অবস্থায় পরিহিত চাদরের মধ্যভাগকে ডান কাঁদের নীচে দিয়ে চাদরের দুই কোণ বাম কাঁদের উপর ধারন করা। এতে ডান কাঁদ খোলা থাকবে এবং চাদরের দুই কোণ থাকবে বাম কাঁধের উপর।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) এবং সাহাবীগণ জা'রানা থেকে উমরা করেছেন। তারা সকলে ইযতেবা করেছেন। চাদরের মধ্য ভাগ ডান বগলের নীচে রেখেছেন এবং দুই কোণ বাম কাঁদের উপর রেখেছেন। (আহ্‌মাদ, আবু দাউদ)

(তিন) রমল করা। রমল হল তাওয়াফে কুদুমের প্রথম তিন চক্করে ছোট ছোট কদমে দ্রুত চলা।

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) কালো পাথর থেকে কালো পাথর পর্যন্ত প্রথম তিন চক্করে রমল করেছেন এবং বাকী চার চক্করে হেঁটেছেন। (আহ্‌মাদ, মুসলিম)

ইযতেবা ও রমল বিশেষ করে উমরার তাওয়াফের জন্যে এবং সেই তাওয়াফে কুদুমের জন্যে যারা তাওয়াফের পর সাঈ করবে।

আর মহিলাদের জন্যে রমল নেই এবং ইযতেবাও নেই। হযরত ইবনে উমার (রাঃ) বলেছেন, কা'বা গৃহের তাওয়াফে এবং সাফা ও মারওয়ার সাঈতে নরীদের উপর রমল নেই। (বায়হাকী)

রমল করার পদ্ধতি

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাসুল মক্কাতে আসলেন। মুশরেকগণ বলতে লাগলেনা, এমন এক সম্প্রদায় মক্কাতে আসছে যাদেরকে মদিনার জ্বর দুর্বল করে রেখেছে।

আল্লাহ্ তা'য়ালা এ সংবাদ তার নবীকে জানিয়ে দিলেন। নবী করীম (সাঃ) তাওয়াফে রমল করার আদেশ করলেন। মুশরিকরা যখন দেখলো তখন বলতে লাগলো মুসলমানগণ তো আমাদের চেয়ে ও বেশী সবল। (বোখারী)

আর ইযতেবার হেকমত হল এতে রমল করা সহজ হয়।

(চার) রুকনে ইয়ামনীকে সপর্শ করা। হযরত ইবনে উমার (রাঃ) বলেন, আমি রুকনে ইয়ামনী ও কালো পাথরকে স্পর্শ করা ছাড়িনি, যখন থেকে দেখেছি যে, নবী করীম (সাঃ) সর্বাবস্থায় এ দুটি রুকুনকে স্পর্শ করেছেন। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

(পাঁচ) তাওয়াফের পর মাকামে ইবরাহীমে বা মসজিদের যে কোন স্থানে দুই রাকআত নামায পড়া। হযরত যারের (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) যখন মক্কাতে আসলেন, তখন কা'বা গৃহকে সাত চক্কর দিলেন। তারপর মাকামে ইবরাহীমে এসে পড়লেন–

وَاتَّخَذُوْا مِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى–

অতঃপর তিনি-মাকামে ইবরাহীমের পিছনে দুই রাকআত নামায পড়লেন। তারপর কালো পাথরের নিকট এসে পাথরকে স্পর্শ করলেন। (তিরমিযী)

ঐ দু রাকআতের প্রথম রাকআতে সূরা কাফিরুন এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস পড়া সুন্নাত। (মুসলিম)

হযরত যুবের বিন মুতয়ীম বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

يَا بَنِىْ عَبْدِ مَنَافٍ لاَتَمْنَعُوْا اَحَدًا طَافَ هذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى اَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ اَوْ نَهَارٍ– (رواه اخمد، ابوداؤد و الترمذى وصححه)

হে আবদে মনাফ সন্তান! তোমরা এ গৃহের তাওয়াফ করতে কাউকে নিষেধ করবে না এবং রাত বা দিনের যে কোন সময় ইচ্ছা, তাওয়াফ করতেও নিষেধ করবে না। (আহ্‌মাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী)

উক্ত হাদীস প্রমান করছে যে, এ দুই রাকআত নামায নিষিদ্ধ সময়ও পড়া জায়েয।

হারাম শরীফে নামাযীদের সামনে দিয়ে যাওয়া জায়েয

কছীর বিন কছীর তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি দেখেছেন, নবী করীম (সাঃ) ক্বা'বা গৃহের পাশে নামায পড়ছেন এবং মানুষ নামাযের সামনে দিয়ে যাচ্ছেন। আর সামনে কোন

ছুতরা নেই। সুফিয়ান বিন উয়াইনা বলেছেন, নবী করীম (সাঃ) ও ক্বা'বা গৃহের মাঝখানে কোন ছুতরা ছিল না। (আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ্)

নারী ও পুরুষের একত্রে তা'ওয়াফ

নারী ও পুরুষের এক সাথে তাওয়াফ করা জায়েয। কিন্তু নারীর যথাসম্ভব পুরুষ থেকে দূরে থাকবে এবং পর্দা করে চলবে। পুরুষের সামনে মাথার উড়না মুখমণ্ডলের উপর ঝুলিয়ে দিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে রাখবে।

হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন, তিনি বলেছেন–

كَانَ الرُّكْبَانَ بِمَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَاذَا حَاذَوْنَا سَدَلَتْ اِحْدَانَا جِلْبَا بِهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا، فَاذَا جَاوَزْنَا كَشَفْتَاهُ–

বিদায় হজ্বের সময় আমরা নবী করীম (সাঃ) এর সাথে ছিলাম। কাফেলা আমাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করত। যখন তারা আমাদের সামনে আসত তখন আমরা মাথার চাদর মুখের উপর ঝুলিয়ে দিতাম। আর যখন তারা অতিক্রম করে চলে যেত, তখন আমরা মুখমণ্ডল খুলে রাখতাম। (আবু দাউদ ও ইবনু মাজাহ্, দারে কুতনী)

ইমাম দারেকুতনী হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইবনে জুরেহজ বলেছেন, আমাকে আতা সংবাদ দিলেন যে, হিশাম বিন আব্দুল মালিক নারী ও পুরুষ এক সাথে তাওয়াফ করতে নিষেধ করেছেন। আমি বললাম এটা পর্দার হুকুম নাযিল হওয়ার পূর্বে না পরে? তিনি বললেন, পর্দার হুকুম নাযিল হওয়ার পর। আমি বললাম তাহলে নারী ও পুরুষ এক সাথে কেমন করে মেলামেশা করতেন? তিনি বললেন, তারা তো মেলা মেশা করতেন না–

كَانَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عنْهَا تَطُوْفُ حِجْرَةً مِنَ الرِّجَالِ لاَ تُخَالِطُهُنَّ– (رواه البخارى)

হযরত আয়িশা (রাঃ) পুরুষ থেকে দূরে সরে তাতয়াফ করতেন তাদের সাথে মেলা-মেশা করতেন না।

জনৈক মহিলা বললেন, হে উম্মুল মুমেনীন! চলুন, আমরা কালো পাথরকে স্পর্শ করি। তিনি বললেন, তুমি যাও। তিনি গেলেন না।

يَخْرُجْنَ مُتَنَكِّرَاتٌ بِاللَّيْلِ فَيَطُفْنَ مَعَ الرِّجَالِ– (رواه البخارى)

তারা পর্দা করে রাত্রে পুরুষের সাথে তাওয়াফ করতেন। (বোখারী)

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (সাঃ) এর নিকট তাওয়াফ করতে অক্ষমতা পেশ করলাম তিনি বললেন–

طُوْفِىْ وَرَاءَ النَّاسِ وَاَنْتِ رَاكِبَةٌ– 'তুমি উটের উপর আরোহন করে মানুষের পিছনে পিছনে চক্কর দাও।' আমি তাওয়াফ করলাম। আর নবী করীম (সাঃ) ক্বা'বা গৃহের পাশে নামায পড়ছিলেন এবং والطور وكتاب مسطور (সূরা তুর) পড়ছিলেন। (বোখারী)

যানবাহনে আরোহন করে তাওয়াফ

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, বিদায় হজ্বে নবী করীম (সাঃ) উটের উপর আরোহন করে তাওয়াফ করেছেন এবং হাতের ছড়ি দ্বারা কালো পাথরকে স্পর্শে করেছেন। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

হযরত যাবের (রাঃ) বলেন, বিদায় হজ্বে নবী করীম (সাঃ) যানবাহনে আরোহন করে ক্বা'বা গৃহ তাওয়াফ করেছেন এবং সাফা ও মারওয়াতে সাঈ করেছেন যেন মানুষ তাঁকে দেখতে পায় এবং মাসআলা জিজ্ঞাসা করতে পারে। কারণ, মানুষের ভিড় ছিল বেশী। নবীজিকে দেখা যাচ্ছিল না।

তাওয়াফের মুস্তাহাব সমুহ

(এক) তাওয়াফ শেষে দুই রাকআত নামায পড়ার পর জমজমের পানি পান করা মুস্তাহাব।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। নবী করীম (সাঃ) জমজমের পানি পান করেছেন এবং বলেছেন–

اِنَّهَا مُبَارَكَةٌ، اِنَّهَا طَعَامُ طَعْمٍ وَشِفَاءَ سَقَمٍ وَاَنْ غُسِّلَ قَلْبُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّم بِمَائِهَا لَيْلَةَ الاِسْرَاءِ–

এটা বরকতময় পানি। এ পানি উত্তম খাদ্য এবং রোগের শিফা। মেরাজের রাত্রে এর পানি দ্বারা নবীজির অন্তর ধৌত করা হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

خَيْرُ مَاءٍ عَلَى وَجْهِ الاَرْضِ مَاءُ زَمْزَمٍ فِيْهِ طَعَامُ الطُّعْمِ وَشِفَاءُ السَّقَمِ–

যমীনের উপর উৎকৃষ্টতম পানি হল জমজম। এতে রয়েছে উত্তম খাদ্য এবং রোগের শিফা। (তিবরাণী, ইবনে হাব্বান)

আবু মালিকা থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর নিকট আসল তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোথা থেকে এসেছ। সে জবাব দিল, আমি জমজমের পানি পান করে এসেছি। ইবনে আব্বাস বললেন, তুমি কি হক আদায় করে পান করেছ? সে বলল, তা কি ভাবে? তিনি বললেন, যখন জমজমের পানি পান করবে তখন কিবলার দিকে দাঁড়াবে, আল্লাহকে স্বরণ করবে, তিন বার নিঃশ্বাস ফেলবে এবং তৃপ্ত হয়ে পান করবে। পানি পান করার পর আল্লাহর প্রশংসা করবে। আল্লাহর রাসুল বলেছেন, আমাদের ও মুনাফিকদের মধ্যে নিদর্শন হল, তারা জমজমের পানি পান করে তৃপ্ত হয় না। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, যখন কেউ জমজমের পানি পান করবে, তখন বলবে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ–

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি এমন ইলম যা উপরকারী হয় ও প্রশস্ত রিজেক এবং প্রতিটি রোগ থেকে শিফার।

জমজমের কুপ

বুখারী হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। হাজেরা ও তাঁর পুত্র ইসমাইল যখন পিপাসায় কাতর হলেন, তখন হযরত হাজেরা মারওয়া পর্বত থেকে একটি শব্দ শুনলেন। তখন তিনি বললেন, এখানে কেউ কি সাহায্য কারী আছ? তখন জমজমের নিকট এক ফিরিস্তা এসে হাজির হলেন। তিনি তার পা অথবা ডানা দিয়ে জমীনে আঘাত করলেন। ওমনি পানি বের হতে লাগল। হযরত হাজেরা বাঁধ দিয়ে একটি হাউজের মত করলেন এবং পানি মুশ্‌কে ভর্তি করলেন।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

رَحِمَ اللّٰهُ اُمَّ اِسْمَاعِيْلَ لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ لَكَانَتْ زَمْزَمُ عَيْنًا مُعَيَّنًا–

আল্লাহ ইসমাইলের মা'কে রহম করুন তিনি যদি জমজমের পানি ছেড়ে দিতেন, তবে জমজম একটি নির্দিষ্ট ঝরণা হয়ে যেত।

তখন ফিরিশতা বললেন, তুমি ভয় করো না এখানেই আল্লাহর ঘর। এ পুত্র ও তার পিতা ঐ ঘর তৈরী করবেন। এ ঘরের বাসিন্দাকে আল্লাহ্ কখনও ধ্বংস করবেন না।

(দুই) মুলতাজিমের নিকট দোয়া করা। হযরত আমর বিন শুয়াইব তার পিতা থেকে এবং তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করে বলেছেন যে, আমি দেখেছি নবীজি নিজ মূখমণ্ডল ও বুক মুলতাজিমে লাগিয়েছেন।

মুলতাজিম কি? হযরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কালো পাথর ও দরজার মধ্যবর্তী স্থান হল মুলতাজিম। (বায়হাকী)

(তিন) ক্বা'বা গৃহ এবং হিজরে ইসমাইলে প্রবেশ করা।

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সঃ) ক্বা'বা গৃহে প্রবেশ করেছেন। সাথে ছিলেন উছামা বিন যায়দ ও উসমান বিন তালহা (রাঃ), ক্বা'বা গৃহের দরজা বন্ধ করে দেয়া হল।

যখন খোলা হল, তখন হযরত বেলাল (রাঃ) বললেন, নবী করীম (সাঃ) ক্বা'বা গৃহের ভিতরে দুই রুকুনে ইয়ামানীর মাঝখানে নামায পড়েছেন।

হযরত আয়শা (রাঃ) বললেন, হে নবী! আমি ছাড়া সকলই ক্বা'বা গৃহে প্রবেশ করেছেন। নবীজি বললেন, উছমান বিন তালহাকে সংবাদ দাও, সে ক্বা'বাগৃহ খুলে দেবে। আমি সংবাদ দিলাম, তিনি বললেন, আমি অন্ধকার যুগে হোক বা ইসলামের যুগে হোক, রাত্রে দরজা খুলতে পারি না। তখন নবী করীম (সাঃ) বললেন–

صَلِّى فِى الْحِجْرِ فَاِنَّ قَوْمَكَ اسْتَقْصَرُوْا عَنْ بِنَاءِ الْبَيْتِ حِيْنَ بَنَوْهُ–

তুমি হিজরে নামায পড়ে নাও। কারণ, তোমার সম্প্রদা. ়কে ক্বা'বা গৃহ তৈরী করতে বাদ দিয়েছে। (আহ্‌মাদ)

তাওয়াফের ফজিলত

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

يُنْزِلُ اللّٰهُ كُلَّ يَوْمٍ عَلٰى حُجَّاجِ بَيْتِ اللّٰهِ الْحَرَامِ مِائَةً وَعِشْرِيْنَ رَحْمَةً، سِتِّيْنَ لِلطَّائِفِيْنَ وَ اَرْبَعِيْنَ لِلنَّاظِرِيْنِ– (رواه البيهقى)

মাসজিদে হারামের হাজ্বীদের প্রতি আল্লাহ্‌ তায়ালা এক শত বিশটি রহমত নাযিল করেন। এর মধ্যে ষাটটি রহমত তাওয়াফকারীদের জন্যে এবং চল্লিশটি রহমত ক্বা'বা গৃহের প্রতি দৃষ্টি দাতাদের জন্যে। (বায়হাকী)

আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেছেন–

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِيْنَ–

নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম ঘর যা মানুষের জন্যে নির্ধারিত হয়েছে, সেটাই হচ্ছে এ ঘর, যা মক্কায় অবস্থিত এবং সারা জাহানের মানুষের জন্যে হেদায়েত ও বরকতময়। (সূরা ইমরাণ)

ক্বা'বা গৃহ তাওয়াফের পদ্ধতি

উমরা আদায়কারী এবং হজ্ব পালনকারী মক্কাতে পৌছে প্রথমে তাওয়াফ করবে। তাওয়াফ আরম্ভ করবে কালো পাথর থেকে। কালো পাথরকে সামনে রেখে প্রথমে ডান হাত দিয়ে স্পর্শে করবে। তারপর মুখ লাগিয়ে চুম্বন করবে। আর ভিড় বেশী হলে ডান হাত দিয়ে বা হাতের ছড়ি দিয়ে স্পর্শ করবে। কালো পাথর স্পর্শ করার সময় বলবে– بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

তারপর ঐ হাত বা ছড়ি চুম্বন করবে। আর যদি হাত বা ছড়ি দ্বারা স্পর্শ করা সম্ভব না হয়, তবে পাথরের দিকে হাত দ্বারা ইশারা করে বলবে, আল্লাহু আকবার। কিন্তু ইশারা কৃত হাত চুম্বন করবে না। অতঃপর ক্বা'বা গৃহকে বামে রেখে চক্কর আরম্ভ করবে। প্রথম তাওয়াফে এ দোয়া পাঠ করবে–

بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُمَّ اِيْمَانًا بِكَ وَتَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَتِبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ–

তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে রমল করবে। এবং বাকী চার চক্করে হেঁটে চলবে। কালো পাথর থেকে চক্কর আরম্ভ হবে এবং কালো পাথরে এসে চক্কর শেষ হবে। প্রথম বার তাওয়াফে ইযতেবা করতে হয়। এরপর আর কোন তাওয়াফে ইযতেবা নেই। নারীদের জন্যে রমল বা

ইযতেবা নেই। প্রত্যেক চক্করে রুকনে ইয়ামানীকে স্পর্শ করা এবং কালো পাথরকে চুম্বন করা মুস্তাহাব। তাওয়াফে বেশী করে যিকর ও দোয়া করবে। বিশেষ কোন চক্করের জন্য বিশেষ কোন দোয়া নেই। তাওয়াফে বেশী করে পড়বে–

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ– (رواه ابن ماجة)

আর রুকুনে ইয়ামানী ও কালো পাথরের মাঝখানে পড়বে–

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ– (رواه ابوداؤد والشافعى)

ইমাম শাফী (রাহঃ) বলেছেন, যখন কালো পাথরের নিকট পৌঁছবে, তখন বলবে–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَّبْرُوْرًا وَذَنْبًا مَّغْفُوْرًا وَسَعْيًا مَّشْكُوْرًا–

আর তাওয়াফের প্রত্যেক চক্করে বলবে–

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاعْفُ عَمَّا تَعْلَمْ وَاَنْتَ الاَعَزُّ الاَكْرَمُ، اَللّٰهُمَّ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ–

কোরআন তেলাওয়াত হল উত্তম যিকর। তাই তাওয়াফের সময় তেলাওয়াত করা যেতে পারে। কোরআনে বর্ণিত দোয়া সমুহ পাঠ করা ভাল। নিজের ভাষায় যা ইচ্ছা, দোয়া করবে। তাওয়াফের পর দুরাকআত নামায পড়বে। তারপর সম্ভব হলে জমজমের পানি পান করে সোজা সাফা পর্বতের দিকে চলে যাবে।

হজ্বের চতুর্থ রুকুন

সাফা ও মারওয়া পর্বতের মধ্যে সাঈ করা

সাঈ এর হেকমত ঃ

বুখারী হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, হযরত ইবরাহীম (আঃ) যখন হযরত হাজেরা এবং তার শিশুপুত্র ইসমাইলকে নিয়ে মক্কায় আসলেন এবং কা'বা গৃহের পাশে রাখলেন, তখন মক্কাতে কেউ ছিল না এবং কোন পানিও ছিল না ইবরাহীম (আঃ) সামান্য খেজুর ও সামান্য পানি রেখে চলে যেতে লাগলেন। হযরত হাজেরা ইবরাহীম (আঃ) এর পিছনে দৌড়ে আসলেন এবং বললেন, হে ইবরাহীম! এমন মানবহীন স্থানে আমাদেরকে রেখে তুমি কোথায় যাচ্ছ? তিনি বারবার জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। কিন্তু ইবরাহীম (আঃ) ফিরে দেখেননি বা জবাব দেননি। অতঃপর হযরত হাজেরা বললেন– اَللّٰهُ اَمَرَكَ بِهٰذَا؟

আল্লাহ কি আপনাকে এ আদেশ করেছেন? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ। যখন হযরত হাজেরা বললেন, তাহলে আল্লাহ আমাদেরকে ধ্বংস করবেন না। ইবরাহীম (আঃ) যখন পর্বতের আড়ালে চলে গেলেন, তখন ক্বা'বা গৃহের দিকে ফিরে দোয়া করলেন–

رَبَّنَا اِنِّىْ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِىْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِىْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ، رَبَّنَا لِيُقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِىْ اِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ–

হে আমার প্রভূ! আমি নিজের এক সন্তানকে তোমার পবিত্র গৃহের নিকটে চাষাবাদহীন উপত্যকায় আবাদ করেছি। হে প্রভু! যাতে তারা নামাজ কায়েম করে। সুতরাং আপনি মানুষের অন্তরকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে দিন এবং তাদেরকে ফলমূল দ্বারা রিজিক দান করুন, সম্ভবতঃ তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।

হযরত হাজেরা নিজ পুত্রকে পাশে রেখে ক্বা'বা গৃহের নিকটে একটি গাছের নিচে বসলেন। পানি শেষ হয়ে গেল এবং বুকের দুধও বন্ধ হয়ে গেল। শিশু পুত্রের ক্ষুধা চরমে উঠল। তিনি পানির তালাশে নিকটস্থ সাফা পর্বতে আরোহন করলেন। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। তখন তিনি নীচে আসলেন এবং দৌড় দিয়ে মারওয়া পর্বতে গেলেন। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। এমনি ভাবে তিনি সাত চক্কর দিলেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

فَلِذٰلِكَ سَعَى النَّاسُ بَيْنَهُمَا– এ জন্যই মানুষকে এ দুই পর্বতের মধ্যে সাঈ করতে হয়।

মোট কথা, হযরত হাজেরার ত্যাগ এবং সাঈকে স্বরনীয় করে রাখার জন্য এ দুই পর্বতের মধ্যে সাঈ করা আল্লাহ তায়ালা হাজীদের জন্য ওয়াজিব করে রেখেছেন।

সাঈ এর হুকুম

হযরত ইবনে উমার, যাবের ও হযরত আয়িশা (রাঃ) এবং ইমাম শাফী, মালেক ও ইমাম আহমাদ (রাহঃ) এর মতানুসারে সাঈ হল হজ্বের রুকুন। সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সাঈ তরক করলে হজ্ব সহীহ হবে না।

হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেছেন–

قَدْ سَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّوَافَ بَيْنَ الصَّفَاءِ وَالْمَرْوَاةِ، وَلَيْسَ لِاَحَدٍ اَنْ يَشْرُكَ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا– (رواه البخارى)

নবী করীম (সাঃ) সাফা ও মারওয়া পর্বতের মধবর্তী স্থানে সাঈ করার নিয়ম চালু করে দিয়েছেন, কেউ এ সাঈকে তরক করতে পারবে না। (বোখারী)

হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেছেন, নবী করীম (সাঃ) ও সাহাবাগণ সাফা ও মারওয়া পর্বতের মধ্যে সাঈ করেছেন। তাই সাঈ করা নবীর নীতি হয়ে গেছে।

لَعُمْرِىْ مَا اَتَمَّ اللّٰهُ حَجَّ مَنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَاءِ وَالْمَرْوَةِ– (رواه مسلم)

নিশ্চয়ই আল্লাহ সেই ব্যক্তির হজ্ব পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করেন না, যে সাফা ও মারওয়া পর্বতের মধ্যে সাঈ করবে না। (মুসলিম)

হযরত হাবীবা বিন আয্‌জা (রাঃ) বলেছেন। আমি নবী করীম (সাঃ) কে বলতে শুনেছি–

اِسْعَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ السَّعْىَ– (رواه ابن ماجة، احمد والشّافعى)

সাঈ কর। কারণ, আল্লাহ তায়ালা এটা তোমাদের উপর ফরয করে দিয়েছেন।

ইমাম আবু হানীফা (রাহঃ) এর মতে সাঈ করা ওয়াজিব। তার নিকট খবরে ওয়াহিদ (হাদীস) দ্বারা ওয়াজিব প্রমানিত হয়– ফরয নয়।

সাঈ সহীহ হয়ার শর্তসমুহ

১। ক্বা'বা গৃহ তাওয়াফের পর সাঈ করা। ইমাম আবু হানীফা (রাহঃ) এর মতে তাওয়াফের পর সাঈ করা ওয়াজিব শর্ত নয়। ২। সাত বার সাঈ করা। ৩। সাফা পর্বত থেকে সাঈ আরম্ভ করা এবং মারওয়া পর্বতে শেষ করা। ৪। সাঈ এর জন্য নির্ধারিত পথে সাঈ করা। কারণ, নবী করীম (সঃ) বলেছেন–

خُذُوْا عَنِّىْ مَنَا سِكِكُمْ– আমার নিকট থেকে হজ্বের কানুন গ্রহন কর।

সাফা ও মারওয়া পর্বতের মধ্যে সাঈ করার পদ্ধতি

সাঈ এর জন্য তাহারাত শর্ত নয়। হযরত আয়িশা (রাঃ) এর যখন হয়েজ হল, তখন নবী করীম (সাঃ) তাঁকে বললেন–

فَاقْضِىْ مَايَقْضِ الْحَاجُّ غَيْرَ اَنْ لاَتَطُوْفِى بِالْبَيْتِ حَتَّى تَغْتَسِلَ–

হাজ্বীগণ যা করবে, তুমিও তা কর। কিন্তু গোসল না করা পর্যন্ত তাওয়াফ করবে না। (মুসলিম)

হযরত আয়িশা এবং উম্মে সালমা (রাঃ) বলেছেন, ক্বা'বা গৃহ তাওয়াফ করে দুই রাকাআত নামাজ আদায়ের পর যদি কোনো মহিলার হায়েজ হয়, তবে সে সাফা ও মারওয়াতে সাঈ করতে পারবে। (সাঈদ বিন মানসুর)

যানবাহনে আরোহন করে সাঈ করা যায়েজ। তবে পায়ে হেঁটে চলা উত্তম।হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) পায়ে হেঁটে চলছেন। মানুষ বেশী হলো। নবীজিকে ঢেকে ফেললেন। তখন তিনি উটের উপর আরোহন করলেন, যেন মানুষ তাঁকে দেখতে পায় এবং জিজ্ঞাসা করতে পারে।

وَالْمَشْىُ وَالسَّعْىُ اَفْضَلُ– (رواه مسلم)

দুই চিহ্নের মাঝখানে দ্রুত চলা এবং বাকী স্থানে হেঁটে চলা ভাল। (মুসলিম)

হযরত আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি দেখলেন মহিলারা দুই চিহ্নের মাঝখানে দ্রুত চলছেন। তিনি বললেন–

لَيْسَ عَلَيْكُنَّ السَّعْىُ– (رواه الشافعى) তোমাদের জন্য দ্রুত চলার প্রয়োজন নেই।

নবী করীম (সঃ) যখন সাফা পর্বতের নিকট আসলেন, তখন পাঠ করলেন–

اِنَّ الصَّفَاءَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ–

তিনি সাফা পর্বতে আরোহন করলেন এবং ক্বা'বা গৃহের দিকে মুখ করে তিন বার তাকবীর দিলেন, এবং বললেন–

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِ وَيُمِيْتُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ اَنْجَزَ وَعْدَهُ وَهَزَمَ لاَحْزَابَ وَحْدَهُ–

তারপর দোয়া করলেন এবং এটা তিন বার করলেন। অতঃপর তিনি সাফা পর্বত থেকে নেমে মারওয়া পর্বতের দিকে হাঁটতে লাগলেন। যখন মারওয়াতে পৌঁছলেন, তখন ক্বা'বা গৃহের দিকে তাকালেন এবং সাফা পর্বতে যা করেছিলেন, এখানেও তা করলেন। তিনি সাফা পর্বত থেকে সাঈ আরম্ভ করেন এবং মারওয়াতে এসে শেষ করেন। বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সাঃ) সাঈ এর সময় বেশী করে এ দোয়া করেছেন–

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، اِنَّكَ اَنْتَ الاَعَزُّ الاَكْرَمُ، رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاهْدِنِى السَّبِيْلَ الاَقْوَمُ–

হজ্বের ওয়াজিব সমূহ

হজ্বের ওয়াজিব হল, সেই সব কাজ যা তরক করলে কোরবানী ওয়াজিব হয়। ওয়াজিব সমুহ ঃ-

১। মীকাত থেকে এহরাম বাঁধা। ২। মুজদালিফায় অবস্থান করা। ৩। শয়তানকে পাথর মারা। ৪। ক্বেরান ও তামাত্ত্ব হজ্ব পালনকারীর জন্য কুরবানী (দম দেয়া) করা। ৫। মাথা মুণ্ডানো অথবা ছোট করে চুল কাটা। ৬। মিনায় রাত্রী যাপন করা। ৭। বিদায়ের তাওয়াফ করা।

ওয়াজিব সমূহের বিস্তারিত বর্ণনা

(এক) মীকাত থেকে এহরাম বাঁধা।

মীকাত দুই প্রকার, জামানী ও মুকানী

(ক) মীকাত জামানী হল, শাওয়াল, জ্বিল কায়দা এবং জ্বিল হজ্বের প্রথম দশ দিন। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَعْلُوْمَاتٌ– হজ্বের সময় হল নির্দিষ্ট মাস সমুহ।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, হজ্বের জন্য নির্দিষ্ট মাস সমূহ ব্যতিত কারো জন্য হজ্বের এহরাম বাঁধা সহীহ্ নয়। তিনি আরো বলেছেন–

مِنَ السُّنَّةِ اَنْ لاَيُحْرَمَ بِالْحَجِّ اِلاَّ فِىْ اَشْهُرِ الْحَجِّ– (رواه البخارى)

নবীজির নীতি হল, হজ্বের মাস সমুহ ব্যতিত যেন এহরাম বাধা না হয়। (বোখারী)

(খ) মীকাত মুকানী। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) মীকাত নির্ধারন করে বলে ছেন–

فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ اَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ اَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةِ–

এ হল মীকাত এসব স্থানের বাসিন্দাদের জন্য এবং যারা এর বাইরে থেকে আসবে হজ্ব ও উমরা পালনের জন্যে। (বোখারী)

(দুই) মুজদালিফায় অবস্থান করা। জ্বিল হজ্বের দশ তারিখ রাত্রে মুজদালিফায় অবস্থান করা। এখানে এক আযান ও দু ইকামত দ্বারা মাগরিব ও এশার নামায একত্রে আদায় করা সুন্নাত। মুসলিম শরীফের বর্ণনায় এসেছে। নবী করীম (সাঃ) মুজদালিফায় আসলেন এবং এক আযান ও দু ইকামত দ্বারা মাগরিব ও এশার নামায একত্রে আদায় করলেন–

وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا– এ দুয়ের মাঝখানে কোন (সুন্নাত) নামায পড়েননি।

মুজদালিফায় কিছু সময় অবস্থান করলেই ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। আর রাত্রি যাপন করা, ফজরের নামায জলদি পড়া, অতঃপর মাশআরুল হারামের পাশে দাঁড়িয়ে দোয়া করা এবং ফরসা হওয়ার পর সূর্যোদয়ের পূর্বে মিনার দিকে যাত্রা করা সুন্নাত।

হযরত যাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) মুজদালিফায় আসলেন এবং মাগরিব ও এশার নামায একত্রে আদায় করলেন। তারপর ফজর পর্যন্ত ঘুমালেন। ফজরের নামায আদায় করে কাছওয়া নামাক উটনির উপর আরোহণ করে মাশআরুল হারামে আসলেন এবং বেশী সময় দোয়া করলেন। যখন ফরসা হল, তখন সূর্যোদ্বয়ের পূর্বে মিনার দিকে যাত্রা করলেন। (মুসলিম)

হযরত যাবের বিন মুতইম (রাঃ) থেকে বর্ণিত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

كُلُّ مُزْدَلِفَةَ مَوْقَفٌ وَارْفَعُوْا عَنْ مُحَرسَرٍ–

পুরা মুজদালিফাই মাওকাফ। তবে মুহাচ্ছার মাঠ থেকে দূরে থাকবে।

হযরত যাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقَفٌ وَكُلُّ مُزْدَلِفَةَ مَوْقَفٌ وَكُلُّ مِنَى مَنْحَرٌ–

সমস্ত আরাফাই মাওকাফ, সমস্ত মুজদালিফাই মাওকাফ এবং সমস্ত মিনাই মান্‌হার (জবেহ এর স্থান)। (আবু দাউদ)

(তিন) শয়তানকে পাথর মারা। হযরত যাবের (রাঃ) বলেন, আমি নবীজিকে দেখেছি, তিনি ঈদের দিন যানবাহনের উপর (উটের উপর) বসে পাথর নিক্ষেপ করছেন এবং বলছেন–

لَتَأْ خُذُوْا عَنِّیْ مَنَاسِكَكُمْ فَاِنِّیْ لاَ اَدْرِیْ لَعَلِّیْ لاَ اَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِیْ هٰذِهٖ–

তোমরা অবশ্যই আমার নিকট থেকে তোমাদের হজ্বের মানাসিক (রীতি সমুহ) গ্রহণ করবে। কারণ, হয়তঃ এরপর আমি আর হজ্ব করতে পারব না। (আহ্‌মাদ, মুসলিম, নাসাঈ)

হযরত আব্দুল রহমান তামিমী (রাঃ) বলেছেন, বিদায় হজ্বের সময় নবীজি ছোট ছোট পাথর নিক্ষেপ করেছেন। (তিবরাণী)

হযরত সালমান বিন আমর বিন আস্‌ওয়াদ আল ইজদী (রাঃ) তাঁর মা থেকে বর্ণনা করেছেন, তাঁর মা বলেছেন– আমি নবী করীম (সাঃ) কে বত্‌নে ওয়াদীতে দেখেছি। তিনি বলছেন–

يَا اَيُّهَا النَّاسُ لاَ يَقْتُلُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ فَارْحُوْا بِمِثْلِ حَصَی الْحَزَفِ– (رواه ابوداؤد)

হে মানব মণ্ডলী! তোমরা একে অন্যকে হত্যা করো না। যখন পাথর মারবে, তখন হজফের মত পাথর মারবে। (আবু দাউদ)

আছরাম বলেছেন, হজফ হল– ক্ষুদ্র দানা থেকে সামান্য বড় বীজ।

পাথর নিক্ষেপের হেকমত

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রাসুল (সাঃ) বলেছেন, যখন ইবরাহীম (আঃ) নিজ পুত্র ইসমাইল (আঃ) কে কুরবাণী করার উদ্দেশ্যে মিনায় আসছেন, তখন জমরাতুল আকাবার নিকট শয়তানের প্রতি সাতটা পাথর নিক্ষেপ করলেন। সে যমীনে তলিয়ে গেল। অতঃপর দ্বিতীয় জামরার নিকট আবার সামনে হাজির হল। তিনি সাতটা পাথর শয়তানের প্রতি নিক্ষেপ করলেন। তারপর তৃতীয় জমরায় নিকট আবার হাজির হল। ইবরাহীম (আঃ) আবার তার প্রতি সাতটা পাথর নিক্ষেপ করলেন। সে তলিয়ে গেল। (বায়হাকী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন–

اَلشَّيْطَانُ تَرْجُمُوْنَ وَمِلَّةَ اَبِيْكُمْ تَتَّبِعُوْنَ– رواه ابن خزيمة والحكم)

শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ কর এবং তোমাদের আদি পিতার মাজহাবের অনুসরণ করা।

মূলতঃ আল্লাহর নির্দেশে হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর আদর্শকে স্মরনীয় করে রাখার জন্যেই ঐ তিনটি স্থানে পাথর নিক্ষেপ করতে হয়।

পাথর সংগ্রহ এবং পাথর সংখ্যা

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) মুজদালিফা থেকে পাথর সংগ্রহ করতেন। ইমাম শাফী (রাহঃ) এর মতে এটা মুস্তাহাব।

ইমাম আহমাদ (রাহঃ) এর মতে, যে কোন স্থান থেকেই পাথর সংগ্রহ করতে পারবে। পাথর সমুহ ধৌত করার কোন প্রমান নেই। সর্ব মোট পাথর হবে সত্তুরটি অথবা উনপঞ্চাশটি। ঈদের দিন কেবল বড় শয়তানকে সাতটি পাথর মারতে হয়।

ঈদের পর দিন (১১ তারিখে) প্রথমে ছোট শয়তানকে সাতটি, তারপর মধ্যম শয়তানকে সাতটি এবং পরে বড় শয়তানকে সাতটি পাথর মারতে হয়। প্রত্যেক শয়তানকে সাতটি করে মোট একুশটি পাথর মারতে হয়। তেমনি বার তারিখ প্রত্যেক শয়তাকে সাতটি করে মোট একুশটি পাথর মারতে হয়। তাই মোট হবে উনপঞ্চাশটি পাথর।

আর তের তারিখ মিনায় থাকলে আরো সাতটি করে মোট একুশটি পাথর মারতে হবে। তখন মোট পাথর সংখ্যা হবে সত্তুরটি। ইমাম আহমাদ ও আতা (রাহঃ) বলেছেন, প্রত্যেক শয়তানকে পাঁচটি পাথর মারলেই যথেষ্ট হবে।

পাথর মারার সময়

জ্বিল হজ্বের দশ তারিখ ঈদের দিন সূর্য উদয়ের পর পাথর মারা সুন্নাত। কারন, নবী করীম (সাঃ) ঈদের দিন জুহার সময় জমরাতুল আকাবায় পাথর নিক্ষেপ করেছেন। (বোখারী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) মহিলাদেরকে ঈদের দিন রাত্রে পাথর মারার অনুমতি দিয়েছেন এবং পুরুষদেরকে বলেছেন–

لَاتَرْمُوْا جَمْرَةَ الْعَقَبَةَ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ–

সূর্য উদয়ের পূর্বে বড় শয়তান (জমরাতুল আকাবা) কে পাথর নিক্ষেপ করো না। (তিরমিযী)

আর ঈদের দিন বিকালে বা রাত্রেও পাথর মারা যায়েজ আছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, ঈদের দিন মিনাতে এক ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ) কে বলল, হে আল্লাহর নবী (সাঃ)!

رَمَيْتُ بَعْدَ مَا اَمْسَيْتُ، فَقَالَ لاَ حَرَجَ– (رواه البخارى)

আমি সন্ধ্যার সময় পাথর মেরেছি। নবীজি বললেন, কোন বাধা নেই। (বোখারী)

হযরত নাফে (রাঃ) থেকে বর্ণিত। হযরত সুফিয়া (রাঃ) এর মেয়ে ইবনে উমার এর স্ত্রীর মুজদালিফায় হয়েজ হল। এ জন্য হযরত সুফিয়া ও তার মেয়ে ঈদের দিন সূর্যাস্তের পর মিনায় আসলেন। হযরত ইবনে উমার বললেন, আপনারা পাথর নিক্ষেপ করুন। তিনি তাতে কোন বাধা মনে করেননি। (মালিক)

আর বাকী তিন দিন দুপুরের পর পাথর মারা সুন্নাত। এটা হল জমহুরের মাজহাব।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) (বাকী তিন দিন) দুপুরের পর পাথর মেরেছেন। (আহ্‌মাদ, ইবনে মাজাহ্‌, তিরমিযী)

হযরত যাবের (রাঃ) বলেছেন, আমি নবী করীম (সাঃ) কে দেখেছি–

رَمَى الْجَمْرَةَ ضُحًى يَوْمَ النَّحْرِ وَرَمَى بَعْدَ ذٰلِكَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ–

তিনি ঈদের দিন জুহার সময় পাথর মেরেছেন। এবং বাকী দিন সমূহে দুপুরের পর পাথর মেরেছেন। (মুসলিম, ইবনে খুযাইমা, ইবনে হাব্বান)

আর আতা ও তাউছ বলেছেন, ঈদের দিন এবং বাকী তিন দিন দুপুরে পূর্বে পাথর মারা যায়েজ। আর ইমাম আবু হানীফা ও ইসহাক (রাহঃ) এর মতানুসারে তৃতীয় দিন (১২ তারিখ) দুপুরের পূর্বে পাথর মারা যায়েজ। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন–

اِذَا انْتَفَخَ النَّهَارُ مِنْ يَوْمِ النَّفْرِ الاخِرِ حَلَّ الرَّمْىُ وَالصَّدْرُ–

মিনা থেকে চলে যাওয়ার দিন, যখন সূর্য উপরে উঠে যাবে, তখন পাথর মারা এবং মিনা থেকে চলে যাওয়া হালাল। (ফিকহুস্ সুন্নাহ)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর হাদীসটা যদিও দুর্বল, তবুও বর্তমান যুগে এ হাদীস এবং ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম ইসহাকের মাজহাব অনুযায়ী তৃতীয় দিন (১২ তারিখ), দুপুরের পূর্বে পাথর নিক্ষেপ করাই ভালো। কারণ ঐদিন দুপুরের পর ভিড় হয় বেশী। ভিড়ের চাপে প্রাণ নাশের আশাংকা থাকে। তাই নিজেকে নিরাপদ রাখার জন্য এক মুস্তাহবী সুন্নাতকে তরক করা কোন দোষনীয় হবে না। তাছাড়া, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), আতা, তাউছ, ইমাম আবুহানীফা ও ইসহাকের মতে তো ১২ তারিখ দুপুরের পূর্বে পাথর মারা যায়েজ।

পাথর মারার পদ্ধতি

ক্বা'বা গৃহকে বাম দিকে এবং মিনাকে ডান দিকে রেখে উপত্যকার মধ্য থেকে পাথর মারবে। অন্য দিক থেকেও পাথর মারতে পারবে। তবে পাথর লক্ষ-স্থলে থেকে গড়ায়ে পড়লে কোন অসুবিধা হবে না। পাথর মারার সময় হাত উঠিয়ে বলবে, **'আল্লাহু আকবার'**। হযরত যাবের (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) প্রত্যেকটি পাথর মারার সময় তাকবীর দিতেন। (মুসলিম)

হযরত সালিম বিন আব্দুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী করীম (সাঃ) ছোট শয়তানকে সাতটি পাথর মেরেছেন এবং প্রত্যেকটি পাথর মারার সময় তাকবীর দিয়েছেন। অতঃপর তিনি বাম দিকে সরে কিবলার দিকে দাঁড়িয়ে হাত উঠিয়ে বেশী সময় দোয়া করেছেন। তারপর তিনি মধ্যম শয়তানকে সাতটি পাথর মেরেছেন এবং প্রত্যেকটি পাথর মারার সময় তাকবীর দিয়েছেন। তারপর বাম দিকে সরে কিবলার দিকে দাঁড়িয়ে হাত উঠায়ে দোয়া করেছেন। তারপর তিনি বড় শয়তানের নিকট এসে সাতটি পাথর নিক্ষেপ করেছেন। প্রত্যেকটি পাথর মারতে তিনি তাকবীর দিয়েছেন। অতঃপর এখানে দোয়া না করে চলে গেছেন। (বোখারী, আহ্‌মাদ)

হযরত ইবনে মাসউদ ও ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) বড় শয়তানকে পাথর মারার সময় বলেছেন–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُوْرًا وَذَنْبًا مَغْفُوْرًا– (رواه سعيد بن منصور)

বদলা পাথর মারা

শিশু, মহিলা, অসুস্থ ও অক্ষম ব্যক্তির পক্ষ থেকে অন্য কেউ পাথর মারা যায়েজ। হযরত যাবের (রাঃ) বলেন–

حَجَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَمَعَنَا النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَلَبَّيْنَا عَنِ الصِّبْيَانِ وَرَمَيْتَا عَنْهُمْ–

আমরা নবী করীম (সাঃ) এর সাথে হজ্ব করেছি। আমাদের সাথে ছিলেন মহিলা ও শিশু। আমরা শিশুদের পক্ষ থেকে লাব্বাইকা বলেছি এবং তাদের পক্ষ থেকে পাথর মেরেছি। (ইবনে মাজাহ্)

জনাব আব্দুল আজিজ বিন আব্দুল্লহ বিন বাস তার ফিতাবে লিখেছেন, 'শিশু, নারী, বয়বৃদ্ধ, গর্ভবতী মহিলা, অসুস্থ এবং অক্ষম ব্যক্তির পক্ষে অন্য কেউ পাথর মারতে পারবে। আল্লাহ তালা বলেছেন–

فَاتَّقُوْا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ– (الحقيق و الايضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة) তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় করে চল।

ঈদের দিন করনীয় কাজ সমুহ

হাজীদের জন্য ঈদের দিন তারতীব অনুসারে চারটি কাজ করা মুস্তাহাব। প্রথমে বড় শয়তানকে পাথর মারা, তারপর কুরবাণী করা, অতঃপর মাথা মুণ্ডানো বা ছোট করে চুল কাটা এবং সর্ব শেষে তাওয়াফে এফাজা আদায় করা। তামাত্তু হজ্ব পালনকারীকে তাওয়াফের সাথে সাঈও করতে হয়। আর ক্বেরান ও ইফরাদ হজ্ব পালনকারী যদি তাওয়াফে কুদুমের পর সাঈ না করেন, তবে তাদেরকে তাওয়াফে এফাজার সাথে সাঈ করতে হবে।

ঈদের দিন করনীয় চারটি কাজে তারতীর পালন না করলেও কোন দোষ নেই। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। ঈদের দিন মিনাতে এক ব্যক্তি রাসুল (সাঃ) কে জিজ্ঞসা করল, হে আল্লাহর রাসুল (সাঃ)!

زُرْتُ قَبْلَ اَنْ اَرْمِيْ، فَقَالَ لاَ حَرَجَ– আমি পাথর মারার পূর্বে তাওয়াফ করেছি। নবীজি বললেন, তাতে কোন দোষ নেই। অন্য এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, হে রাসুল (সাঃ)!

حَلَقْتُ قَبْلَ اَنْ اَذْبَحَ، فَقَالَ لاَ حَرَجَ–

আমি কুরবানী করার পূর্বে মাথা মুণ্ডায়েছি। নবীজি বললেন, তাতে কোন দোষ নেই। অপর এক ব্যক্তি বলল, হে রাসুল (সাঃ)!

ذَبَحْتُ قَبْلَ اَنْ اَرْمِيْ، فَقَالَ لاَ حَرَجَ– আমি পাথর মারার পূর্বে কুরবনী করেছি। নবী

করীম (সাঃ) বললেন, তাতে কোন দোষ নেই। অন্য এক বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, সে বলেছে—

رَمَيْتُ بَعْدَ مَا اَمْسَيْتُ، فَقَالَ لاَ حَرَجَ— (رواه البخارى)

আমি বিকালে পাথর মেরেছি, নবী করীম (সাঃ) জবাবে বলেছেন, এতে কোনো দোষ নেই।

প্রথম তাহাল্লুল ও দ্বিতীয় তাহাল্লুল

বড় শয়তানকে পাথর মারা, মাথা মুণ্ডানো বা চুল কাটা এবং তাওয়াফে এফাজা এ তিনটি কাজের মধ্যে যে কোন দুটি কাজ পালন করলেই হাজ্বীদের জন্য স্ত্রী সহবাস ব্যতিত সব কিছু হালাল হয়ে যায়। একে বলা হয় প্রথম তাহাল্লুল।

আর ঐ তিনটি কাজ আদায় করলে পূর্ণ তাহাল্লুল হয়ে যায়। অর্থাৎ স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়া থেকে সকল কিছু হালাল হয়ে যায়। একে বলা হয় দ্বিতীয় তাহাল্লুল।

(চার) আল-হাদ্ঈবা দম দেয়া। তামাত্তু ও ক্বেরান হজ্ব পালন কারী যেহেতু একই বৎসরে হজ্ব ও উমরা দুটিই করতে পারেন, তাই আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করার জন্য তাদেরকে পশু জবেহ করতে হয়। একে বলা হয় আল হাদ্ঈ। আর ইমাম আবু হানীফা (রাহঃ) এর মতানুসারে একে বলা হয় দমে শুকুর। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ ، تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ—

যে ব্যক্তি হজ্ব ও উমরা এক সাথে পালন করতে চায়, তার উপর যা সহজলভ্য তা দিয়ে কুরবানী করা কর্তব্য। আর যে পশু পাবে না, সে হজ্বের দিন সমুহে রোযা রাখবে তিনটি এবং বাড়ী ফিরে আসার পর রাখবে সাতটি। এ ভাবে দশটি রোযা পূর্ণ করবে। (সূরা বাকারা)

তারপর আল্লাহ তা'য়ালা বলেন—

ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ اَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ— (يورة البقرة)

এ নির্দেশটি তাদের জন্য, যাদের পরিবার মাসজিদুল হারামের আশেপাশে বসবাস করে না।

তাই হারাম শরীফের বাসিন্দাগণকে কেবল ইফরাদ হজ্ব করতে হবে। তারা তামাত্তু ও ক্বেরান হজ্ব করতে পারবে না।

দম ওয়াজিব হবার কারণসমূহ

হজ্বের কোন ওয়াজিব তরক করলে যে পশু জবাই করতে হয়, তাকে বলা হয় দম। দম ওয়াজিব হয়ঃ- (ক) ক্বেরান ও তামাত্তু হজ্ব পালনকারীর উপর। (খ) যে ব্যক্তির হজ্বের কোন ওয়াজিব তরক করল। (গ) যে ব্যক্তি হারাম শরীফে করা নিষিদ্ধ কোন কাজ করল। যেমন, গাছ কাটল বা শিকার করল। (ঘ) যে ব্যক্তি সহবাস ব্যতিত এহরাম অবস্থায় করা নিষিদ্ধ কোন কাজ করল।

কুরবানী

যারা হজ্বে যাননি তারা জ্বিল হজ্বের দশ তারিখ ঈদের দিন আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে যে পশু (উট, গরু ও ছাগল) জবেহ্ করেন, তাকে বলা হয় কুরবানী। কুরবানী দ্বিতীয় হিজরী থেকে চালু করা হয়েছে।

কুরবানী করার হেকমত

হযরত ইসমাইল (আঃ) যখন পিতার সাথে চলাফেরা করার বয়সে উপনীত হলেন তখন পিতা ইবরাহীম (আঃ) পর পর তিন দিন স্বপ্ন দেখলেন যে, তিনি তাঁর প্রাণপ্রিয় পুত্র ইসমাইলকে কুরবানী করছেন। তিনি স্বপ্নের বিষয়টি পুত্রের কাছে বললেন। ইসমাইল (আঃ) বললেন, বাবা! আপনি আল্লাহর নির্দেশ কার্যকরী করুন। আমি ইনশাআল্লাহ্ সবর করব।

পিতাপুত্র একমত হয়ে মিনার দিকে চলেছেন। এমনি সময় শয়তান এসে পিতা ও পুত্রকে ধোকা দিতে চাইল। ইবরাহীম (আঃ) তিনটি স্থানেই শয়তানকে সাতটি করে পাথর মারলেন। শয়তান যমীনে তলিয়ে গেল। আল্লাহ্ তায়ালা ঐ তিনটি স্থানে পাথর মারা স্মরনীয় করে রেখেছেন।

অতঃপর যখন পিতা নিজ পুত্রকে জবেহ্ করতে প্রস্তুত হলেন, তখন পুত্র বললেন, বাবা! আমার হাত-পা শক্ত করে বেঁধে নিন, যেন আমি বেশী নড়াচড়া করতে না পারি। আপনার কাপড় সামলিয়ে রাখুন। কারণ আমার মা রক্ত দেখলে হয়ত ব্যাকুল হয়ে পড়বেন। আমার মা'কে আমার সালাম বলবেন এবং আমার জামাটা আমার মা'কে দেবেন। হয়ত আমার মা, আমার জামা দেখে কিছুটা সান্তনা পাবেন। বাবা! আমাকে উপুড় করে শুইয়ে এবং গর্দানে চাকু চালান। কারন, আমার মুখ দেখলে আপনার স্নেহ চরমে উঠবে।

ইবরাহীম (আঃ) বললেন, বৎস! তুমি আমাকে আল্লাহর নির্দেশ পালনে সাহায্য করেছ। অতঃপর তিনি পুত্রকে চুম্বন দিয়ে গর্দানে চাকু চালালেন। বারবার চেষ্টা করার পরও ইসমাইলের একটা লোম কাটছে না। তিনি রাগ করে চাকুটি ফেলে দেন। চাকু বলল, হে ইবরাহীম! খলীল পুত্রকে জবেহ করতে চেষ্টা করছ। আর জলীল নিষেধ করছেন। এমনি সময় একজন ফিরিশতা জান্নাত থেকে একটি ভেড়া নিয়ে আসলেন। তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে বললেন, হে ইবরাহীম। এটা একটি পরীক্ষা, তুমি পাস করেছো এবং স্বপ্নকে সত্যায়িত করেছ। তোমার পুত্রের পরিবর্তে এই ভেড়াটি জবেহ করে নাও।

তোমার এ কুরবানীকে আমি পরবর্তীদের মধ্যে স্মরনীয় করে রেখে দিলাম। আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন–

اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلاَءُ الْمُبِيْنُ، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ، وَتَرَكْنَاهُ عَلَيْهِ فِى الاٰخِرِيْنَ–

নিশ্চয়ই এটা বিরাট একটি পরীক্ষা, আমি তার পরিবর্তে মহান একটি জন্তু দিলাম। আর এ কুরবানীকে পরবর্তীদের মধ্যে স্মরনীয় করে দিলাম।

কুরবানীর শর্ত সমুহ

১। নেসাব পরিমান সম্পদ থাকা ঈদুল আজহার সময় নেসাব পরিমান সম্পদ থাকলে কুরবানী করতে হয়। আর নেসাব পরিমান সম্পদ না থাকলে কুরবানী নেই। সারা বৎসর নেসাব পরিমান সম্পদ থাকা শর্ত নয়।

২। জবেহের পশু সব রকম আইব থেকে পাক হবে। হযরত আলী বিন আবু তালেব (রাঃ) বলেছেন–

اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اَنْ نَسْتَشْرِفُ الْعَيْنَ وَالاُذُنَ وَاَنْ لاَنُضَحِّى بِمُقَابِلَةٍ وَلاَ مُدَابِرَةٍ وَلاَ شَرْقَاءَ وَلاَ خَرْقَاءَ– (رواه الترمذى)

নবী করীম (সাঃ) আমাদেরকে আদেশ করেছেন, যেন আমরা কুরবনীর পশুর চক্ষু এবং কান দেখি। আর আমরা যেন কুরবানী না করি, কান কাটা, কানের পার্শ কাটা কান ফাটা এবং কানে ছিদ্র থাকা জন্তু। (তিরমিযী)

হযরত বারা বিন আযিব (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

لاَ يُضَحّى بِالْعَرْجَاءِ بَيِّنٌ ظَلَمَهَا وَلاَ بِالْعَوْرَاءِ بَيِّنٌ عَوْرَهَا وَلاَ بِالْمَرِيْضَةِ بَيِّنٌ مَرْضَهَا وَلاَ بِالْعَجْفَاءِ الَّتِ لاَتُنْقِىْ– (رواه الترمذى)

লেংড়া, কানা, অসুস্থ এবং পাগল জন্তু যেন কুরবানী করা না হয়। (তিরমিযী)

৩। মুকীম হওয়া। কুরবানী মুকীমের উপর ওয়াজিব- মুসাফীরের উপর কুরবানী নেই।

৪। জন্তু বয়সে উপযুক্ত হবে। উটের বয়স হবে সর্বনিম্ন পাঁচ বৎসর। গরুর বয়স হবে দু বৎসর এবং ছাগল ও ভেড়ার বয়স হবে এক বৎসর।

কুরবানীর হুকুম

নেসাব পরিমান সম্পদের মালিকের উপর কুরবানী করা সুন্নাত। আর ইমাম আবু হানীফা (রাহঃ) এর মতানুসারে কুরবনী করা ওয়াজিব, যে ব্যক্তি কুরবানী করবে না, সে নবীর সুপারিশ থেকে বঞ্চিত হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

فَصَلِّى لِرَبِّكَ وَانْحَرْ–

তোমার প্রভূর উদ্দেশ্যে নামায পড় এবং কুরবানী কর। (সুরা কাওসার)

নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحّى فَلاَ يُقَرِّيْنَ مَصَلاَّنَا–

যে ব্যক্তি ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কুরবানী করল না, সে যেন আমার ঈদগাহের নিকটে না আসে।

কুরবানী পরিবারের উপর– ব্যক্তির উপর নয়

হযরত আতা বিন ইয়াছার (রাহঃ) বলেন, আমি আবু আইয়ূব আনসারীকে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী করীম (সাঃ) এর সময় কোরবানী কিভাবে করা হতো। তিনি বললেন–

اِنَّ الرَّجُلَ يُضَحِّى الشَّاةَ عَنْهُ وَعَنْ اَهْلِ بَيْتِهِ فَيَاْكُلُوْنَ وَيُطْعِمُوْنَ–

এক ব্যক্তি তার ও তার পরিবারের পক্ষ থেকে একটি ছাগল কুরবানী করত। তারা নিজে ও খেত এবং অপরকে খেতে দিত। (তিরমিযী)

মৃত ব্যক্তির নামে কুরবানী

হযরত আলী বিন আবু তালিব (রাঃ) বলেন–

اِنَّهُ كَانَ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ اَحَدُهُمَا عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالاخَرُ نَفْسِهِ، قِيْلَ لَهُ، فَقَالَ اُمِرْتُ بِهِ يَعْنِى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَلاَ دَعُهُ اَبَدًا– (رواه الترمذى)

তিনি দুটি ছাগল কুরবানী করতেন। একটি নবী করীম (সঃ) এর পক্ষ থেকে এবং একটি নিজের পক্ষ থেকে। তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি বললেন, নবীজি আমাকে এমনি করতে আদেশ করেছেন। তাই আমি ইহা কখনও ত্যাগ করব না। (তিরমিযী)

আব্দুল্লাহ বিন মুবারক (রাহঃ) বলেছেন, মুর্দার পক্ষ থেকে কুরবানী করা হলে এর মাংস খাওয়া যাবে না। বরং সাদাকা করে দেয়া হবে।

হানশ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন। আমি আলী (রাঃ) কে দেখেছি, তিনি দুটি ছাগল কুরবানী করছেন। আমি বললাম, এটা কি করছ? তিনি বললেন–

اِنَّ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَنَيْهِ وَسَلَّم اَوْصَانِىْ اَنْ اُضَحِّى عَنْهُ فَاَنَا اُضَحِّى عَنْهُ– (رواه ابوداؤد)

নবী করীম (সঃ) আমাকে ওসীয়ত করেছেন যেন, আমি তাঁর পক্ষ থেকে কুরবানী করি তাই আমি নবীজির পক্ষ থেকে কুরবানী করছি। (আবু দাউদ)

আবু দাউদ বলেছেন, মুনযিরী উক্ত হাদীসের বর্ণনা কারী হানশকে দূর্বল বলেছেন। কারন, অনেকে তার সমালোচনা করেছেন।

কুববানী করার সময়

ঈদের নামাযের পর কুরবানী করা সুন্নাত। নামাযের আগে কুরবানী করা সহীহ নয়। হযরত বারা বিন আযিব (রাঃ) বলেছেন, ঈদের দিন নবী করীম (সঃ) খুতবা দিলেন এবং বললেন–

لاَ يَذْ بَحَنَّ اَحَدُكُمَ حَتَّى يُصَّى، فَقَامَ خَالِىْ وَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ عَجَلْتُ

نُسُكِيْ لأُطْعِمَ اَهْلِيْ وَاَهْلَ دَارِيْ وَجِيْرَانِيْ، فَقَالَ اَعِدْ ذَبِحَكَ-

তোমাদের কেউ কখনও নামাযের পূর্বে কুরবানী করবে না। তখন আমার খালু দাঁড়িয়ে বললেন, হে রাসূল! আমি নামাযের পূর্বে কুরবানী করেছি। আমার পরিবার, বাড়ীর মানুষ এবং প্রতিবেশীকে খাওয়ানোর জন্য। নবীজি বললেন, তুমি আবার কুরবানী কর। (তিরমিযী)

হযরত আনাছ বিন মালিক (রাঃ) বলেছেন। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন-

مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَقَدْ ذَبَحَ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَا الصَّلاَةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَاَصَابَ سُنَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ- (رواه البخارى، مسلم، والترمذى)

যে ব্যক্তি নামাযের পূর্বে জবেহ করল, সে তার নিজের জন্যই জবেহ করল। আর যে নামাযের পর জবেহ করল, তার কুরবানী পূর্ণ হল এবং সে মুসলমানদের সুন্নাতকে কার্যকরী করল।

কুরবানীর মাংস খাওয়া

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوْا الْبَائِسَ الْفَقِيْرَ- কুরবানীর মাংস থেকে নিজে খাও এবং অভাব গ্রস্ত ফকীরকে আহার করাও।

হযরত আবু সাঈদ খুদবী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন-

كُلُوْا وَاَطْعِمُوْا وَادَّخِرُوْا- (رواه مسلم) কুরবানীর মাংস খাও, আহার করাও এবং জমা করে রাখ।

হযরত যাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি নবীজি থেকে বর্ণনা করেছেন-

اَنَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ اَكْلِ لُحُوْمِ الضَّحَاهَ بَعْدَ ثَلاَثٍ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ كُلُوْا وَتَزَوَّدُوْا وَادَّخِرُوْا-

নবী করীম (সাঃ) কুরবানীর মাংস তিন দিনের পর খেতে নিষেধ করেছেন। পরের বৎসর তিনি বলেন-

كُلُوْا وَتَزَوَّدُوْا وَادَّخِرُوْا- (رواه مسلم) কুরবানীর মাংস খাও, পাথেয়ও হিসাবে সাথে নাও এবং জমা করে রাখ।

হযরত ছাওবান (রাঃ) বলেছেন, বিদায় হজ্বে নবী করীম (সাঃ) কুরবানী করে বললেন, হে ছাওবান!

اَصْلِحْ لَحْمَ هَذَا فَلَمْ اَزَلْ اُطْعِمُهُ مِنْهَا حَتَّى قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ- (رواه مسلم)

এর মাংস হেফাজত করে সহীহ্ করে রাখ, আমি মদিনায় আসা পর্যন্ত এ মাংস থেকে নবীজিকে খেতে দিয়েছি। (মুসলিম)

বিজ্ঞ উলামাগণ বলেছেন, মুস্তাহাব হল, কুরবানীর মাংস থেকে তিন ভাগের এক ভাগ নিজে খাবে, এক ভাগ আত্মীয় স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবকে খাওয়াবে। আর এক ভাগ ফকীর মিসকীনদেরকে দেবে।

কুরবানীর ফজিলত

হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

مَا عَمِلَ ابْنُ ادَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلاً اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ اِهْرَاقِ الدَّمِ وَانَّهَا لَتَاْتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُوْنِهَا وَاظْلاَ فِهَا وَاَشْعَارِهَا، وَاِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمُكَانٍ قَبْلَ اَنْ يَقَعَ عَلَى الاَرْضِ، فَطَيِّبُوْا بِهَا نَفْسًا–

আদম সন্তান ঈদের দিন যা কিছু আমল করে, তার মধ্যে আল্লাহর নিকট বেশী পছন্দনীয় হল কুরবানী করা। এটা পরকালে তার শিং, খুর এবং লোমসহ আসবে। আর কুরবানীর রক্ত যমীনে পড়ার পূর্বেই আল্লাহ তায়লা কবুল করে নেন। সুতরাং খুশী মনে কুরবানী কর। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেছেন। বর্ণিত আছে, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

لِصَاحِبِهَا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ–

যে কুরবানী করে, তার জন্য প্রত্যেকটি লোমের পরিবর্তে একটি নেকী লিখা হয়।

শরীক হয়ে কুরবানী করা

কুরবানী বা দম এক জনের জন্য একটি ছাগল অথবা ভেড়াই যাথেষ্ট। আর গরু অথবা উট সাত জনে মিলে দেয়া যাবে। হযরত যাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন–

نَحَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ اَلْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ– (رواه احمد ومسلم والترمذى)

আমরা হুদাইবিয়ার বৎসর নবীজির সাথে কুরবানী করেছি, সাত জনে একটি গরু এবং সাত জনে একটি উট। (আহ্‌মাদ, মুসলিম, তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী (রাহঃ) বলেছেন, উক্ত হাদীসের উপরই সাহাবায়ে কেরাম এর আসল ছিল। আর হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন। আমরা নবীজির সাথে সফরে ছিলাম। ঈদ উপস্থিত হল। আমরা একটি গুরু সাত জনে কুরবানী করলাম এবং একটি উট দশ জনে কুরবানী করলাম।

ইমাম তিরমিযী (রাহঃ) বলেছেন, ইবনে আব্বাসের হাদীসটি গরীব। ফজল বিন মুসা ব্যতিত অন্য কেউ বর্ণনা করেননি। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি নবীজির নিকট এসে বলল, হে নবী! আমার উপর উট জবেহ্‌ করা ওয়াজিব। কি ~ আমি উট ক্রয় করতে পারছি না।

فَـأَمَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَبْتَاعَ سَبْعَةَ شِيَاةٍ–

নবী করীম (সাঃ) তাকে আদেশ করলেন, যেন সে সাতটি ছাগল ক্রয় করে (জবেহ করে)। (আহ্‌মাদ, ইবনে মাজাহ্‌)

কশাই এর কাজের মূল্য

যে কুরবানীর পশুর চামড়া ছড়িয়ে গোস্ত বানিয়ে দেয় তাকে চামড়া বা মাংস থেকে কিছুই দেয়া যাবে না। কামলার প্রাপ্য নিজেই দিতে হবে। অবশ্য তাকে সাদাকা হিসাবে মাংস দেয়া যাবে।

হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, নবী করীম (সাঃ) আমাকে আদেশ করেছেন, যেন আমি উট কুরবানীর সময় উপস্থিত থাকি এবং এর চামড়া ভাগ করে দেই।

وَاَمَرَنِىْ اَنْ لاَ اُعْطِىَ الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا، وَقَالَ نَحْنُ نُعْطِيْهِ مِنْ عِنْدِ نَا–

আরো আদেশ করেছেন যেন কশাইকে কুরবানীর পশু থেকে কিছু না দেই। আমরা আমাদের পক্ষ থেকে কশাইকে দিতাম। (আল জামায়াহ্‌)

হযরত হাসান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন–

لاَ بَأْسَ اَنْ يُعْطِىَ الْجَزَّارَ الْجِلْدَ– কশাইকে চামড়া দেয়া দোষনীয় নয়।

হযরত আলী (রাঃ) এর হাদীস দ্বারা প্রমানিত হচ্ছে যে, কুরবানীর সময় নিজে হাজির না হয়ে কাউকে প্রতিনিধি হিসাবে পাঠালেই চলবে।

নিজ হাতে কুরবানী করা

নিজ হাতে কুরবানী করা সুন্নাত। নবী করীম (সাঃ) নিজ হাতে ছাগল কুরবানী করে বললেন–

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُمَّ هٰذَا عَنِّىْ وَعَنْ مَنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ اُمَّتِىْ–

আল্লাহর নামে জবেহ্‌ করছি। আল্লাহ সব চেয়ে বড়। হে আল্লাহ! এটা আমার পক্ষ থেকে এবং আমার উম্মাত, যারা কুরবানী করেনি তাদের পক্ষ থেকে। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

যে ব্যক্তি জবেহ্‌ করতে সক্ষম নয়, সে কুরবানীর সময় হাজির থাকবে। নবী করীম (সঃ) হযরত ফাতেমা (রাঃ) কে বলেছেন, হে ফাতেমা! তুমি দাঁড়াও এবং তোমার কুরবানীর নিকট হাজির হও।

فَاِنَّهُ يُغْفَرُ لَكَ عِنْدَ اَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَا كُلَّ ذَنْبٍ عَمِلْتَهُ–

কারণ রক্তের প্রথম ফোটা পড়ার সময় তোমার সকল পাপ ক্ষমা করা হবে। তুমি বল–

اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، لَاشَرِيْكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ–

আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও মরন, সবই আল্লাহর জন্যে, যিনি বিশ্বের প্রভূ। তার কোন শরীক নেই। এটাই আমাকে আদেশ করা হয়েছে এবং আমি সর্বপ্রথম আত্মসমর্পণকারী

একজন সাহাবী বললেন, হে রাসুল! এটা কি আপনার এবং আপনার পরিবারের জন্য নির্দিষ্ট। নবীজি বললেন, না। এটা সকল মুসলমানদের জন্য।

মাথা মুণ্ডানো বা ছোট করে চুল কাটা

হযরত আনাছ বিন মালিক (রাঃ) বলেছেন, নবী করীম (সাঃ) বড় শয়তানকে পাথর মারার পর কুরবানী করলেন। তারপর নাপিতকে মাথায় ডান দিক দিয়ে বললেন, 'মুণ্ডাও।' সে মুণ্ডাল। রাসুল (সাঃ) আবু তালহা (রাঃ) কে ডেকে ঐ চুলগুলো দিয়ে দিলেন। তারপর মাথার বাম দিক দিয়ে বললেন, মুণ্ডাও। সে মুণ্ডাল। নবীজি ঐ চুলগুলো আবু তালহাকে দিয়ে বললেন, এগুলো মানুষের মধ্যে বন্টন করে দাও। (মুসলিম)

ইবনু তাইমিয়া, বিন বায এবং সালেহ উছাইমিন (রাহঃ) বলেছেন, চুল দান করা নবীজির জন্য খাছ। অন্য কোন পীর বা ওলীর জন্য তাবাররুক হিসাবে কিছু দেয়া যায়েজ নয়।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِيْنَ হে আল্লাহ! মাথা মুণ্ডানোওয়ালাদেরকে ক্ষমা করুন।

সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে রাসুল! চুল ছোট করে কাটনেওয়ালাকেও! নবী করীম (সাঃ) বললেন, اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِيْنَ

সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে রাসুল! চুল কাটনে ওয়ালাকেও। নবী করীম (সাঃ) বললেন–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِيْنَ–

সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে রাসুল! চুল ছোট করে কাটনে ওয়ালদেরকেও। নবী করীম (সাঃ) বললেন, وَ لِلْمُقَصِّرِيْنَ চুলকাটনে ওয়ালাদেরকে ও ক্ষমা করুন। (মুসলিম)

নারীর উপর চুল মুণ্ডানো নেই

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلَقٌ وَاِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيْرُ– (رواه ابوداؤد)

নারীদের উপর মাথা মুণ্ডানো নেই। বরং নারীরা তাক্‌সীর করবে।

তাকসীর হল, মাথার সামনে থেকে চুলের গুছা ধরে এক আংগুল পরিমান কর্তন করা।

হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেছেন–

ا نَهَى النَّبِىُّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا– (رواه الترمذى)

নারীকে তার মাথা মুণ্ডাতে নবী করীম (সাঃ) নিষেধ করেছেন। (তিরমিযী)

ওকী বলেন, ইমাম আবু হানীফা বলেছেন, চুল মুণ্ডানোর সময় আমি হজ্বের পাঁচটি বিষয়ে ভুল করেছি। নাপিত আমাকে শিক্ষা দিয়েছে। (১) আমি তাকে বল্‌লাম, তুমি মাথা মুণ্ডাতে কত নেবে? নাপিত বললো, হজ্বের সময় কোন শর্ত করতে নেই। বসুন, (২) আমি কিবলার বিপরীত দিকে বসলাম। সে বলল, কিবলার দিকে বসুন। (৩) আমি তাকে মাথায় বাম দিক দিলাম। সে বল্‌ল, ডান দিক দেন। (৪) আমি নীরবে বসে রইলাম। সে বলল তাকবীর দিতে থাকুন। (৫) আমি যেতে লাগলাম। সে বলল, দুই রাকআত নামায পড়ে যান। আমি বললাম, এর দলীল কি? সে বলল, আমি আতাকে এমনি করতে দেখেছি।

মিনায় রাত যাপন।

মিনায় রাত যাপন করা ওয়াজিব। কারন, নবী করীম (সাঃ) ও তাঁর সাহাবীগণ মিনায় রাত যাপন করেছেন এবং বলেছেন–

خُذُوْا عَنِّىْ مَنَاسِكَكُمْ– আমার নিকট থেকে তোমাদের নুসুক সমূহ গ্রহণ কর।

আর মিনায় রাত যাপন করা হজ্বের মানাসিকের (নিয়ম পদ্ধতি) অন্তর্ভূক্ত। (ফতহুল বারী)

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) মিনার রাত সমুহে হাজ্বীদেরকে পানি পান করানোর জন্যে মক্কায় রাত যাপনের অনুমতি চাইলেন। নবী করীম (সাঃ) তাকে অনুমতি দিলেন। (বোখারী)

উক্ত হাদীস প্রমান করছে যে, বিশেষ কোন ওযর ব্যতিত মিনার রাত যাপন করা জরুরী।

মুজাহিদ বলেছেন, রাতের যে কোন অংশে মিনায় অবস্থান করলেই হবে, সারা রাত থাকা জরুরী নয়।

বিদায়ের তাওয়াফ

বিদায়ের তাওয়াফকে তাওয়াফুস সদরও বলা হয়। কারন, এটা মক্কা থেকে যাওয়ার সময় করা হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

لاَ يَنْفِرُ اَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُوْنَ اخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ (رواه مسلم وابوداؤد)

তোমাদের কেউ মক্কা থেকে যাবে না, কিন্তু তার সর্ব শেষ কাজ হবে ক্বা'বা গৃহ তাওয়াফ করা।

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) বলেছেন–

اَخِرُ النُّسُكِ اَلطَّوَافُ بِالْبَيْتِ (رواه وملك) সর্বশেষ নুসুক হল ক্বা'বা গৃহ তাওয়াফ করা।

মক্কার অধিবাসী এবং নারীদের উপর বিদায়ের তাওয়াফ ওয়াজিব নয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, হায়েজা নারীদেরকে বিদায়ের তাওয়াফ ছাড়াই মক্কা থেকে চলে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

হযরত সুফিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত। বিদায় হজ্বের সময় তাঁর হায়েজ হল। তিনি নবীজিকে জানালেন। নবী করীম (সঃ) বললেন–

أَحَا بِسَتْنَا هِيَ؟ قَالُوْا اِنَّهَا قَدْ اَفَاضَتْ قَالَ اِذًا– (متفق عليه)

সে কি আমাদেরকে যাত্রা থেকে বিরত রাখবে? সাহাবীগণ বললেন, তিনি তো তাওয়াফে এফাজা আদায় করেছেন। নবীজি বললেন, তাহলে কোন বাধা নেই। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

হজ্ব পালনের পদ্ধতি

হজ্বের জন্য সম্পদ হালাল হতে হবে। অপরের হক থাকলে তা আদায় করতে হবে। তাওবা করবে এবং নামাযের পাবন্দ হবে। কারন, পাঁচ ওয়াক্ত নামায না পড়লে হজ্ব কবুল হবে না।

হজ্বের এহরামের পূর্বে মুস্তাহাব হল, চুল, গোঁফ ও নখ কাটা এবং গোসল করে আতর লাগানো। অতঃপর যখন মীকাতের নিকটবর্তী হবে, তখন এহরামের কাপড় পরিধান করবে এবং দুই রাকআত নামায পড়ে হজ্বের নিয়ত করবে যে, ইফরাদ, তামাত্তু না কে্রান হজ্ব করবে। হজ্বের নিয়ত মূখে উচ্চারন করা যায়েজ। অতঃপর উচ্চঃস্বরে তালবিয়া পাঠ করতে থাকবে।

এহরাম অবস্থায় বিবাহ, স্ত্রী সহবাস ও ঝগড়া-ফাসাদ করা এবং সিলাই করা কাপড় পরিধান থেকে বিরত থাকবে। তেমনি মাথা ঢাকা, নখ ও চুল কাটা, শিকার করা এবং হারাম শরীফের গাছ কাটা থেকেও বিরত থাকবে। যখন মক্কাতে পৌছবে, তখন বাবুস সালাম দিয়ে প্রবেশ করবে এবং বলবে–

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ–

আর যখন ক্বা'বা গৃহ দেখবে, তখন বলবে–

اَللّٰهُمَّ زِدْ هٰذَا الْبَيْتَ تَشْرِيْفًا وَتَعْظِيْمًا وَتَكْرِيْمًا وَمَهَابَةً، وَزِدْ مِنْ شَرَفِه وَعَظْمِه مِمَّنْ حَجَّهُ اَوْ اِعْتَمَرَهُ تَشْرِيْفًا وَتَكْرِيْمًا وَتَعْظِيْمًا وَبِرًّا، اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ–

অতঃপর কালো পাথরের নিকট যাবে এবং পাথরকে চুম্বন দেবে বা স্পর্শ করবে। আর সম্ভব না

হলে হাত দিয়ে ইশারা করে বলবে- بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ তারপর ক্বা'বা গৃহকে বাম দিকে রেখে হাঁটতে থাকবে। কালো পাথর থেকে তাওয়াফ আরম্ভ হবে এবং কালো পাথরে এসে শেষ হবে। পূর্ণ সাত চক্কর দেবে এবং প্রত্যেক চক্করে রুকনে ইয়ামানীকে স্পর্শ করবে এবং কালো পাথরকে সম্ভব হলে চুম্বন দেবে প্রথম তিন চক্করে রমল করা মুস্তাহাব। প্রথমবার তাওয়াফে ইযতেবা করতে হয়। তাওয়াফের সময় বেশী করে যিকর ও দোয়া করবে। বিশেষ কোন চক্করে বিশেষ কোন দোয়া নেই। তাওয়াফে বেশী করে পড়বে-

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلاَمُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

আর রুকনে ইয়ামানী ও কালো পাথরের মাঝখানে পড়বে-

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ، وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الاَبْرَارِ يَاعَزِيْزُ يَاغَفَّارُ يَارَبَّ الْعٰلَمِيْنَ-

তাওয়াফের প্রত্যেক চক্করে এ দোয়া করবে-

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاعْفُ عَمَّا تَعْلَمْ وَاَنْتَ الاَعَزُّ الاَكْرَمُ، اَللّٰهُمَّ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ-

সাত চক্করের পর মাকামে ইবরাহীমে অথবা মসজিদের যে কোন স্থানে দুই রাকআত নামায পড়বে। তারপর জমজমের পানি পান করে সাফা পর্বতের দিকে চলে যাবে। সাফা পর্বতের নিকটে আসলে পড়বে-

اِنَّ الصَّفَاءَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ-

যখন সাফা পর্বতে আরোহন করবে, তখন ক্বা'বা গৃহের দিকে মুখ করে তিন বার তাকবীর দেবে এবং বলবে-

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْىِ وَيُمِيْتُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ، لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ اَنْجَزَ وَعْدَهُ وَهَزَمَ لاَحْزَابَ وَحْدَهُ-

তারপর মারওয়া পর্বতের দিকে হাঁটতে থাকবে। দুই চিহ্নের মধ্যবর্তী স্থানে দ্রুত চলবে (রমল করবেন)। নারীদের জন্য ক্বা'বা গৃহ তাওয়াফে এবং সাঈ করতে রমল করতে নেই। সাফা পর্বত থেকে সাঈ আরম্ভ হবে এবং মারওয়াতে এসে শেষ হবে। এমনিভাবে পূর্ণ সাত চক্কর দিবে। সাঈ করার সময় বেশী করে এ দোয়া করবে-

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، اِنَّكَ اَنْتَ الاَعَزُّ الاَكْرَمُ، رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاهْدِنِى السَّبِيْلَ الاَقْوَمَ–

মারওয়া পর্বতে এসে সাত চক্কর শেষ হবে। তখন মাথা মুণ্ডাবে অথবা ছোট করে চুল কাটবে। চুল কাটার পর উমরা পূর্ণ হয়ে গেল। এখন তামাত্তু হজ্ব পালনকারী এহ্রামের কাপড় খুলে হালাল হয়ে যাবে। আর ক্বেরান ও ইফরাদ হজ্ব পালনকারী এহ্রাম অবস্থায়ই থাকবে।

অতঃপর জ্বিল হজ্বের আট তারিখ তামাত্তু হজ্ব পালনকারী নিজ বাসস্থান থেকেই হজ্বের এহ্রাম বাঁধবে এবং সকল হাজ্বীগণ মিনায় চলে যাবে। সেখানে রাত যাপন করবে। পরদিন সূর্য উদয়ের পর আরাফাতে চলে যাবে এবং নামিরাতে অবস্থান করবে। দুপুরের পর আরাফার মাঠে প্রবেশ করবে। সেখানে বেশী করে যিকর ও দোয়া করতে থাকবে। নবী করীম (সাঃ) আরাফার মাঠে বেশী বেশী পড়েছেন–

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ–

সূর্যাস্তের পর মুজদালিফায় চলে আসবে এবং এশা ও মাগরিব এর নামায একত্রে পড়বে এবং এশার নামায কছর পড়বে। এখানে রাত যাপন করবে। ফজরের নামায পড়ে বেশী করে দোয়া করবে এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে মিনার দিকে যাত্রা করবে। মিনাতে এসে বড় শয়তানকে সাতটি পাথর মারবে এবং প্রত্যেকটি পাথর মারার সময় হাত উঠায়ে বলবে 'আল্লাহু আকবার।'

নবী করীম (সাঃ) বড় শয়তানকে পাথর মারার সময় বলেছেন–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُوْرًا وَذَنْبًا مَغْفُوْرًا–

বড় শয়তানকে পাথর মারার পর ক্বেরান ও তামাত্তু হজ্ব পালনকারী কুরবানী করবে। অতঃপর মাথা মুণ্ডাবে বা মাথার চুল ছোট করে কাটবে। তখন প্রথম তাহাল্লুল হয়ে গেল। অর্থাৎ স্ত্রী সহবাস ব্যতিত তার জন্য সব কিছু হালাল হয়ে গেল। এরপর মক্কাতে এসে তাওয়াফে এফাজা আদায় করবে। ক্বেরান ও ইফরাদ হজ্ব পালনাকারী তাওয়াফে কুদুমের পর সাঈ করলে আর সাঈ করতে হবে না। তামাত্তু হজ্ব পালনকারী তাওয়াফে এফাজার পর সাঈ করবে। তখন তার দ্বিতীয় তাহাল্লুল হয়ে গেল। আর্থাৎ স্ত্রী সহবাস সহ সব কিছু হালাল হয়ে গেল।

অতঃপর মিনায় চলে যাবে এবং রাত যাপন করবে। এগার ও বার তারিখ তিন শয়তানকে সাতটি করে পাথর মারবে। তারপর বার তারিখ মক্কায় চলে আসবে। মক্কা থেকে চলে যাওয়ার পূর্বে বিদায়ের তাওয়াফ করবে। এ হল হজ্ব পালনের সংক্ষিপ্ত নিয়ম।

রাস্তায় বাধা প্রাপ্ত হওয়া

হজ্ব কিংবা উমরার উদ্দেশ্যে যাত্রা করার পর যদি কেউ শত্রু দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় অথবা অসুস্থতার কারনে মক্কায় পৌছতে অক্ষম হয় কিংবা সম্পদ চুরি হওয়ার দরুন মক্কায় পৌছানো অসম্ভব হয়,

তাহলে সে ঐ স্থানেই মাথা মুণ্ডায়ে বা ছোট করে চুল কেটে হালাল হয়ে যাবে। কুরবানীর জন্তু সাথে থাকলে কুরবানী করে নেবে। আর পরবর্তী বৎসর এর ক্বাযা আদায় করবে। আর নফল হজ্ব হলে ক্বাযা আদায় করতে হবে না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন–

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَدْ اُحْصِرَ فَحَلَقَ وَجَامَعَ نِسَاءَهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ حَتَّى اِعْتَمَرَ عَامًا مُقْبِلاً– (رواه البخارى)

নবী করীম (সঃ) বাধা প্রাপ্ত হলেন। তিনি মাথা মুণ্ডালেন, স্ত্রীর সাথে মিলিত হলেন এবং কুরবানী করলেন। আর পরবর্তী বৎসর উমরা আদায় করলেন। (বোখারী)

এহরামের সময় এরূপ শর্ত করা যায়েজ যে রাস্তায় বাধাপ্রাপ্ত হলে অথবা অসুস্থ হলে, হালাল হয়ে যাব।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) দাবায়া বিনতে যুবেরকে বলেছেন–

حُجِّىْ وَاشْتَرِطِىْ اَنْ مُحِلِّىْ حَيْثُ تَحْبِسُنِىْ–

তুমি হজ্বের নিয়ত কর এবং শর্ত কর। যেখানে বাধা প্রাপ্ত হবে, সেখানেই হালাল হয়ে যাবে। আর যখন শর্ত করবে, তখন বলবে–

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ مُحِلِّىْ مِنَ الاَرْضِ حَيْثُ تَحْبِسُنِىْ– (رواه الترمذى)

উমরা

উমরা শব্দের অর্থ জিয়ারত করা। নবী করীম (সাঃ) চারটি উমরা করেছেন এবং মানুষকেও উমরা করতে আদেশ করেছেন। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

قَابِعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ– (رواه النسائ والترمذى)

বার বার করে হজ্ব ও উমরা কর। (তিরমিযী, নাসাঈ)

বৎসরের যে কোন মাসে উমরা করা যায়েজ। তাউছ বলেছেন, জাহিলী যুগে হজ্বের মাস সমুহে উমরা করা পাপ মনে করা হত। তারা বলত, যখন সফর মাস আসে এবং হাজীগণ চলে যায়, তখন উমরা করা হালাল হয়। যখন ইসলাম আসল, তখন মানুষকে হজ্বের মাসসমূহে উমরা করার আদেশ করা হল।

উমরার হুকুম

হানাফী ও মালিকী মাজহাবে উমরা করা সুন্নাত। হযরত যাবের (রাঃ) বলেন–

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم سُئِلَ عَنِ الْعُمْرَةِ أَ وَاجِبَةٌ هِيَ؟ قَالَ لاَ–

নবী করীম (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হল, উমরা ওয়াজিব কি না? তিনি বললেন, না। (তিরমিযী) আর ইমাম আহমাদ ও শাফী (রাহঃ) এর মতে, জীবনে একবার উমরা করা ফরয। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–

وَ اَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ– হজ্ব এবং উমরা পূর্ণ কর।

হযরত আবু রেজিন উকায়লী (রাঃ) বলেন, তিনি নবীজির নিকট এসে বললেন, হে রাসুল! আমার পিতা বৃদ্ধ মানুষ তিনি হজ্ব ও উমরা পালন করতে পারবে না এবং যানবাহনেও আরোহন করতে সক্ষম নয়। নবী করীম (সাঃ) বললেন–

حُجَّ عَنْ اَبِيْكَ وَاعْتَمِرْ– (رواه صحاح السنة)

তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্ব ও উমরা আদায় কর।

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) বলেছেন–

لَيْسَ اَحَدٌ اِلاَّ وَعَلَيْهِ حِجَّةٌ وَعُمْرَةٌ– (رواه البخارى)

প্রত্যেক ব্যক্তির উপর হজ্ব ও উমরা করা জরুরী। (বোখারী)

উমরার ফজিলত

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

اَلْحُجَّاجُ وَالْعُمَّارُ وَفْدُ اللّٰهِ، اِنْ دَعَوْهُ اَجَابَهُمْ وَاِنِ اسْتَغْفَرُوْهُ غَفَرَ لَهُمْ–

হাজ্বী ও উমরা পালনকারীগণ আল্লাহর দল। তারা যখন দোয়া করে, তখন তাদের দোয়া আল্লাহ কবুল করেন এবং যখন ক্ষমা প্রার্থনা করে, তখন তাদেরকে ক্ষমা করেন। (নাসাঈ, ইবনে মাজাহ্, ইবনে খুযাইমাহ্)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

اَلْعُمْرَةُ اِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ اِلاَّ الْجَنَّةَ– (متفق عليه)

এক উমরা অন্য উমরা পর্যন্ত মাঝখানের পাপ সমুহ মুছে দেয়। আর মাকবুল হজ্বের একমাত্র প্রতিদান হল জান্নাত। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

تَابِعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَاِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوْبَ كَمَا يَنْفِى الْكِيْرُ خُبْثَ الْحَدِيْدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحِجَّةِ الْمَبْرُوْرَةِ ثَوَابٌ اِلاَّ الْجَنَّةِ–

বার বার করে হজ্ব ও উমরা কর। কারন, হজ্ব ও উমরা অভাব ও পাপকে এমনভাবে দূর করে, যেমনি ভাবে কর্মকার লৌহ, সোনা ও রূপার ময়লাকে দূর করে দেয়। আর মাকবুল হজ্বের ছাওয়াব হল জান্নাত। (নাসাঈ, তিরমিযী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন-

عُمْرَةٌ فِىْ رَمْضَانَ تَعْدِلُ حِجَّةً- (رواه احمد وابن ماجة)

রমজান মাসে উমরা করা হজ্বের সমান। (আহ্‌মাদ, ইবনে মাজাহ্‌)

হযরত যাবের (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন-

هَذَا الْبَيْتَ مِنْ حَاجٌ دِعَامَةُ الاِسْلاَمِ، فَمَنْ خَرَجَ يَوْمٌ هَذَا الْبَيْتَ مِنْ حَاةٌ اَوْمُعْتَمِرٍ كَانَ مَضْمُوْنًا عَلَى اللّهِ اِنْ قَبَضَهُ اَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَاِنْ رَدَّهُ رَدَّهُ بِـأَجْرٍ وَغَنِيْمَةٍ- (رواه ابن جريج)

এ গৃহ হল ইসলামের স্তম্ভ। যে ব্যক্তি হজ্ব বা উমরার জন্য এ গৃহের উদ্দেশ্যে বের হয়, আল্লাহ তার যামিন হয়ে যান, তার মৃত্যু হলে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর ফিরে আসলে ছাওয়াব ও গণীমত সহ ফিরায়ে আনবেন। (ইবনে জারীর)

উমরার রুকুন সমুহ

উমরার রুকুন হল তিনটি। (১) এহরাম বাঁধা। (২) ক্বা'বা গৃহ তাওয়াফ করা। (৩) সাফা ও মারওয়া পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে সাঈ করা।

উমরার মীকাত

হজ্বের মীকাত ইল উমরার মীকাতে। কিন্তু যারা মীকাতের ভিতরে থাকে, তাদের মীকাত হল হিল। হযরত আব্দুর রহমান বিন আবুবকর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) তাকে আদেশ করলেন যে হযরত আয়িশা (র‌াঃ) কে নিয়ে তানয়ীমে যান এবং উমরা করান। (বোখারী, মুসলিম, তিরমিযী)

'হজ্ব পালনের পদ্ধতি' নামক শিরোনামে উমরা পালনের নিয়ম বর্ণিত হয়েছে।

জিয়ারত

মসজিদে নববীর জিয়ারত

তিনটি মসজিদ ব্যতিত অন্য কোন স্থানে ছাওয়াবের নিয়াতে ভ্রমন করা যায়েজ নয়। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম (সঃ) থেকে বর্ণনা করে বলেছেন-

لاَتُشَدُّ الرِّحَالُ اِلاَّ اِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ وَمَسْجِدِىْ هَذَا

وَالْمَسْجِدُ الاَقْصى- (رواه البخارى، مسلم وابوداؤد)

তিনটি মসজিদ ব্যতিত অন্য কোথায়ও ছাওয়াবের জন্য ভ্রমন করা যাবে না। মাসজিদে হারাম, আমার এ মসজিদ এবং মাসজিদে আকসা। (বোখারী, আবু দাউদ, মুসলিম)

হজ্বের সাথে জিয়ারতের কোন সম্পর্কে নেই। হজ্ব করার পর অথবা হজ্বের পূর্বে মসজিদে নবীর জিয়ারত করা মুস্তাহাব।

মসজিদে নববীর মর্যাদা সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

صَلاَةٌ فِىْ مَسْجِدِىْ اَفْضَلُ مِنْ اَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ الاَّ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ، وَصَلاَةٌ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَفْضَلُ مِنْ مَائَةِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ، وَصَلاَةٌ فِى الْمَسْجِدِ الاَقْصى بِخَمْسِ مَائَةِ صَلاَةٍ غَيْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِى هٰذَا- (رواه احمد بسند صحيح)

আমার মাসজিদে নামায মাসজিদে হারাম ব্যতিত অন্যত্র এক হাজার নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। আর মসজিদে হারামে নামাজ অন্যত্র এক লক্ষ নামাযের চেয়ে উত্তম। আর মাসজিদে আকসায় নামায, মাসজিদে হারাম ও আমার এ মসজিদ ব্যতিত অন্যত্র পাঁচ শত নামাযের সমান।

জিয়ারতকারী যখন মাসজিদে নববীতে পৌঁছবে তখন প্রথমে ডান পা প্রবেশ করাবে এবং বলবে–

بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ، اَعُوْذُبِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ-

তারপর জান্নাতের বাগিচায় (রিয়াদুল জান্নাতে) আসবে এবং তাহইয়াতুল মাসজিদ দু রাকআত নামায পড়বে।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

مَا بَيْنَ بَيْتِى وَمِنْبَرِىْ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِىْ عَلَى حَوْضِىْ-

আমার হুজরা এবং আমার মিম্বারের মাঝখানে রয়েছে জান্নাতের একটি বাগান। আর আমার মিম্বার হল আমার হাউজের উপর। (বোখারী)

অতঃপর নবী করীম (সাঃ) এর কবরের পার্শ্বে আসবে এবং বলবে–

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا خَيْرِ

خَلْقِ اللّٰهِ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰهِ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِيْنَ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا قَائِدَ الْغُرِّ الْمُحَجِّلِيْنَ، اَشْهَدُ اَنْ لَااِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّكَ عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَاَمِيْنُهٗ وَخَيْرُ خَلْقِهٖ، وَاَشْهَدُ اَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ، وَاَدَّيْتَ الاَمَانَةَ، وَنَصَحْتَ الاُمَّةَ، وَجَاهَدْتَ فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ–

তারপর সামান্য ডান দিকে সরে হযরত আবুবকর (রাঃ) কে সালাম করবে। এরপর আরো সামান্য ডান দিকে সরে হযরত উমার ফারুক (সঃ) কে সালাম করবে। অতঃপর কিবলার দিকে ফিরে দোয়া করবে।

কবরকে স্পর্শ করা এবং চুম্বন করা যাবে না। কবরের পার্শ্বে উচ্চঃস্বরে শব্দ করা যাবে না।

নবী করীম (সঃ) এর কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদিনায় আসবে না। বরং মসজিদে নববীর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদিনায় আসবে।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

لاَ تَجْعَلُوْا قَبْرِىْ عِيْدًا وَصَلُّوْا عَلَىَّ فَاِنَّ صَلَاةَ كُمْ تَبْلُغُنِىْ حَيْثُ كُنْتُمْ–

আমার কররকে উরুসগাহ বানাবে না। আমার প্রতি দুরূদ পাঠ করবে। কারন তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পৌছানো হয়, তোমরা যেখানেই থাক না কেন। (আবু দাউদ)

অন্য বর্ণনায় এসেছে। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

اَللّٰهُمَّ لاَ تَجْعَلْ قَبْرِىْ وَثَنًا يُعْبَدُ– (رواه مالك)

হে আল্লাহ! আমার কবরকে দেবতা বানাতে দিও না যার ইবাদত করা হয়। (মালিক)

হযরত হাসান বিন আলী (রাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে নবী করীম (সাঃ) এর কবরের পার্শে দেখে বললেন, তুমি এখানে কেন এসেছ? সে বলল, নবী করীম (সাঃ) কে সালাম করার জন্যে। তিনি বললেন, আমি আমার নানাজিকে বলতে শুনেছি–

صَلُّوْا عَلَىَّ فَاِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِىْ حَيْثُمَا كُنْتُمْ–

তোমরা আমার প্রতি দুরূদ পাঠ করব। তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পৌছানো হবে, তোমরা যেখানেই থাক না কেন। (সাঈদ ইবনে মানসুর)

আর কিছু বর্ণনা আছে যা নবীজির কবর জিয়ারত ব্যাপারে কেউ কেউ পেশ করে থাকেন, এ সব কিছুই সহীহ নয়। যেমন–

مَنْ حَجَّ وَلَمْ يَزُرْنِىْ فَقَدْ جَفَانِىْ–

১। যে ব্যক্তি হজ্ব করল, আর আমাকে জিয়ারত করল না, সে আমার প্রতি জুলুম করল।

مَنْ زَارَنِى وَزَارَقَبْرَاَبِىْ اِبْرَاهِيْمَ فِىْ عَامٍ وَاحِدٍ ضَمَنْتُ لَهُ عَلَى اللّٰهِ الْجَنَّةَ–

২। যে ব্যক্তি একই বৎসরে আমাকে এবং ইবরাহীম (আঃ) এর কবরকে জিয়ারত করল, তার জন্য আমি আল্লাহর নিকট জান্নাতের দায়িত্ব গ্রহন করলাম।

مَنْ زَارَنِى بَعْدَ مَمَاتِىْ فَكَأَنَّمَ زَارَنِىْ فِىْ حَيَاتِىْ–

৩। যে ব্যক্তি আমার মৃত্যুর পর আমাকে জিয়ারত করল, সে যেন আমার জীবনেই আমার জিয়ারত করল।

مَنْ زَارَ قَبْرِىْ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِىْ–

৪। যে ব্যক্তি আমার কবর জিয়ারত করল, তার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে গেল।

হযরত ইবনে হাজার আসকালানী, ইবনে তাইমিয়া ইবনুল কাইয়ীম, বিন বায ও সালেহ উসাইমিন বলেছেন, এ সব বর্ণনা, কিছু একান্তই দুর্বল, এবং কিছু বানানো। তাই এগুলো গ্রহণ যোগ্য নয়।

আর মসজিদে নববীতে চল্লিশ ওয়াক্ত নামায পড়া সম্পর্কে যে বর্ণনা এসেছে, তা সহীহ নয়। বর্ণনাটি নিম্নরূপ–

مَنْ صَلَّى فِىْ مَسْجِدِىْ اَرْبَعِيْنَ صَلَاةً لَاتَفُوْتُهُ صَلَاةٌ كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ الْعَذَابِ وَبَرِئٌ مِنَ النِّفَاقِ– (رواه الطبرى)

৫। যে ব্যক্তি আমার মাসজিদে চল্লিশ ওয়াক্ত নামায পড়ল, তাতে এক ওয়াক্তও বাদ পড়ল না, তার জন্য অগ্নি থেকে মুক্তি ও আযাব থেকে মুক্তি এবং নিফাক থেকে পাক লিখা হল। (তাবারী) উক্ত হাদীসটি সহীহ নয়।

মসজিদে কুবার জিয়ারত

মাসজিদে কুবা জিরয়াত করা সুন্নাত।

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) পায়ে হেঁটে এবং বাহনে চড়ে মসজিদে কুবা গমন করতেন–

وَ يُصَلِّى فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ– (متفق عليه)

এবং সেখানে দুই রাকআত নামায পড়তেন। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

হযরত সহল বিন হুনাইফ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

مَنْ تَطَهَّرَ فِىْ بَيْتِهِ ثُمَّ اَتَى مَسْجِدَ قُبَاءَ فَصَلَّى فِيْهِ صَلَاةً كَانَ لَهُ كَأَجْرِ

عُمْرَةٍ– (رواه احمد، النسائ، ابن ماجة والحاكم)

যে ব্যক্তি নিজ গৃহে অযূ করল, তারপর মসজিদে কুবায় এসে নামায পড়ল, তার জন্য একটি উমরার ছাওয়াব লিখা হল। (আহ্‌মাদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ্‌, হাকেম)

আর জান্নাতুল বাকী, হযরত হামজা (রাঃ) এর কবর এবং অন্যান্য শহীদদের কবর জিয়ারত করা মুস্তাহাব। কারন নবী করীম (সঃ) এ সব স্থান জিয়ারত করেছেন।

সমাপ্ত

লেখকের গবেষণাধর্মী অন্যান্য গ্রন্থসমূহ

১। নির্বাচিত চল্লিশ হাদীস

২। চল্লিশ হাদীসে কুদ্‌সী

৩। যুব মনের প্রশ্ন ও ইসলাম

৪। কোরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলামী আকায়েদ

৫। হাদীসের আলোকে জিজ্ঞাসিত মাসায়েলের জবাব

৬। বিশ্বনবী (সাঃ) এর নামায

৭। বিশ্বনবীর একশত ওসীয়াত

৮। অধিকার

৯। দেওবন্দী বুজুর্গদের আকায়েদ

১০। মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহাব এর সংক্ষিপ্ত সীরাত ও দাওয়াত

১১। ফিক্‌হুল হাদীস- ১ ও ২

ফিক্‌হুল হাদীস

(দ্বিতীয় খণ্ড)

শায়খ আব্দুর রউফ বিন সুলাইমান

অনুবাদ সম্পাদনায়

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী